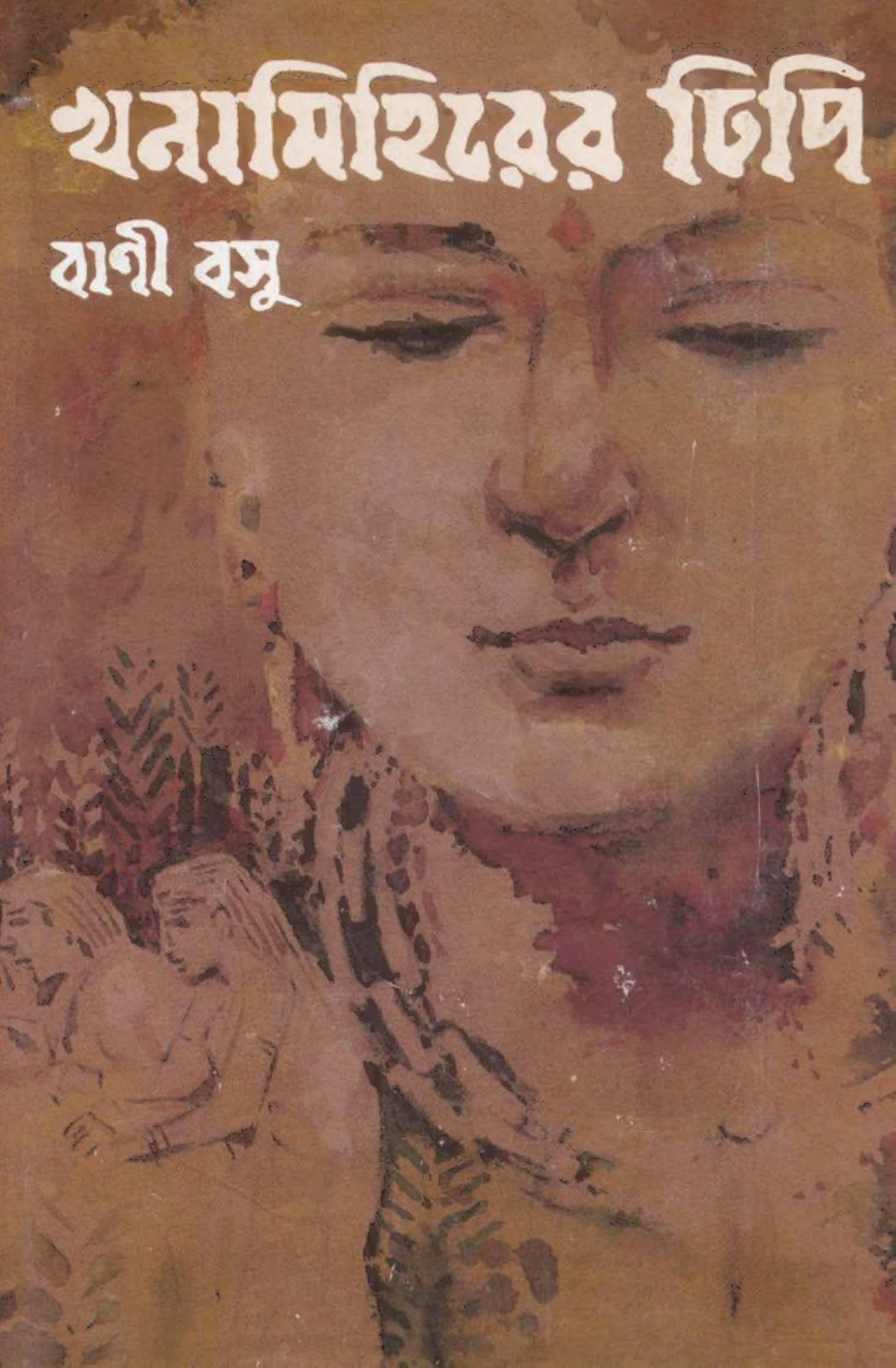
খনামিহিরের ঢিপি

বাণী বসু



'খনামিহিরের ঢিপি' খুব জটিল দূর অতীত। প্রাগৈতিহাসিক অতীত, ও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন প্রজন্মের ভাঁজ খুলে খুলে দেখতে চাওয়ার কাহিনি। আদিম অরণ্যের জীবন থেকে উঠে এসেছে মাতঙ্গী, রক্কা, মধুরা, নিমেষ, ভগ, অর্যমা। সমসময়ের প্রতিনিধি রঞ্জা, ঈশা, নিশীথ, সুবীর। এদেরকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে কাহিনি। গল্পের আশ্চর্য নির্মিতি ও মন্থনে উছলে উঠেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। লিঙ্গ বিভাজন কেন, কবে থেকে, কী রকম? ভয়াবহ এর ইতিহাস। ক্রমবিকাশের ধারা। ভয়াবহ এখনকার স্বরূপ। মেয়েদের জন্য সে-সব নীতি-নিয়ম মূল্যবোধ আলাদা করে তৈরি করে যুগের পর যুগ তাদের ওপর, সমাজের ওপর চাপানো হয়েছে। মগজ-ধোলাই করা হয়েছে। তার চেহারাটা যেমন স্থূল, তেমনই সূক্ষ্ম। একই সমাজে পুরুষের জন্য এক নীতি মেয়েদের জন্য আর এক এবং সে-নীতির চাহিদা অতর্কিতে বদলে যায়। যখন যেমন বলছে তেমন করে তৈরি হতে হবে মেয়েদের। এই বলছে সুন্দরী, শান্তস্বভাব বিশিষ্ট ঘরোয়া পাত্রী চাই, সে পাত্রী পেল তো তার চাহিদা বদলে গেল, উপার্জন করো, নানা গুণ অর্জন করো, নইলে মার খাও। এই স্বৈরাচারী পুরুষ-চরিত্র ও পারিবারিক হিংসার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখিকা। দেখিয়েছেন সতীদাহর অন্তর্গত ক্রূর বর্বরতা এখনও পরিবারে পরিবারে চালিয়ে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত পদস্থ মানুষও। সমাধান কোথায়? কোন ভ্রান্তির কারণে মানুষ জাতি সভ্য হতে পারছে না? উত্তর খুঁজেছেন লেখিকা।

ISBN 81-7756-611-3



বাণী বসুর জন্ম ১১ মার্চ, ১৯৩৯ (২৬ ফাল্গুন ১৩৪৬)। শিক্ষা ও কর্ম কলকাতায়। প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ন, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে ইংরেজি বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র-জীবন থেকে লেখালেখি, অনুবাদ। তখন লেখা প্রকাশ হয়েছে শৃন্বন্তু পত্রিকায়, রূপা প্রকাশনায়। সৃষ্টিমূলক লেখার জগতে প্রবেশ ১৯৮০ সাল নাগাদ। মুলত 'আনন্দমেলা' ও 'দেশ' পত্রিকায়। বহু উপন্যাস লিখেছেন, এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন্মভূমি মাতৃভূমি (প্রথম উপন্যাস), অন্তর্ঘাত, পঞ্চম পুরুষ, শ্বেত পাথরের থালা, উত্তর সাধক, গান্ধর্বী, একুশে পা, বৃত্তের বাইরে, মৈত্রেয় জাতক, অষ্টম গর্ভ, অমৃতা, মেয়েলি আড্ডার হালচাল, খারাপ ছেলে ইত্যাদি। এ ছাড়া গল্পের সংকলন এবং ছোট গল্পের একাধিক বই আছে। প্রধানত বড়দের লেখক হলেও ছোটদের জন্য ভিন্ন স্বাদের লেখায় স্বচ্ছন্দ। তারাশঙ্কর পুরস্কার (১৯৯১) শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৭) আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৭) বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯৮)— পেয়েছেন এইসব উল্লেখযোগ্য পুরস্কার।

প্রচ্ছদ নির্মলেন্দু মণ্ডল

খনামিহিরের ঢিপি

বাণী বসু

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭
চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০১৪

ISBN 81-7756-611-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

KHANA MIHIRER DHIPI
[Novel]
by
Bani Basu

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্তর্ঘাত
অমৃতা
অষ্টম গর্ভ
উজান-যাত্রা
উত্তর সাধক
উপন্যাস পঞ্চক
একুশে পা
কাহিনি ত্রয়োদশ
খারাপ ছেলে
গান্ধর্বী
জন্মভূমি মাতৃভূমি
ঝড়ের খেয়া
ট্রেকার্স
তিমির বিদার
দশটি উপন্যাস
দিদিমাসির জিন
পঞ্চম পুরুষ
বৃত্তের বাইরে
মেয়েলি আড্ডার হালচাল
মৈত্রেয় জাতক
মোহানা (গল্প)
যখন চাঁদ এবং (গল্প)
যে যেখানে যায়
রাধানগর
শ্বেতপাথরের থালা
সমুদ্র-যাত্রা

ঈশা

এখনও রোদটা তেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি। রুদ্ররূপ, চণ্ডভণ্ড প্রকাণ্ড নির্মম। এইভাবে অন্ধ্রের রোদকে ভাবে সে। জানলাগুলো যারা শুধুমাত্র কাচের করেছিল, তারা ভেবেছিল জলজ্যান্ত ভারতবর্ষের একেবারে কোলের ওপর একখণ্ড ফ্রিজ-ঠান্ডা ইয়োরোপ বসিয়ে দেওয়া যায়। ভিন্ন ভূগোল, ভিন্ন ঋতুরঙ্গ, ভিন্ন অভ্যেস ও প্রয়োজনের কথা আদৌ ভাবেনি। দু শতাব্দীর বিলেত-স্বপ্ন দু চোখে মেখে ভেবেছিল এখানে এ.সি থাকবে, কেউ আর দেশটা গরম বলে বুঝতে পারবে না। ভেবেছিল ধুলো ময়লা এখানে হবে না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নিয়ে দরজা না খুললেই হল। মে জুন মাসের পাওয়ার কাট-এর সময়ে এলে টেরটা পাবে তারা। এক দিকে বিন্ধ্য অন্য দিকে গোদাবরী, মাঝে তপ্ত কটাহ। তবে হ্যাঁ, শীত, যাকে গ্রীষ্মদেশের লোকেরা সবচেয়ে ভালবাসে, সেই শীত এখানে নেই।

ভারী ভারী পর্দাগুলোকে টেনে টেনে জানলা ছায়, কাচ ছায় ঈশা ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে। হালকা হলুদের ওপর এক বর্ণচ্ছায় গাঢ় হলুদ মোটিফ বসানো চমৎকার পর্দা সব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কেননা এ তো রৌদ্রশোষক রং নয় একেবারেই। ঘন সবুজ, গাঢ় মেরুন কি খয়েরি ছিল ঠিকঠাক রং। কিন্তু রুচির সঙ্গে প্রয়োজনের প্রায়ই মতে মেলে না। সাত হাজার টাকার পর্দা কিনে শেষ শীতে মুখ আলো করে ফিরেছিল দম্পতি। হালকা চন্দন দেওয়াল। তাতে হলুদ পর্দার আভা সিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। কী সুন্দর! এখন রোদের তাপের সঙ্গে নিজের তাপ যোগ করে, ফেরত পাঠাচ্ছে সেই শখের পর্দা।

জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানেও কোনও স্নিগ্ধ সবুজ নেই। মেটে মেটে রং। কাজ হচ্ছে। লরি এসে উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে পাথরকুচি। মিক্সার মেশিন ঘড়ঘড় করে ঘুরছে। থামের খাঁচা তৈরি, এবার ভেতর ভরাট করার পালা। আরও হাউজিং উঠছে, আরও। পরে গাছপালা, ঘাস লাগানো হবে মাটির ন্যাড়া গা ঢাকতে, বাগিচা-বাহার। কিন্তু আপাতত ধূলিবসন পশ্চিম রুদ্রামাপল্লির এই তিন নম্বর তিরুপতি কমপ্লেক্স। জুবিলি হিলস পেরিয়ে আধুনিক সাইবারাবাদের বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে। সেখানে হয়তো পাওয়ার কাট হবে না। এমন একান্ত সাধনায় নির্জন নিঃশব্দ ছিল অনেক দিন এই প্রাচীন শহরিকা, তার খানদানি ইতিহাসের ধ্যানে, পৃথিবী পালটে যাচ্ছে খেয়াল করেনি। গণ বিস্ফোরণে আর যন্ত্রসাধনায় ছিটকে উড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে ধ্যান। চারমিনারে পুরনোকে অন্তরিন রেখে চকচকে ঝকঝকে করে গড়ে উঠেছে যমজ শহর। কে বলবে এখানেই আছে গোলকোন্ডার গোলালো দুর্গ—বহু প্রাচীন, কে বলবে রয়েছে অত সমাধি মন্দির। ঠিক যেমন কে বলবে তার জীবনে একদিন খড়খড়ি দেওয়া সবুজ জানলা ছিল!

আলোছায়ায় ভরা সেই ঘরটা কি মনে পড়ে ঈশা? লম্বাটে, অন্তত ষোলো সতেরো ফুট লম্বা ঘরখানা? সাত-সাতটা জানলা! মেঝেতে ঠাম্মার বিয়ের শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে কত গল্প করত তারা তিনজন—সে, মা, আর...আর ভাই। খড়খড়ি দিয়ে পথচলতি মানুষের উলটো ছায়া পড়ত সিলিং-বরাবর। ভাই বলত—সিনেমা।

আস্তে করে গান চালিয়ে দিয়েছে মা 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।' গানটা মার খুব প্রিয়, নিজেও গুনগুন করে গায়, চুপ-ঘরের আধো-আঁধারে সে ভাবত সুরের আলো গগন ছেয়ে ফেলছে। সুরের হাওয়া গগন বেয়ে চলছে, সে কেমন সুর? কেমন তার গায়ক? ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম সব ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মনে কি পড়ে ঈশা? অন্যরকম দিনকাল সে সব, নয়? খড়খড়িটা একটু তুলে রাস্তার চল-জীবন দেখা সেই! ছাতা মাথায় লোক, 'চারুলতা' সিনেমার মতো, বাসন বাজাতে বাজাতে বাসনঅলা, ফুচকাঅলা, পিঠের ওপর অবলীলায় ঝাঁক

ঝাঁক বেডকভার নিয়ে একটা লোক যেত! চৌখুপি-চৌখুপি, আবার এই অজর বেডকভারও তাতে থাকত, সে এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে চিনতে পারে। অন্যদিকে রাস্তা নয়, হরেন জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। খড়খড়ির পটোলচেরা চোখ সেখানে খাঁ-খাঁ দুপুরের উঠোনে তারের ওপর সার সার কাপড় শুকোনো দেখত। কয়েকটা পেঁপে গাছ, তার তলায় পাঁজা করে বাসন ফেলা। শুকনো এঁটো বাসনে কাকের ঝাঁক, দূরে দূরে চড়ুই। একটা বেড়াল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পাঁচিল থেকে বাসনের ওপর, প্রবল বিরক্তি জানিয়ে কাকের দল সরে যাচ্ছে, শুকনো বাসনকে হেলাচ্ছেদ্দায় পেছনে ফেলে হুলো গদাইলশকরি চালে উলটো দিকের নিচু পাঁচিলে অনুপম একটা লাফ দিয়ে উঠল, বিপজ্জনক ভাবে লাফিয়ে পড়ল ওদিকে। কাঁচা নর্দমার নোংরা জলে পড়ল না তো আবার! এক লহমার ভাবনা বিচ্ছিরি ফ্যাঁচফেঁচে, কোঁকানি-কান্না-কাঁদা হুলোর জন্যে, তারপর সারা দুপুর জেগে থাকে রোদ আর ঝিমধরা চরাচর। নিঘুম। শরীরে কেমন জল কাটে, হিউমিডিটি নব্বুই নাকি? জলাক্রান্ত বাতাস কেন অত ঘর্মস্রাবী হবে! তার জলের ভেতরের শীতলতাটি কোথায় গেল? সবই বাষ্প?

খসখসে পিচকিরি দিয়ে জল ছেটাত তারা। চমৎকার একটা গন্ধ উঠত। শোঁ করে শ্বাস টেনে গন্ধটা নিতে নিতে জল ছেটানো। মাঝে মাঝেই পিচকিরির অভিমুখ ঠিক করে দিত মা, কেননা জল চলে যাচ্ছে ঊর্ধ্বগতিতে যেখানে ছাদ উপুড় হয়ে পড়েছে বিজলি পাখার ওপর।

—'তোরা এবার একটা সর্বনাশ করবি, রবারের চটি পর—'

—'পড় পড় ঈশা, প্লিজ একটু পড়ে নে, পরীক্ষার সময়ে ওরকম ঘাড়মোড় ভেঙে পড়লে পাশ হয়তো করে যাবি। কিন্তু ভাল হবে না। শিখবিও না কিছু।' তার যে পড়তে ভাল্লাগে না, যে মুহূর্তে ধাতু আর অধাতুর লিস্ট মুখস্থ করতে হয়, মৌলিক পদার্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, বলের প্রকারভেদ অনুধাবন করতে হয়, অমনি মনটা কেমন উচাটন হয়ে চলে যায় উড়ে। পেছনে ফেলে রেখে যায় একরাশ বিরক্তি মার জন্য, একরাশ মন খিচখিচ তার নিজের জন্য। উড়ে চলে যায় জজপুকুরের

নির্জন বাঁধানো ঘাটে, সেখানে হলুদ ফুল লাল ফুলেরা ইচ্ছেমতো ঝরে গেছে। এমন নয় যে সে উন্মত্ত প্রকৃতিপ্রেমিক, তবু তো প্রকৃতি একটা আবহ তৈরি করে দেয় যা দেয়ালের ওদিকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওই ঘাটের ওপর আড্ডা বসে, সে তিন্নি, দীপু আর আসিফা। গল্প, স্রেফ গপ্পো, তার মধ্যে ভৌতবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের কোনও ছায়া থাকবে না। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল সব নিশ্চিহ্ন। কিছু গল্প, কবিতা, গান থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আফি, তিন্নি, দীপুদের সে সব বেশিক্ষণ পছন্দ হবে না। আফির সৎমা, রমুর বাবার মদাভ্যাস, দীপুর ঠাকুমার ঝগড়াটেপনামি... এই সব। মা একদম পছন্দ করে না, এসব আবার কী, এইটুকু মেয়েদের পরচর্চা। মা বোঝে না, যাকে ভুগতে হচ্ছে, তার ভেতরে বাষ্প জমছে, একটা সেফটি ভাল্‌ভ চাই, না হলে সে ফেটে বেরিয়ে যাবে। এ সেইরকম। এরই মধ্যে ইউনিভার্সাল হারুদা লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে —'কী রে মা, ঘাটে বসে বসে কী করছিস?' অমনি হাসি, চোখ চাওয়া-চাওয়ি, দীপু চমৎকার চোখ মটকাতে পারে... তারপর হঠাৎ উপলব্ধি— ধুত, বেকার সব, ভাল্লাগছে না, একদম ভাল্লাগছে না। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে—'শোন দীপু, তিন্নি—আমি কাল থেকে আর আসব না।' কিন্তু এটা বলা যায় না। তাই মিষ্টি হেসে—'এবার আসি রে দীপু, আফি—মা আবার বকবে।' আঙুর-গুচ্ছ চুল দুলতে থাকে। সে জানে না, আবছা আন্দাজ করতে পারে এবার কিছুক্ষণ ওদের আড্ডার কেন্দ্র হয়ে থাকবে সে। খামখেয়ালি? গুমুরে? মাটিতে পা পড়ে না! মা-বাবা পণ্ডিত! হুঁঃ, অমন পণ্ডিত অনেক দেখা আছে। ছোট ছোট মেয়ে, কিন্তু এমন চক্র চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে যে বিষে-রিষে ভর্তি হয়ে থাকে ভেতরটা। মা বলে না—ওদের সঙ্গে মিশো না। বলে—এত কী আড্ডা ঈশ! সময় কাটাবার কত উপায় আছে! বই পড় না, গল্পের বই। গল্পের বইয়ের মানুষদের সঙ্গে ভাব কর, আড্ডা দে।

মায়ের বকুনি যে শুনছে, সে যে নিতান্ত বাধ্য এটা সে মাকে বুঝতে দিয়েছে। মা আসলে তাকে গভীর, গহন, অনন্ত ভালবাসে, বিশ্বাস করে। সেও কি বাসে না? মা না থাকলে তো বাড়িটা তার কাছে টাওয়ার অব

লন্ডন লাগে, যেখানে লেডি জেন গ্রে বন্দিনী ছিলেন! কয়েদখানা একটা! বড় বড় কালো কালো ছায়ারা আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলতে থাকে সব শূন্য স্পেস, শুষে নিতে থাকে আলো। প্রখর রোদের দুপুরই হোক আর শীতের আমেজি দুপুরই হোক, মা না থাকলে বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হয় না। ভাই কেমন দূরের পুতুল, খুটখাট হাজার রকমের বল নিয়ে খেলছেই খেলছেই, ঠাম্মা এখন ঘুমবুড়ি। আর কে আছে বাড়িতে! জেঠিমা তো বাপের বাড়িতেই থাকে ঘুরে ঘুরে...। জ্যাঠাও অফিস-ফেরত শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অনেক রাতে ফেরে কোনও-কোনও দিন। তারপর বাজনা বাজে ক্যাসেটে। অমল কারুকাজ বাজতে থাকে রাত ভরে। আরও আরও মন কেমন করে তখন, অথচ মা তখন আছে। মা তখন নিজের কাজে মগ্ন, বাবাও। টেবিলের দু দিকে বসে দুজনে। মাঝে মাঝে দুরূহ সব কথাবার্তা বলছে, কথা কাটাকাটিও হল। কিন্তু কাজ। এই কাজকে সে হিংসে করে আবার শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু হিংসে আর শ্রদ্ধার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কাজটা কখনও তার আপন হয় না। ভীষণ একটা নেগেটিভ সংকল্প জাগে মনে, সে করবে না, এ সব করবে না, পারবে না, এই দুরূহ আলোচনা, এই সব পাতার পর পাতা লেখা, মোটা মোটা বই অক্লান্ত উলটে যাওয়া, এদিকে ওদিকে পুরনো পাথরের টুকরো, ভাঙা মূর্তি, হাত দিয়েছ কি বকুনি—'টেরাকোটা, ওটা টেরাকোটা, পড়লেই ভেঙে যাবে। ঈশা-বুবুন!' এই জগৎটা তার মায়ের অঙ্গীভূত, তাকে কী করেই বা ভাল না বেসে থাকা যায়। অথচ মাকে সে, তারা পুরো পাচ্ছে না যে! ওই সব সময়ে মায়ের মনে ঈশা নেই, বুবুন নেই, হর্ষবর্ধন, কিংবা রাজা শশাঙ্ক অধিকার করে রেখেছেন সে মন।

ওই কাজগুলো কোল থেকে নামিয়ে মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে, ভাইয়ের সঙ্গে বসে কথা আর গল্পের ফুলঝুরি ঝরায় মা, তার থেকেই তো রাজ্যশ্রী, হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক...সব জানতে পারে তারা। হারমোনিয়াম টেনে গানের পর গান গেয়ে যায় মা, দিদিমা ভাল গাইতে পারেন, মা ততটা নয়। তবে মা স্বভাব গায়ক, যা শোনে, সোজা-সরল করে গেয়ে যায়। সে শ্রোতা, হয়তো নিবিষ্ট তখনকার মতো, কিন্তু মনের খানিকটা,

জজপুকুরের পাড়ে বসা মনটা বলে সে এসব পারবে না। পারতে চায় না। এই পড়া এই গান—সবই প্রচুর পরিশ্রমের জিনিস, সে লাল ফুল হলুদ ফুলের মতো বিনা আয়াসে ফুটে থাকার কথা ঝরে যাওয়ার কথা ভাবে। কাদায় পড়ে গেলে অত সুন্দর ফুল পিষ্ট হয়ে যায় ভেবে শিউরে ওঠে একটু। কী তুমি তবে চাও খুকু? কে যেন সারা দিনমান জিজ্ঞেস করতে থাকে। তার কাছে উত্তর থাকত না। আকাশ-বাতাস ভরে চাওয়া বাজে। ঘনিয়ে ওঠে বাদল মেঘে। গাছের ডালে পাতার পাশে পাশে চাওয়ার কুঁড়ি ফোটে। সে শুধু একটা হয়ে ওঠার চাওয়া। কোনও বিশেষ গুণ নয়, সমস্ত অস্তিত্বটা একটা সুগভীর আবেগে টলটল করতে থাকে, হাওয়ায় ভর দিয়ে উধাও... যদি হওয়া যেত! কোথা যে উধাও... উধাও মনটাকে কি অভিনিবেশে টানতেই হবে? এই শুধু ফুটে থাকায়, শুধু হয়ে থাকায় কি কোনও তৃপ্তি নেই? যা সহজে প্রাপ্য, জল বাতাস আলো হাওয়া... ভালবাসা। এই-ই।

এখন ঈশা জানে তার চাওয়া একরকম সৃষ্টি-ছাড়া। সমাজ-ছাড়া। কে জানে এখনকার জানাটাও হয়তো ঠিক জানা নয়।

এরকম মানুষ কি হয়? হয়তো হয় না। সবাইকার জীবনে একটা লক্ষ্য থাকে সে দেখেছে। তার বন্ধুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা? ছোট হলেও আছে। ভাল করে গ্র্যাজুয়েশনটা, তারপর কেউ মাস্টার্স, কেউ কম্প্যুটার, কেউ বা আর কিছু ধরবে। চাকরি করুক না করুক, একটা বিয়ে তো হবেই। বিয়ে চাই-ই চাই। তারই জন্য সবার গোপন, রোমাঞ্চিত প্রতীক্ষা। কেমন হবে? কে হবে? স্থির করে ফেলছে কেউ। কেউ স্থির করে আবার ভেঙেও ফেলেছে। হাই স্কুল থেকেই গল্প কাহিনি শুনছে ঈশা। তার মনের মানুষ বাইরে কোথাও নেই তো! কিন্তু আছে, ছিল। গোপন মনে স্বপনলোকে। আজকের দিনের মেয়ে হয়েও যে সে বিয়ে ও তারপর রোমাঞ্চময় দাম্পত্য ও চমৎকার স্বাদু গার্হস্থ্যের আবছা-স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকল— এর কী মানে? এটা কি স্বাভাবিক? সে কি তার ঠাকুমা-দিদিমার চেতনা নিয়ে জন্ম নিল! এ কি একটা প্রতিক্রিয়া? মেয়েদের বহির্গমন ও তার দরুন চাপ ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে মানবীমনের

একটা শান্ত বিদ্রোহ? নাকি প্রতিক্রিয়াটা অন্য কিছুর? তার মায়ের তো গার্হস্থ্যে অভিনিবেশ ছিল না তত! নিজের কাজটা মা বড্ড ভালবাসত। সময় ও মনোযোগ দাবি করত কাজটা। সেটারই ছিল অগ্রাধিকার। মা একটু হারানো-ছড়ানো টাইপও ছিল। মাসির কাছে এ নিয়ে কত বকুনি খেয়েছে মা। 'যেখানে দেখো পাঁজা পাঁজা বই। কী রে! একটু গুছোতেও পারিস না?' হতাশ হয়ে অপ্রতিভ হেসে মা বলত 'তুই-ই দেখিয়ে দে। কোথায় রাখব। সব ভর্তি। যত আলমারি, যত তাক সব ভর্তি, এবার টেবিলে স্তূপ হবে না তো কী! —ওর বিছানা দেখ, চারপাশে বই নিয়ে ঘুমোয়, আমারটা তো তবু ফ্রি। এসেই যাচ্ছে, এসেই যাচ্ছে, জার্নাল, প্যামফ্লেট, বই। রাখতে তো হবে?'

ঠাম্মা? বড্ড গোঁড়া। খুব বাঁধা-ধরা পথে চলতে চায়। তাদের হয়তো ইচ্ছে হল— রাতে নুড্‌লস্ খাবে। ঠাম্মা বলবেন— 'রাতে লুচি না রুটি না ভাত না, খাবি ওই চিনে কেন্নো! দুর!' ব্যস হয়ে গেল। মা একবার দুর্বলভাবে বলল— ওটাতেও তো আটাই আছে মা। স্টেপ্‌ল ঠিকই যাবে। ক্ষতি কী! চাইছে!

—তা হলে আমি সরে যাচ্ছি। তোমরা যা হয় করো।

এই অভিমানের সামনে মা খুব সহজেই আত্মসমর্পণ করত। কে জানে হয়তো তাই-ই তার সুন্দর বিন্যাস, বিলাস, শৌখিনতার ওপর এত আকর্ষণ! সে তার বাড়ি এই ভাবে সাজাবে, ওই ভাবে। আর এই বিস্তৃত স্বপ্নের মাঝখান দিয়ে চলাচল করত একটা আবছা মূর্তি। তার মুখ পুরো বোঝা যায় না। অথচ নিরবয়বও তো নয় সে। তার আকৃতি কেমন! পেটা স্বাস্থ্য? লম্বা-চওড়া? না দেবকুমারের মতো সুন্দর! জানে না ঈশা। তার রোম্যান্টিক মন সব কিছুকে নির্দিষ্ট করে দিতে চায় না। চায়নি। শুধু ভালবেসো। গভীর ভালবেসো। আমাকে, একমাত্র আমাকে।

'সাতনরি হার দেবো ফুলের বাহার দেবো
রুপোর হাঁসুলি যদি চাও ...' একটা গান আছে না?
তেমনই— দুধসাদা শয্যা দেব অমৃতস্বাদ খাদ্য দেব
নিতুই নতুন যদি চাও...

ঘর ভরা সাজ দেব বুক ভরা লাজ দেব
রাগ দেব ঝাল দেব মান-অভিমান দেব তা-ও।

পর্দা টানা আধো-অন্ধকার ঘরে লম্বা আয়নায় নিজের আবছা প্রতিবিম্বর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে ঈশা। ও কে? কে ও বিষাদ প্রতিমা? ওকে তো সে চেনে না?

মাতঙ্গী

তিতির তিতির করে বয়ে চলেছে ধন্যা নদী। পাশে কিছুটা ফাঁকা, ঘাস, ছোট ছোট ঝোপঝাড়, তার পেছনে বন। এখানে এখন পাখি ডাকছে। ফুল ফুটছে। ফুল ঝরছে। কিন্তু রাতে? রাতে এখানে খুব বিপদ। দিনেও মানুষের শান্তি নেই। নানা জন্তুজানোয়ার ওত পেতে থাকে। এই তো সেদিন শুক্কো বলে কাদামাখা গেঁড়াটাকে তরক্ষু টক করে তুলে নিয়ে গেল। তবু তাদের ভয়-টয় করে না। ও সব তো আছেই। জন্তুর মুখে, কি স্রোতের মুখে, বৃষ্টির ধারায় কি আগুনের হলকায় যে চলে যায় সে স্তব্ধ, অদৃশ্য হয়ে যায়। সেটা মেনে নেওয়াই তো ঠিক। ঘন বনের মাঝে এইখানটা একটু হালকা। জলের ওপর আলো চমকায়, অনেক দূর থেকে জল-জল বাস পায় সবাই। জল খেতে আসে জন্তুজানোয়ার, পাখি, মানুষ, যে যেখানে আছে। পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে। পিষে যায় ঘাস, ঝোপ, ফিরতি হাতের পায়ের মুখের জলে ভিজে যায় মৃৎ, ছোট ছোট ঘাসফুল রাতারাতি তারার মতো গজিয়ে ওঠে, কেউ রেয়াত করে না, তাই পায়ে পায়ে আবার দলে যায়। এই গজানো আর পিষে যাওয়া অবিরাম অবিরল চলেইছে চলেইছে। তার মাঝ দিয়ে তিতির তিতির করে বয়ে চলেছে ধন্যা। তার কোনও হেলদোল নেই।

—রঙ্কা... আ, রঙ্কা— আ... হঠাৎ ডাক ভেসে এল বনভূমির প্রাচীর ভেদ করে। রঙ্কা— আ। যে ডাকছে সে তার মুখের দু পাশে হাত জড়ো করে ডাকছে। শিঙার মতো শক্তিশালী কণ্ঠ। মাতঙ্গী। মাতঙ্গী ডাকছে।

ডাকের মধ্যে একটা ভীষণ তাড়া, একটা ক্রোধও কি? ক্রোধ অবশ্য থাকতেই পারে। মাতঙ্গী আর রঙ্কার মধ্যে অবাধ্যতার একটা জলাভূমি আছে বটে, সেখানে আলেয়ার মতো হঠাৎ-হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠতে পারে ক্রোধ। কিন্তু তাড়া কেন? ভাবনাও কি? ভাবনা কী তারা খুব অস্পষ্টভাবে জানে। শুক্কোকে যখন পাওয়া গেল না, তিনটে সূর্য তিনটে চাঁদের পর মাতঙ্গীর খেয়াল হল, শুক্কো কোথায় গেল? শুক্কোকে দেখছি না! সে কার কাছে দুধ খাচ্ছে!

অর্যা খুব নিশ্চিন্ত স্বরে বলেছিল— শুক্কোকে তো তরক্ষু নিয়ে গেছে।

— সে কী? তুই দেখলি? কিছু করলি না?

—আমি তো শস্যক্ষেত্র পাহারা দিচ্ছিলাম। এক লহমার জন্য জল খেতে নদীতে যাই। দূরে হরিণের দল চরছিল। নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পেয়েছি! হরিণগুলো যা চতুর। ও খেলছিল ধুলোমাটি নিয়ে। তরক্ষুটা পেছন থেকে ঘাড় খামচে ধরে নিয়ে গেল। ও চেঁচাবার সময় পায়নি। ঘাড়টা তখনই মটকে লটকে গিয়েছিল।

—একজন মানুষ কমে গেল— মাতঙ্গী ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলেছিল— এই যে শস্য যারা মাটিতে পড়ে আবার গজায়, শনশন করে বেড়ে ওঠে, সোনালি ফলায় চমৎকার সাদা দুধ জমিয়ে আমাদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে, সেই সব শস্য যত্ন-আদর করবার জন্য, পাহারা দেবার জন্য, তাদের ধরনধারণ লক্ষ করার জন্য, বীজবপন, ফলাগুলো তোলা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের জন্য লোক চাই না? অনেক অনে—ক মানুষের দরকার। ছোটদেরও কত কাজ থাকে, আমাদের আরও আরও মানুষ চাই। অথচ নিছক একটা ছোট্ট মানুষকে তরক্ষু নিয়ে গেল আর অর্যা তুই খবর দিচ্ছিস— এই তিন চাঁদ পরে? ছিঃ! হুংকার করল মাতঙ্গী... তারপর হঠাৎ একটা অস্ফুট কলকল ধ্বনি বেরোল তার মুখ দিয়ে। 'মাতঙ্গী কাঁদছে, মাতঙ্গী কাঁদছে'— একটা রব উঠল। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কে তার উরু বেয়ে কোলে উঠতে চাইছে, কে কাঁধের ওপর থেকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে মুখ, কে তার হাত বা পায়ে ঠোঁট ঘষছে, তার বিশাল কঠিন পর্বতশৃঙ্গর

মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক'জন। চুচুকে চুমুক দিচ্ছে। আসলে এই ভাবে তারা মাতঙ্গীকে শান্ত করতে চায়। তাকে দেখাচ্ছিল শাবক পরিবৃত সিংহীর মতো। 'যা, যা তোরা অর্যার কাছে যা,' ধরা গলায় বলেছিল মাতঙ্গী। 'রঙ্কা যা অদ্রির কাছে যা, অদ্রি তোকে দুধ দেবে।'

রঙ্কার একটা অচেনা অনুভূতি হচ্ছিল। শরীর জ্বালা করছিল, মনটা কীরকম যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। পেটের মধ্যে চিনচিন, বুকের মধ্যে হা হা। সে চিৎকার করে বলেছিল— আমি অদ্রির কাছে যাব না। অর্যার কাছেও না, আমি শুক্কো চাই, আমি ছন্দর কাছে চললাম। —শুক্কোর মুছে যাওয়া, মাতঙ্গীর প্রথম কান্না, তার নিজের ভেতরের সব আশ্চর্য ঘটনা তাকে বিহ্বল দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। ছন্দ দু হাত বাড়িয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল— আমি তোকে শুক্কো দোব একটা, আমি তোর চুচুকে রস এনে দেব রঙ্কা।

তারা দুজনে নির্ভয়ে চলে গিয়েছিল ঘন বনের ভেতর। তরক্ষু কি শিবা কি ঋক্ষর ভয় তাদের হয়নি। তারা হরিণ-হরিণীর মিলন দেখেছিল পরম তৃপ্তিতে, ঘুর্ঘুর পাখিদের মিলন দেখেছিল। এবং ওই ভাবে পিঠের ওপর থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল ছন্দ। সেই থেকে রঙ্কা মাতঙ্গীর কাছে ঘেঁষে না। দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে— এদিক থেকে, ওদিক থেকে। ছন্দ আর সে সব সময়ে জোড়ে ঘোরে। কেউ তাদের বিরক্ত করে না। শুধু শম মাঝে মাঝে হেসে বলে— যখন ছন্দকে আর ভাল লাগবে না তখন আমার কাছে আসিস, আমিও তোকে শুক্কো দেব, দুধ দেব।

মাতঙ্গী ডাকছে। বৃহৎ সব বনস্পতির প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে গর্গল গর্গল করে, সেই ডাক ভেসে আসছে। দলনেত্রী, বৃহদাকার, বৃহৎ চক্ষু, অস্ত্রপটু অদ্বিতীয় মাতঙ্গী ডাকছে। রঙ্কা ডাক লক্ষ্য করে ছুটল। হরিণের মতো জোরকদমে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে, খরগোশ বাঁদর ভাম এড়িয়ে চড়াং চড়াং করে ছুটে চলল। কেননা মাতঙ্গী ডাকছে। অনেক দিন পর মাতঙ্গী ডাকছে। রঙ্কাকে।

কতখানি ছুটেছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ এক দমকে থমকে গেল।

যেখানে ফাঁকা জায়গা শুরু হবার কথা সেখানে মানুষের প্রাচীর। পেছনে আলোয় আলো সেই শস্যময় মাঠের আনন্দ। কিন্তু সামনে সে সব আড়াল করে দাঁড়িয়ে শম, অদ্রি, অর্যা, অলম্বুষ, গৃধ্র, অর্যমা, রাত্রি, সম্বা, কুটিল, হবন, সর্ব, জগৎ, যে যেখানে ছিল তাদের পাড়ার মেয়ে পুরুষ সব। মুখ উৎকণ্ঠ, কঠিন, কাঁধে তির-ধনুক, হাতে বর্শা, লাঠি।

অলম্বুষ থেমে থেমে বলল— আমাদের বোধহয় পেছু হটে এই শস্যবন পেরিয়ে দুরে আরও দূরে পেছিয়ে যেতে হবে, কী বলো সিংহ!

—না— মাতঙ্গী গর্জন করে উঠল।

সিংহ হুংকার দিল, ওরে বাবা সে কী হুংকার!

—রঙ্কা। তুই কোনও অচেনা লোককে নদীর ধারে দেখেছিস? ওপারের সুদূর থেকে চরতে চরতে এসেছে! তুই তো সব সময়ে ওখানেই থাকিস! —মাতঙ্গী উদ্‌বিগ্ন কিন্তু কোমল স্বরে বলল।

—অচেনা লোক?

—হ্যাঁ, ধর আমাদেরই মতো, কিন্তু একটু অন্যতর। দেখলেই বোঝা যায় বিদেশি। বি-গোষ্ঠী।

অদ্রি বলল— রঙ্কার ওপর আবার ভরসা! ও ধন্যার স্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে চলে যায়— কোথায় ফুল, মৎস্য, শৈবাল। ও ধন্যার তীরে একটা বকের মতো নির্নিমেষ দাঁড়িয়ে থাকে। বসে থাকে। কিছু দেখে না, কিছু শোনে না। রঙ্কা একটা আনমনা।

আর তখনই রঙ্কার দপ করে মনে পড়ে গেল। নিমেষ, ওর নাম নিমেষ। সে যেখানে সাঁতার দিচ্ছিল, জলজ গাছপালার মধ্য থেকে ছোট ছোট মাছ ধরছিল, আবার ফেলে দিচ্ছিল, সেইখানে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছিল মুখটি। খুব ছোট। চুল পিঠ অবধি নেমেছে, কোমরে ভেড়ার চামড়ার ছোট পরিধান।

—কে তুমি? —সে আশ্চর্য, একটু বা সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

—আ- আমি... তু... তুমি কে?

—তুমি আগে বলো তুমি কে, আমিই প্রথম জিজ্ঞেস করেছি।

—নিমেষ— আমি নিমেষ।

—আমি রঙ্কা।

—রঙ্কা মনে রেখো আমি নিমেষ, মনে রাখবে তো? বলতে বলতে মাছেরই মতো পিছলে পিছলে দূরে অপর তীরের দিকে চলে যাচ্ছিল লোকটি। একবার জল থেকে মুখ তুলল, লম্বা চুল সেঁটে গেছে মাথায়, জল ঝরছে ঝুঁঝিয়ে। বলল— কাউকে বোলো না কিন্তু রঙ্কা আমাদের এ দেখার কথা।

আবার মুখ তুলে বলল, আমি তোমার জলের বন্ধু। পরে আবার দেখা হবে জলে। গোপনে, তখন...

এ সাত চাঁদ আগের কথা, কি তারও বেশি। রঙ্কা সত্যিই আনমনা। সে ভুলে গিয়েছিল। যেমন করে ভুলে গিয়েছিল ছন্দকে, শমকে, অরি, সূদন ও রামকে। তার এই সব সঙ্গী কেউই তাকে বেশি দিন পায়নি। তার ভাল লাগে অনেককে। কিন্তু কী যে অদ্ভুত! সকালের ভাললাগা বিকেলে মিলিয়ে যায়, আজকের চাওয়া কালকে বদলে যায়। কী করা যাবে! সবাই জানে সে এইরকমই। এই মুহূর্তে নিমেষের জন্য এক প্রবল ঈপ্সা জেগে উঠল তার উদরে, নিম্নাঙ্গে। চুচুকে। সে মাটির ওপর পড়ে শীৎকার করে উঠল।

মাতঙ্গী বিরক্ত স্বরে বলল— এটার দ্বারা কিচ্ছু হবার নয়, তোরা কেউ একে গহনে নিয়ে যা। নয়তো দশা ওকে পাগল করে দেবে।

কেউ আর রঙ্কার দিকে নজর দিল না। সবাই তাকিয়ে আছে সিংহর দিকে। মাতঙ্গীর দিকে। সবাইকার মুখে উৎকণ্ঠা।

সিংহ বলল— আর কিছু নয়, আমি নিশ্চিত ওরা জেনেছে আমাদের শস্যের কথা। আমরাই এখানে একমাত্র শস্য খাই, মাটির ভাঁড়ে জল রাখি, আমাদের মতো কেউ নেই। বুনোরাও কিছু জানে না। মাটি দিয়ে ফুল উঠছে, ঘাস উঠছে। তবু বোঝে না। কিন্তু জানল কী ভাবে? ধন্যা আমাদের সীমানা, ধন্যা আমাদের রক্ষা করে। ধন্যার ওপার থেকে... কারও নজরে পড়ল না...?

মাতঙ্গী তীব্র গলায় বলল— কেন, আমরা যে ভাবে জেনেছি। কুকুরগুলো, নকুলগুলো ধন্যার দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল না,

বাতাসে মুখ, নকুলগুলোর চিকচিক চিক চিকানি তো কুকুরদের ঘেউ ঘেউ-এর মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল ওদের! ওদেরও তেমন কুকুর কি নকুল কি আর কিছু কি আর নেই! তা ছাড়া—শস্য? তার সৌরভ? বাতাস? ওমুখো বাতাস কি শস্যের গন্ধ ওদিকে বয়ে নিয়ে যায়নি? বাতাসের মতো বিশ্বাসঘাতক আর কে আছে?

সিংহ বলল— এতগুলি চাঁদ-সূর্য পার হলাম, বুঝলি অর্যমা। বুনোদের সঙ্গে, দস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। ওরা আবার গোপন যুদ্ধ করে। কোথাও কিছু নেই, তুমি দেখবে একটা তির তোমার বুকে কি হাতে কি পিঠে এসে লাগল, ব্যস। কিন্তু ওরা কখনও শস্যে হাত দেয় না। ওরা খায় না এমন ফলমূল নেই, বহু কন্দের গুণাগুণ ওরা জানে, শিকারের জন্তু আর গাছের ফল ফুরিয়ে গেলে অন্য জায়গায় চলে যাবে, মাটি খোঁড়ো, বীজ পোঁতো, জল দাও, শস্য তোলো, ঝাড়ো— এ সব ওদের পোষায় না। এ নিশ্চয় ওই অজানা দিক থেকে আসছে।

সেই দিনই, চাঁদ সবে আকাশের প্রাচীর বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, অন্ধকারে ধন্যার জল চিকচিক করছে, হঠাৎ বানর, শিয়ালের ডাকে ভরে গেল বনস্থল। সম্পূর্ণ অচেনা এক হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ বিজাতীয় ডাক আর খটাখট খটাখট, হরিণের চেয়েও ভারী তুরুকের আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল পাড়া। তির-ধনুক, বর্শা বাগিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ধন্যার দিকে ছুটে চলল সিংহ মাতঙ্গীর দল। পুরোভাগে মাতঙ্গী ও সিংহ। তাদের কেন্দ্র করে অর্ধচন্দ্রাকারে আর সবাই। ধন্যার অপর পাড়ে খটাখট খটাখট পায়ের শব্দ তুলে একদল যোদ্ধা এসে দাঁড়াল। আকাশে মুখ তুলে জন্তুগুলি— হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ শব্দ তুলল। প্রাণ কাঁপানো সে শব্দ।

একজন মুখের দু পাশে হাত রেখে চিৎকার করে বলল— সরে দাঁড়াও, অস্ত্র রাখো, আমাদের সঙ্গে অশ্ব আছে, লাফিয়ে পার হয়ে যাব নদী। সাঁতরাতে লাগবে না। কথা শোনো।

সিংহ সিংহনাদ করে উঠল। বন কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি করে উঠল মাতঙ্গী। শত তির বল্লম আকাশ ফুঁড়ে উড়ে গেল। চিৎকার, যাতনার

গোঙানি, কান্না, তারপর ওদিক থেকে উড়ে এল তির, বল্লম। মাতঙ্গীরা বসে পড়ল। মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে চলে গেল শত্রুপক্ষের অস্ত্র। পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আবার শরবর্ষণ করল মাতঙ্গীর দল। আর সেই শরজালের মধ্যে দিয়েই ধন্যা নদী লম্বা লম্বা লাফে ঝড়ের মতো পার হতে লাগল শত্রুবাহিনী, বল্লম বিঁধিয়ে দিতে লাগল ওপর থেকে, ধারালো অসি দ্বারা ছিন্ন করতে লাগল মুণ্ড, শুধুমাত্র জন্তুটির ধারালো জোরালো পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে আহত নিহত হতে লাগল মাতঙ্গীর দল।

—লোকগুলিকে তন্তু দিয়ে বাঁধো— অচেনা গলা। ভরাট। চিৎকার করে বলছে, যেন বাজ।

রঙ্কার ডান হাত ফুঁড়ে তির চলে গেছে। যন্ত্রণায় সে পিপ্পল গাছের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল। মাতঙ্গীর দলের অন্যদের মতো সে কষ্টসহিষ্ণু নয়। কাতরতা বেশি। সে খুবই কোমলাঙ্গী। সদ্য দোয়া দুধের ওপর রক্তের ফোঁটা মিশলে যেমন হয় তেমন তার দেহবর্ণ। চেরা চোখের মধ্যবর্তী নীলচে কনীনিকা। মাতঙ্গী তাকে কঠিন কাজ দিতে ইতস্তত করত, তাই সে যখন মাটি মেখে ধন্যার জলে স্নান করে উঠে এসে, বাকলটি শুকিয়ে নিয়ে, বৃক্ষরস দিয়ে তার ওপর নানা ফুল এঁটে, বাকলটি পরে দাঁড়াত, মাতঙ্গী স্নেহ ও তাচ্ছিল্য মেশানো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাত। বলত— "এ তৈরি হচ্ছে না। রঙ্কা কিছু শিখছে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি মাতঙ্গীর মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যায় সে কিচ্ছু করতে পারবে না। আনমনা মেয়ের এই ভবিতব্য। কিন্তু মাতঙ্গী তার পশ্চাদ্ধাবন করবে। তার হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে প্রাণটাও হয়তো দিয়ে ফেলবে। যদিও তাতে সবার ক্ষতি, সবার...সিংহর, শমের, অদ্রির, অর্যার... সবার, কেননা মাতঙ্গীর মতো বীর, মাতঙ্গীর মতো বুদ্ধিমান এখানে আর কেউ নেই। পরামর্শ করার হলে একমাত্র সিংহর সঙ্গেই করে মাতঙ্গী। কিন্তু সে শুধুই পরামর্শ। এসব কথা যেন রঙ্কা মনে রাখে।"

সূর্য উঠেছে। মৃদু কমলা আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায় চোখ মেলে তাকাল রঙ্কা। এখনও তার চোখ থেকে তমসা-ঘোর

কাটেনি। সে সূর্যের রং অনুভব করছে। কিন্তু সে ভাবে দেখতে পাচ্ছে না। চুলে, দাড়িতে আচ্ছন্ন একটি মুখ তার ডান বাহুর পাশে, তিরটি একটানে টেনে বার করেছে। সেই যন্ত্রণায় মুখ ভেসে যাচ্ছে তার জলে। পিষ্ট ওষধির প্রলেপ পড়ল বাহুতে, তারপর পাতলা গাছের পাতা দিয়ে বাঁধা হল জায়গাটা। আস্তে আস্তে চোখে দৃষ্টি ফিরছে রঙ্কার। —আমি নিমেষ, চিনতে পারছ রঙ্কা!

—নিমেষ! নিমেষ! নিমেষ!

ক্রমেই তার প্রশ্ন ভয়ানক থেকে ভয়ানকতর হচ্ছে। দুর্বল থেকে সক্ষম, তারপর সবল। তুমি এখানে কী করে এলে? জানো এখানে বি-গোষ্ঠীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমাদের সর্বনাশ করে গেছে!

—হ্যাঁ! —যেন মৃদু হেসে তার দেওয়া তথ্য সমর্থন করে নিমেষ।

—জানো এক বিজাতীয় ঘৃণিত পশুর সাহায্য নিয়েছে তারা...

—ঘৃণিত নয় অতি প্রিয়— অশ্ব, রঙ্কা। ওদের অশ্ব বলে। যেমন বলবান, তেমন ক্ষিপ্র, তেমন সুন্দর। আমরা অশ্বারোহী।

—আমরা? তুমিও...

—হ্যাঁ, আমিও...

—তুমি তা হলে গুপ্তচর? সেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পল্লি দেখতে এসেছিল?

—নিজের গোষ্ঠীর আহার-আশ্রয়ের জন্য যেটুকু পারি সেটুকু তো আমাদের করতেই হবে।

নিমেষ দু হাতে আহত রঙ্কাকে তুলে নিল। চলছে সাবধানে যাতে রঙ্কার আঘাত না লাগে। শস্যমাঠ আর ধন্যা নদীর মাঝখানের পরিষ্কার জমিতে মৃতদেহ ছড়ানো, কিছু আহত মানুষ গাছের সঙ্গে লতা দিয়ে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। সকলেই নতমুখ, অজ্ঞান। —নিহত অদ্রিকে দেখতে পায় রঙ্কা, সিংহের মুণ্ড গড়াচ্ছে, শম উলটে পড়ে গেছে, অজ্ঞান। ইতস্তত অশ্বগুলি ঘুরছে, তাদের ওপর আরোহীরা। রণভূমির মধ্য দিয়ে তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে নিমেষ। সে হঠাৎ দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল—

সঙ্গীগণ, ধন্যা নদীর ধারে আমরা এই অপূর্ব উদ্ভেদ পেয়েছি। মাটি ফুঁড়ে এরা উঠে আসে, আমাদের আহার্য হয়, বল দেয়, বীর্য দেয়, বন্দিরা আমাদের শেখাবে কী করে এই উদ্ভেদ হয়, কী করে তাদের লালন করতে হয়। ধন্যা নদীর তীরে প্রাপ্ত তাই এই উদ্ভেদ-এর নাম দিলাম ধান্য। আমরা ধান্যজয় করেছি। আর আমি জয় করেছি এই নারী। আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে আমি এর মতো মনোহর কাউকে দেখিনি। এ আমার নারী। আজ থেকে এই কথা সব সময়ে মনে রাখবে, এ 'আমার' গুহায় থাকবে, 'আমার' শিশু ধারণ করবে... বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে, নিমেষ এবং তার নিজের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নিয়ে লেপে দিচ্ছে তার কপালে। এই দেগে দিলাম। রঙ্কা অবাক হয়ে শুনছে। ভাল বুঝতে পারছে না কী বলছে আর ঠিক সেই সময়েই একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেল রঙ্কা— একটি অতি বৃহৎ বনস্পতির মূলে চিত হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মাতঙ্গী। তার দুই বিশাল চোখ আকাশের দিকে, কিন্তু সে দৃষ্টিহীন, তার চুচুক দুটি ঊর্ধ্বমুখী, তার বাকল ছিন্নভিন্ন— অনতিদূরে কুণ্ডলীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। 'মাতঙ্গী...মাতঙ্গী...মাতঙ্গী' চিৎকার করতে করতে নিমেষের কোল থেকে লাফিয়ে নামে রঙ্কা। কেউ সতর্ক হবার আগেই ছুটে চলে যায়। আছড়ে পড়ে স্থির দেহটির ওপর। শিউরে ওঠে দেহ, মৃদু খুব মৃদু নিশ্বাসের মতো স্বর ফিসফিস করে বলে— রঙ্কা... আ... আকাশে মিলিয়ে যায়।

—মাতঙ্গী, মাতঙ্গী... যেয়ো না মাতঙ্গী... জেগে ওঠো... মাতঙ্গী... মা-আ-আ-আ।

আর্ত আকুল স্বরে মাকে ডাকতে ডাকতে জেগে উঠলেন রঞ্জা। কুলকুল করে ঘামছেন। মা কেন অমন উর্ধ্ব থেকে পাষাণ চোখে চেয়ে ছিলেন? তবে কিনা... স্বপ্ন ফলে এটা একটা কুসংস্কার— সুস্বপ্নও, দুঃস্বপ্নও। তাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এক ভদ্রলোক তাঁর বাবার অপঘাত মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনোবিদ তাঁকে বিশ্লেষণ করে জানান আসলে তিনি বাবার মৃত্যু চান।

এরকম ব্যাখ্যাও হয়। সত্যিকার শিক্ষিত লোক স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। মুখে অন্তত তাই বলে। অথচ তারা কি সবাই রঞ্জার মতো নয়! জানে স্বপ্ন নিজের মনের গভীর থেকে উত্থিত হয়, কোনও ঘটনার আগাম ছায়া তাতে পড়ে না। তবু শিউরে ওঠে, কেঁদে ওঠে, কেননা ঘুমের মধ্যে মানুষ শিশুর মতো। তার যাবতীয় আহৃত জ্ঞান তখন তার থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও প্রতিভাশালী মানুষেরা স্বপ্নে সমাধান পান, গল্প পান, যেমন বিজ্ঞানী কেকিউল বেনজিন রিং-এর রাসায়নিক গঠনটা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন 'বিসর্জন'-এর গল্প। মায়ের চোখ অমন পাষাণ ছিল কেন? যেন মা কোনও অন্য লোক থেকে নিস্পৃহ তাকিয়ে আছেন!

তিনি খুব কেঁদেছেন। কিন্তু সুবীর সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। নাক ডাকছে তালে তালে। এই গভীর ঘুমের জন্য সুবীরকে ঈর্ষা করাই যায়। রঞ্জার ঘুম প্যাঁচার ডাকে ভেঙে যায়, ঘরে কাগজ-টাগজ কিছু উড়লে ভেঙে যায়। কিন্তু সুবীরও তো ঘুমের ঘোরে গোঁ-গোঁ করেন না এমন নয়। তখন তিনি উঠে বসে তাঁকে ঠ্যালা দ্যান, ঠিক করে শোও, পাশ ফেরো! পাশ ফেরো! এ কী! ঘেমে গেছ যে! —এই সব কথা-ব্যর্তা কার্যকলাপ থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়— এক— তাঁর ঘুম পাতলা, দুই— তাঁর উদ্‌বেগ। পাশে শায়িত দেহটি তো পাথরের নয়, সপ্রাণ, ঘুমের মধ্যে তাঁর কোনও আক্রমণের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকলে তিনি চিন্তিত, দ্রুত সে অসুবিধের নিরসন করতে চান। গেলাসে জল, পাখার স্পিড বাড়ানো।

ঘুমোও ঘুমোও— যেন তিনি স্ত্রী নন, মা। কোনও আদিম মাতা যাঁর কাছে অন্য সব প্রাণী, হয়তো বা অপ্রাণীও সন্তান, শুশ্রূষা চায়। পুরোটাই আপনা-আপনি ভেতরের নির্দেশে হয়ে যায়। কিন্তু এই যে তিনি সশব্দে কেঁদে উঠেছেন, চোখ দিয়ে বন্যা নামছে, এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এ সব পাশের ঘুমন্ত মানুষটি টের পাননি। কিংবা হয়তো পেয়েছেন ঠিকই, সাড়া দেওয়াটা ভাল মনে করেননি। আবার নিজের ঘুমের বারোটা বাজবে, মাঝরাত্রিতে নয়তো কোনও বিরক্তিকর স্বপ্ন বৃত্তান্ত। তাই সুবীর তাঁর বহু দিনের বিবাহিত, ব্যবহৃত স্ত্রীকে আর্তনাদ করতে শুনেও জানান দেননি। ভাবতে খারাপ লাগলেও এটাই হয়তো সত্য। কেননা সুবীরের এই এড়ানো, আত্মপর স্বভাব তিনি বহু দিন আগেই টের পেয়েছিলেন। বিয়েরও আগে। তাঁর অন্তরাত্মা ঠিকই রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়েছিল, তিনি ধরতে পারেননি বা চাননি। কেননা তাঁর প্রেম অন্ধ, আকুল, বিবাগি ছিল। তার আবেগের সঙ্গে যোঝবার ক্ষমতা তাঁর যুক্তির ছিল না।

একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে অশ্বারোহীর মূর্তিটার তলায় তাঁকে ফেলে রেখে সুবীর চলে গিয়েছিলেন। সমাধানহীন একটা পাত্রাধার কী তৈল না তৈলাধার কী পাত্র গোছের দার্শনিক আলোচনা হচ্ছিল, কিছুটা এগোবার পর রঞ্জার আর এই গোলকধাঁধায় ঢুকে অত সুন্দর সন্ধেটা নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি, হঠাৎ সুবীর বললেন— একটু আসছি। বললেন নয়, বলল, তেইশ বছরের সুঠাম তরুণ তখন। তিনিও তো তিনি নয় তখন— সে। বছর উনিশের ছিপছিপে তরুণী। সন্ধে গাঢ় হচ্ছে, আশপাশে সন্দেহজনক চরিত্ররা ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে। তখনকার উনিশ রেপ জানত না, যৌনকর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখত না, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাতেও লজ্জা পেত, খুব ছোটবেলার পরিচিতদের মধ্যেই কোনও বয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কদর্য ব্যবহারের দূষিত স্মৃতির সঙ্গে যৌবনবেদনাকে মেলাতে পারত না, এবং খেলোয়াড় হলেও মস্তান-দর্শন যুবকদের ঘোরাফেরা করতে দেখলে ভয় পেত। সেই সময়কার রঞ্জা। চলতে আরম্ভ করেছে, পা আটকে যাচ্ছে শাড়িতে,

চোখে কুয়াশা, পেছনে কুৎসিত মন্তব্য ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছে, রীতিমতো দল একটা। রঞ্জা বাগানের পূর্ব গেট দিয়ে কোনওমতে বেরিয়ে প্রাণপণে বাস স্টপের দিকে যাচ্ছিল। ভাবছিল কোনও পথচারীর সঙ্গে কথা বলবে কি না। কিন্তু কী কৈফিয়ত দেবে সে গাঢ় সন্ধ্যায় এই পথে তার একাকী অবস্থানের! বলবে সঙ্গী তাকে ফেলে চলে গেছে? কেমন সঙ্গী প্রশ্ন উঠবে তো! সে-ই বা কী জাতের মেয়ে! নিদারুণ লজ্জায়, অপমানে গলা আটকে ছিল।

বাস স্টপে সুবীর দাড়িয়ে আছে।

—তুমি... এরকম...

—এই তো ওয়েট করছি তোমার জন্যে।

—মানে! ওইখানে না বলে-কয়ে ফেলে এসে... চারদিকে বাজে ছেলে, যদি কিছু হত?

—হয়নি তো— অধৈর্য সুবীর— যা হয়নি তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার!

—করলে কেন.. এটা?

—রাগ হয়ে গিয়েছিল... অবভিয়াস।

—রাগ হলে তুমি আমাকে মরুভূমির মধ্যে— প্রকাশ্য বাস স্ট্যান্ডে সে ঝরঝর করে কাঁদছিল। রাগে, দুঃখে, অপমানে।

পরিস্থিতি এড়াতে তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ডাকল সুবীর। নানা ভাবে আদর করে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে গলেনি।

শূন্য চোখে তিনি এখন ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকালেন। সেই ঘটনা কি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল না? ওই ক্রোধ! ওই সব বৃথা তর্ক! ওই ভাবে ফেলে যাওয়া। সারাটা জীবন ওই রাগে, ওই বাজে তর্কেই কেটে গেল। ফেলে যাওয়ারই বা বাকি কী আছে!

রঞ্জা জানেন এখন তিনি কুড়ি বছরে আছেন। তিন দশকেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তবু। উত্তরযৌবনা, উত্তর ফাল্গুন। কুড়ি বছরের রোমাঞ্চ এখনও কাঁপায়, পরের দশকগুলোর দুঃসহ স্বপ্নভঙ্গ এখনও কাঁদায়।

ভোর হওয়াটুকুর অপেক্ষা। মায়ের ঘুম থেকে ওঠার সময় আজকাল ছ'টা। ঠিক সাড়ে ছটাতে ছটফট করে ফোনটা করলেন রঞ্জা।

—রঞ্জা বলছি বউদি।

—এত সকালে? কিছু হয়েছে? —বউদি অবাক।

—না মানে। মায়ের... তোমাদের খবর নিতে ইচ্ছে হল।

—স্বপ্ন দেখেছ বুঝি? বউদির গলায় হাসি।

—ওই আর কী! এমন দেখি! ভাল তো সব!— লজ্জা-লজ্জা গলায় বললেন রঞ্জা।

—ভালই তো মনে হচ্ছে। তোমরা ভাল?

—চলে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে, মা এখনও ওঠেননি। উঠলেই বলব।

দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পার্ক স্ট্রিটে কাটিরোল খেতে নামেন রঞ্জা, সোসাইটি থেকে একটু এগিয়েই, এই ফুটেই স্টলটা। খুব সুবিধেজনক। অন্য জায়গার থেকে সাইজটা এদের বড় হয়। বেশ পেট ভরে যায়। ধীরে ধীরে গরম রোলটা খেতে খেতে দুপুরবেলার আধা ব্যস্ত পার্ক স্ট্রিটের দিকে তাকালেন রঞ্জা। রোদ পিছলে যাচ্ছে রাস্তার চওড়া মসৃণ কালোর ওপর। দু দিক থেকে অবিরাম গাড়ির স্রোত। এই দুপুরেই এমন, তা হলে অফিস-টাইমে কী হয়! পথচারীরা এখানে বেমানান। একটা বিরাট লম্বা কালো হন্ডা গেল, তার ভেতর থেকে লাল জিব ঝুলিয়ে দুটো স্পিৎজ। এমন সুন্দর করে জানলায় এইটুকু টুকু থাবা রেখেছে যে, ছোট্ট শিশু ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। হঠাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পেছিয়ে যান তিনি। তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল বড্ড ফুটফুটে। বুবুনকে তো মনে হত একেবারে সোজা চার্চের সিলিং থেকে নেমে এসেছে, ডানাগুলো বোধহয় পিঠে ভাঁজ করা আছে। আর ঈশ ছিল একটা লাভলি ছটফটে বাচ্চা। নিজের ছেলেমেয়েকে নিয়ে মায়েরা মুগ্ধই হয়ে থাকেন। রঞ্জার মাকে যখন সবাই বলত— মেয়েরা আপনার মতো হয়নি, মা বলতেন, কী করেই যে আমাকে সুশ্রী বলে লোকে! দুর দুর!

তোরা সব কত সুন্দর! মঞ্জু কী সুন্দর টুকটুকে ফরসা, চুলের ঢাল। আর তুই? কী সুন্দর ভুরু যে তোর! চুলের কী বাহার। কেমন ভাল-ভাল মুখখানি! কোনও কিছুর খাতিরেই মা প্রিয় মিথ্যে বলেন না। ঠিক যেটুকু প্লাস পয়েন্ট, সেটুকুই বলবেন। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ের ব্যাপারে রঞ্জা অতিরঞ্জন করছেন না। বাসে উঠলেই আমার কোলে... এইখানে বোসো খোকা... বুবুন ভ্যাঁ! ঠোঁট ফুলছে আরেকজনের। অমনি তিনজনে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। —"আপনি বসুন, আপনি বসুন।" কিছুক্ষণ রঞ্জা আর এই পার্ক স্ট্রিটের উত্তরযৌবনে রইলেন না। তখন অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, অবিনাশী জেদ! কী হল! কিছুই তো হল না! শুধু একটা বিরতিহীন কর্ম, জেদ, প্রাণপণ প্রয়াসের ইতিহাসই রয়ে গেল। কেউ আর তার পাতা উলটোয় না। যোগ-বিয়োগের শেষে কোনও সংখ্যা নেই, হাতে রয়েছে মাত্র একটা খুদে পেনসিল।

আজকাল আর কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখে না। কোনও মহিলা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে খেয়ে নিচ্ছেন— এটা কোনও কু-দৃশ্য নয়। দৃশ্য কতরকম গজিয়েছে এখন! তিনটি লম্বা মেয়ে জিন্‌স আর টপ পরা, গট গট গট করে চলে গেল সামনে দিয়ে। কথা বলছে দুজন। অন্যজনের হাতে মোবাইল। পার্ক স্ট্রিটের মতো রাস্তা মোবাইল কানে দিব্যি পার হয়ে গেল! এই গটগট হাঁটা খুব ভাল লাগে রঞ্জার। অল্প বয়সে ইংরেজি সিনেমা দেখতে গেলে ওই হাঁটাটা মন দিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখত সে। যেন একটা এক্সট্রা এনার্জি, বেশি বেশি আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষমতা ফুটে বেরোচ্ছে, বিকিরিত হচ্ছে চলাটা থেকে। ঈশা যেই একটু বেশি লম্বা হয়ে গেল, গড়পড়তা বাঙালির মতো কোলকুঁজো হতে শুরু করেছিল, সে পিঠে একটা আস্তে কিল মারত।

—কী হচ্ছে কী! সোজা হয়ে বসতে, দাঁড়াতে কী হয়? কার কাছ থেকে কী লুকোচ্ছিস?

বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে লজ্জা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বলত— উঃ মা, তুমি না!

আপন মনে একটা নিশ্বাস ফেললেন রঞ্জা। ঈশা যদি এরকম গটগট করে হাঁটত!

কাগজের খিলিটা হাতে পাকিয়ে, ব্যাগের পাশ পকেটে রেখে দিলেন। অফিসে গিয়ে ট্র্যাশ ক্যানে ফেলবেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির জলদগম্ভীর সিঁড়ি, ঘর, প্যাসেজ সব ঠান্ডা। বাইরের ব্যস্ততা, গরম, রোদ, চোখজ্বালা করা ধোঁয়ার বিন্দুমাত্রও নেই। জায়গাটা খুব আরামের। হঠাৎ মনে হল যা কিছু প্রাচীন সবই কেমন শীতল, ঠান্ডা, জীবনের গনগনে ভাবটা নেই, থাকে না। নালন্দার ধ্বংসস্তূপের ভেতরে চৌকোনা উঠোনে দাঁড়ালে, চোখে পড়বে কত অলিন্দ, কত ছোট ছোট সেল। ছাত্রদের থাকবার। কেমন শীতল, মরা নয়, কিন্তু যেন তুষারীভূত হয়ে রয়েছে। সোসাইটিটাও তেমনি। নিজের চেয়ারে বসে বেশ কিছুক্ষণ সেই শিলীভূত অতীতের শীতলতা অনুভব করতে থাকেন তিনি। সব অতীতই কি শীতল হয়? ঠেলে সরিয়ে রাখে মন, নইলে জীবন, জগৎ চলবে না। কিন্তু সব অতীত কখনওই শীতল নয়। ভয়ংকর, প্রচণ্ড, ভৈরব উত্তাপ আছে কোনও কোনও অতীতের। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চায় আগুন, কয়লার উনুন তলা থেকে খুঁচিয়ে দেবার মতো করে জ্বলন্ত অঙ্গার সব ছাইয়ের গাদায় দমবন্ধ হতে ফেলে দেন তিনি। তারপর মনকে কান ধরে টেনে এনে কাজে বসান। চন্দ্রকেতুগড়ের 'কাজটা' চলছে। মানুষ, মধ্য বয়সের মানুষও যেন ওইরকম রুইন্‌স্। খুঁড়লে কত কী পুরাবস্তু মেলে।

এই ফ্ল্যাট-বাড়ির সিঁড়ি খুব পাতলা পাতলা। তবু তিনতলা থেকে মায়ের নামতে কষ্ট হয়। প্রায় আশি হল। আজকের আশি নয়। আগেকার দিনের আশি। সন্তান জন্মে, প্রতিদিনের গেরস্থালিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেঁচে থাকার আশি। রূপটান ছিল না, গন্ধতৈল ছিল না, কিংবা প্রসবোত্তর শরীরচর্চা, অবসর। শেষ দুপুরে এ সময়টা কেউ থাকবে না। মা হয়তো ঘুমোচ্ছেন। একটু ইতস্তত করে বেলটা দিল সে। কোথাও থেকে একটা ঘুঘু ডাকছে। ফড়ফড় করে একটা পায়রা উড়ে এসে বসল নিচু পাঁচিলে। এখানে একটা চৌকোনা খোলা জায়গা আছে, আর্কিটেকচারের কেরামতি। সব ফ্ল্যাটে হাওয়া খেলবে বলে। দরজা খুলে দিয়েছে নিশা।

—এসো দিদি, —ঘুম চোখে বলল, দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। ভুরুতে একটু কোঁচ।

—মা কি ঘুমোচ্ছেন?

—কী জানি ঘরের মধ্যে কী করছেন।

ছমছমে ঘর। শহরতলির চুপ ঘরবাড়ি জুড়ে। মা শুয়ে রয়েছেন। ঢুকতেই বলে উঠলেন— রঞ্জা এলি? —উঠে বসলেন।

—উঠছ কেন? শোও না।

—কথা বলব কী করে?

রঞ্জা মাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বুকে, গালে, কপালে চুমো দিল। তার ভালবাসার এইরকম প্রকাশ। মা কিন্তু খুব সংযত। কোনও দিনও চুমু দিয়েছেন বলেও মনে করতে পারে না রঞ্জা। একটু যেন দুঃখই ছিল। মাকে জিজ্ঞেস করলে হাসতেন— আমার আসে না যে!

তবে আদরের কমতি তাতে হত না। হাজারটা আদরের ডাক পায়রার মতো বকুম বকুম করবে মায়ের ঠোঁটে, চোখ দিয়ে স্নেহ ঝরবে।

—মা, তোমার চোখের তলায় এত কালি কেন? —রঞ্জা চিন্তিত হয়ে বলল।

—কালি পড়েছে? না?

—হ্যাঁ। খুব। শরীর ভাল নেই। না কি?

—আসলে ক'দিন রাতে একদম ঘুমোতে পারছি না। সারারাত এপাশ ওপাশ। ভোরের দিকে ঘুম আসে। একেক দিন উঠতে আটটা হয়ে যাচ্ছে। কী লজ্জা!

—ও মা, লজ্জার আবার কী হল? প্রেশারটা মাপিয়েছ?

—ও হ্যাঁ, ওসব ঠিক আছে।

—তবে বেঠিকটা কী হল?

—কিছু না তো!

রঞ্জার ভেতরে একটা গূঢ় সন্দেহ হয়। যে কোনও কারণেই হোক মা এখানে সুখী নয়। যত্নের কোনও ত্রুটি নেই। ফরসা জামা-কাপড়, সময়ে

খাবার, আলাদা ঘর, পুজোর ছোট্ট জায়গাটুকু। তবু যেন কোথাও মার মনে শান্তির অভাব। মরে গেলেও বলবেন না সে জানে। কোথায় কী ভাবে শান্তির প্রলেপ দিতে হবে হাতড়ে হাতড়ে ফেরে। মনে মনে বলে— ঈশ্বর, এই মানুষটি সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। সন্তানশোক, পৌত্রশোক পেয়েছেন। নিজের বলতে একচিলতে জমি কিংবা একটা পয়সাও নেই। প্রত্যেকটি সন্তানের দুঃখ ওঁর দুঃখ। ওঁকে আর কাঁদিও না, শান্তি দাও হে ঈশ্বর, শান্তি দাও।

—নিশা—আ— মা ডাকলেন।

নিশা ঘুম চোখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও ভুরুতে কোঁচ।

—ক'খানা লুচি ভাজো না বাবা, কীরে রঞ্জু— আলু চচ্চড়ি খাবি? না বেগুনভাজা?

—বউদিকে আসতে দাও না কেন। তারপর সব হবে'খন। খনখন করে উঠল নিশা— তেতেপুড়ে এসেছে দিদি, একটু লেবুর শরবত খাক বরং। যেতে যেতে বলে গেল— বউদি বকলে, তখন? হাজারখানা কৈফিয়ত দাও— ভাল্লাগে না!

মায়ের মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সবই আছে। ঘর-বাড়ি, ফার্নিচার, আলো-পাখা, ফ্রিজ, টিভি, বাসনকোশন, খাবার-দাবার, লোকজন। কিন্তু কোনও কিছুর ওপরই কর্তৃত্ব নেই। কোনওটাই নিজের নয়। সে কথা কাজের লোক সুদ্ধু মনে করিয়ে দেয়। এই মা, সন্তানের জননী, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, নিজে কম খেয়ে, কম পরে প্রাণপণে বড় করে তুলেছেন সন্তানগুলিকে। একেকজন একেক বিদ্যায় বিদ্বান। কিন্তু তারা আর মা-র নয়। তাদের অর্জিত জিনিসে মায়ের জীবনস্বত্ব আছে, আর কোনও অধিকার নয়।

সে বলল— কোনও মানে হয়? এলেই এমন ব্যস্ত হও কেন বলো তো? বেলা সাড়ে চারটের সময়ে কি আমি অভুক্ত এসেছি এতটা পথ? এখন আমার খিদে পায়নি। হ্যাঁ, তোমার জন্যে গোলাপি প্যাঁড়া এনেছি। একে এই গরম, স্বাদ চলে যাবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে কিন্তু।

মা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন— এই সময়েও তো কলেজ করে

ফিরতিস রঞ্জা। তুই , মঞ্জু, রঞ্জন, সঞ্জয়, রঞ্জিত, অঞ্জন, সৃঞ্জয়। যে যখন আসবে— ও মা, ভীষণ পেট চুঁইচুঁই করছে। গোছাগোছা লুচি-পরোটা করতুম, পেঁয়াজকলির চচ্চড়ি চিংড়ি মাছ দিয়ে। আলু ছেঁচকি। আজকালকার তুলনায় সামান্যই জিনিস, ভাজতুম ডালডায়। তোরা সে জিনিস এখন ছুঁসও না। সে যা হোক, আমার এরকমই ধারা। বাড়ি ফিরেছে ছেলেমেয়ে। আগে খেতে দেব। মনের চিন্তা, অভ্যেস কি পালটায় রে! বুঝতে পারি বিরক্ত হচ্ছিস।

—না মা— রঞ্জা আস্তে আস্তে মায়ের গায়ে হাত বুলোয়— তুমি তো বোঝো না। আজকাল কত দোকান, কত খাবার রাস্তায় ঘাটে, কেউ আর বাড়ির জন্যে বসে থাকে না মা। কিছু না কিছু খেয়েই নেয়।

মা সংক্ষেপে বললেন— সে তখনও ছিল। তারপর বালিশের পাশ থেকে একটা বই তুলে নিলেন। কোনও অনামা লেখকের 'সাধুসংসর্গ' জাতীয় বই।

—পড়েছিস বইটা?

—না মা। ভাল?

—ভাল মানে? সত্যি। নির্ভেজাল সত্যি রে! একেবারে সাক্ষাৎ চোখে দেখা, কানে শোনা সব। পূর্বজন্মের সব কথা বলেছিলেন হিমালয়ের সাধু। লেখক ভদ্রলোক পাহাড় থেকে নেমে হরিদ্বারের সেই গলির মধ্যে যান। সেই আধভাঙা ধর্মশালা এখনও রয়েছে। অতিবৃদ্ধ এক ক্যাশিয়ার, তার নাম অনন্ত দেশাই। তাঁর পূর্বজন্মের ছেলে। দেখেই সে জন্মের কথা সব মনে পড়ে গেল ওঁর। সব সত্যি, ভাবতে পারিস! বাঙালি মানুষ। অনর্গল মরাঠি বলতে লাগলেন। ভাবতে পারিস?

না, রঞ্জা ভাবতে পারে না। মায়ের কোনও দিন সাধু-বাই ছিল না। বাড়ির ঠাকুর লক্ষ্মী, নারায়ণ, শিব, নাড়ুগোপাল পুজো করতেন নিত্যকর্মের মতো। কিন্তু চর্চার বিষয় বা পড়বার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভাতকুমার। 'কথামৃত' মায়ের মুখস্থ ছিল, পড়তেন সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন'। পুজোর সংখ্যাগুলো। দুপুরবেলা বিশ্রাম করতে শুয়ে পড়তেন না। তাঁদের জন্য থাকত দেব-সাহিত্য কুটির আর

শরৎ-সাহিত্য ভবন। ‘দেশ’ ‘অমৃত’ ‘বসুমতী’তে হাত দেবার হুকুম ছিল না।

—মা! আজকাল আর বিবেকানন্দ পড়ো না? খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল রঞ্জা।

—পড়েছি অনেক তুই তো জানিস... মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— ধরবার ছোঁবার মতো কিছু যেন পাই না রে। আমি বোধহয় খুব সামান্য মানুষ। বড় কিছু ধারণ করবার ক্ষমতা নেই...

চোখ জ্বালা করে জল ভরে এল রঞ্জার। যে মা তাদের কত বিপদে আপদে সাহায্য করেছেন, কত আত্মিক সংকটে নিজের অচল অটল ব্যক্তিত্ব নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। শোকে শোক, সুখে সুখ। প্রজ্ঞার সবচেয়ে বড় কথাগুলো তো মায়ের মুখ থেকেই শোনা— না দেখেশুনে, যাচাই না করে কিছু বিশ্বাস করবে না। বড় হলেই গুরুজন হয় না। গুরুজনকে বিচার করায় কোনও অপরাধ নেই। তবে সব সময়ে বিনয়ী থাকবে, মধুর বাক্য বলবে। তিক্ততা তখনই প্রকাশ করবে যখন দেখবে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছ। সাধুসন্তর ভেক দেখলেই গলে যাবে না কখনও। বেশির ভাগই ভণ্ড। আসলে আমাদের দেশে বরাবর সন্ন্যাস নেবার প্রথা ছিল তো! কুঁড়ে, মতলববাজ লোকেরাও স্রেফ দায়িত্ব এড়িয়ে সুখে বাঁচবার জন্যে ভেক নিত, নেয় বরাবর। খুব সাবধান।

সেই মা। আশি বছর পূর্ণ হতে আর দু মাস, সাত দিন, কয়েক ঘণ্টা বাকি। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আদিতে আর কিছু ধরবার মতো খুঁজে পাচ্ছেন না। কংক্রিট কিছু খুঁজছেন। একেবারে চটজলদি হাতে গরম সমাধান। সর্ব সমস্যার। মিরাকল। চমৎকারের দিকেই এখন সেই প্রজ্ঞাময়ীর ঝোঁক।

একে বার্ধক্য, ভীমরতি এসব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যে মানুষ চিরজীবন সৎ পথে থেকেছে, সত্য আচরণ করেছে, কোথাও কাউকে ফাঁকি দেয়নি, সে তার সহজ-সরল বিশ্বাসী হৃদয় মন দিয়ে জীবনভরা শূন্যতাকে মেনে নিতে পারছে না, কোনও দর্শন, কোনও মহাজনবাণী

নয়। ঈশ্বর, তুমি সাধারণ মেয়ের কাছে, মানুষের কাছে, মায়ের মতো নেমে এসো। এইটুকু। ঈশ্বর, তুমি দুরূহ হোয়ো না, তুমি যে আছ, আমার মতো মানুষদের সমস্যার সমাধানেও যে তোমার ধ্যান আছে এ কথা সত্বর জানাও— এইটুকু। রঞ্জা স্পষ্ট বুঝতে পারে এই জাতিস্মর, এই অলৌকিক, এই সব লোককথাকে আঁকড়ে ধরে মা শূন্যতাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন। আপাদমস্তক শূন্যবোধ। কোথাও কেউ সর্বশক্তিমান নেই। হে মানুষ, নিজেরটা নিজে করো। নির্বাচন তোমার, দায়িত্ব তোমার। এই নিদারুণ অস্তিত্ববাদী সংকট মাকে দূর থেকে উদাস চোখে দেখছে। যে কোনও মুহূর্তে এসে যাবে, ছুঁয়ে ফেলবে, নিজের অজান্তেই তাই মা নানাজনের নানা টুকরো-টাকরা বিশ্বাস জুড়ে নিজে একটা বিশ্বাস তৈরি করতে চাইছেন। সে সব বিশ্বাস— মিথ্যা কি মোহ, দৃঢ়তা কি স্রেফ লোক ঠকানো আর বিচার করছেন না।

বউদি এল একটু পরেই— আমি জানতুম তুমি দু-এক দিনের মধ্যেই আসছ— অর্থপূর্ণ হেসে বলল। —তবে একেবারে আজই, ভাবিনি। মা চেয়ে রইলেন। এদের দুজনের মধ্যে গোপন কিছু হয়ে গেল তিনি বুঝতে পারছেন, অস্বস্তি হচ্ছে। কী হতে পারে? কারণ? বউমার এই ধারণার?

— না মা, আসলে আজ সকালে ছটায় ফোন করে শুনলাম তুমি ঘুমোচ্ছ, কীরকম মনে হল— অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

মায়ের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে কিছুটা সত্য বলতেই হবে।

—তা ছাড়া আমি তো নিয়ম করে আসিই। মাসে একবার তো বটেই!

—কখনও কখনও দু মাসও হয়ে যায় রঞ্জা। এসে আবার পলিটিক্স, খুনোখুনির খবর, বিজ্ঞান-টিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাস...

একটা চমক লাগল। সত্যিই তো! মাসে একবার অন্তত সে আসেই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে নিভৃতে বসা হয় কতটুকু? দাদা বউদি এরা তার প্রজন্ম, তাদের ছেলে পরবর্তী প্রজন্ম। যাদের সঙ্গে পা মেলাতে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তাই এরা এলেই কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক জমে ওঠে। মায়ের স্তবকবচমালা, 'সাধুসংসর্গ' ইত্যাদির

জগৎ থেকে অনেক দূরে। আরও একটা অসুবিধে আছে মায়ের সঙ্গে একা-একা কথা বলার। দাদা-বউদি ভাবতে পারে দুজনের মধ্যে কোনও অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সাংসারিক জটিলতা কোনও, হয়তো বা তাদের সংসারেরই। কেন রঞ্জার এমন মনে হয়? সে জানে না, কখন কোন দৃষ্টি, কোন কথার টুকরো মন তুলে নিয়েছে। ওলট-পালট করে ভেতরে রেখে দিয়েছে, এবং তার নির্দেশক্রমে বা তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছে— সে জানে না। কিন্তু তার মন এই-ই বলে। এতে মায়ের ওপর অবিচার হচ্ছে কখনও মনে হয়নি।

সে ডান হাতটা মায়ের হাতের ওপর রাখল। এইভাবে সে স্পর্শ দিয়ে নৈকট্য, ভালবাসা ও তার গভীরতা বোঝাতে চায়। ভাষায় তো কুলোয়ই না, চোখের দৃষ্টি দিয়েও সব সে বলতে পারে না। ভালবাসা জানাবার জন্য এই ইন্দ্রিয়টিই তার সবচেয়ে জোরালো, বিশ্বস্ত।

মা কি একটু কেঁপে উঠলেন? চোখ কি ভরে উঠেছে? না, রঞ্জনা তাকাবে না। তা হলে মা লজ্জায় পড়ে যাবেন। কখনও নিজের আবেগের কথা কাউকে জানাতে চাইতেন না। এত চাপা! এত চাপা হওয়ার একটা প্রচণ্ড চাপ আছে, মা কী করে সহ্য করেন কে জানে! সে তো পারে না! সে কাঁদে। অঝোরে কাঁদে, রাগ করে, ভীষণ রাগ করে। অথচ সে তো এই মায়েরই মেয়ে।

সেই লুচি হল, আলু ছেঁচকি হল, যা যা মা নিশাকে করতে বলেছিলেন, কিন্তু মায়ের নির্দেশে হল না। খাবার মুখে তুলতে রঞ্জার কেমন ইচ্ছে করছিল না। মায়ের হাত থেকে যা অমৃত হত, মাকে কষ্ট দিয়েছে বলে তা কেমন বিস্বাদ লাগল। গোলাপি প্যাঁড়া ফ্রিজে থেকে এখন সুন্দর ঠান্ডা হয়েছে। মা এইরকমই ভালবাসেন। সে একরকম জোর করেই মাকে খাইয়ে দিল।

—ভাল, মা?

মা মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ। কিন্তু রঞ্জা বুঝল ভাল না। লুচি যেমন ভাল হওয়া সত্ত্বেও তার বিস্বাদ লেগেছে। গোলাপি প্যাঁড়াও তেমন ঠান্ডা নরম সুগন্ধ হওয়া সত্ত্বেও মায়ের বিস্বাদ লেগেছে।

আসবার সময়ে খুব সংকোচে মা বললেন— একদিন আমাকে তোর দিদিমার কাছে নিয়ে যাবি?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই— সে সঙ্গে সঙ্গে বলল— তোমার কবে সুবিধে বলো।

—আমার আর সুবিধে কী। তোরই কাজ-কর্ম...

—ঠিক আছে। তা হলে রবিবার। তুমি তৈরি থেকো। আমি সকাল-সকাল এসে যাব।

—সকাল সকাল বলতে?

—ধরো ন'টা দশটা।

—ঠিক আছে।

মায়ের সংকোচের কারণ আছে। মায়ের থেকে পনেরো বছরের বড় দিদিমা এখনও জীবিত। কিন্তু ঠিক অ্যালঝাইমার না হলেও তার কাছাকাছি তাঁর অবস্থা। বিছানায় বাথরুম করে ফেলেন। খেয়েছেন কি না মনে করতে পারেন না। সব লোককে সব সময়ে চিনতে পারেন না। আরও কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। আজকালকার চূড়ান্ত ব্যস্ততার দিনে তাঁর কাছে কেউ সহজে যেতে চায় না। একটা ছুটির দিন নষ্ট হবে।

মধুরা

বনস্পতির তলায় ছায়া ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। ঠিক পেছন দিকে অস্ত যাচ্ছেন সূর্য। সারাদিন ধরে শবগুলিকে নদীতে ভাসিয়েছে নিমেষ আর তার দল। শস্য-মাঠের চারধারে লোক বসিয়েছে। তারা আহ্লাদিত, এমনকী ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে দেখছে সবুজ। ধান্য! ধান্য! দেখ এই ঘাসের গোড়ায় জল। দেখ কেমন সোজা, সমান হয়ে উঠেছে! বনে যেখানে সেখানে এইগুলিই আমরা দেখতে পেতাম। গো চরাতে চরাতে কৌর একদিন ওপরের ডগা ভেঙে খেয়ে ছুটে গেল না মধুরার কাছে? শক্ত ছিল বলে প্রথমে হালকা আগুনে পোড়াল মধুরা, বেশ কচমচিয়ে খেলাম আমরা। তারপরে

মধুরার এমন বুদ্ধি! জলে গরম করল, সিদ্ধ বলে ওকে। তখন? কী ভাল লাগল। খুব বেশি নয়, একমুঠো করে পেয়েছিলাম প্রত্যেকে বরাহ মাংসর সঙ্গে, ঝলসানো মাংসগুলি খেয়ে খেয়ে জিব পচে গেছে। সিদ্ধ ধান্য কী ভাল যে লাগল! এখন মুঠো মুঠো খেতে পারব। শিকারের কম হাঙ্গামা! আমি তো বাবা ধান্যসিদ্ধ আর বন্য ফল খেয়েই দিন কাটাব ঠিক করেছি।

একজন হেসে বলল— মধুরা দিলে তো! তুই দু মুঠো খেলে আর একজনের একমুঠো কমে গিয়ে নেই-মুঠো হয়ে যাবে।

—মধুরা আমাকে করুণা করবে। আমি ওকে বৎস দিয়েছি।

—সে তো শূরও দিয়েছে। বীরও দিয়েছে। অন্তত পনেরোটি বৎস শুধু মধুরারই। কোনটি কার দেওয়া, সব তো জানা যায় না। মধুরা বলবেই না।

একজন বলল— বন্দিগুলোকে একটু জল, মাংস, ফল দিচ্ছিস তো? ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হয়েছে? ওরাই কিন্তু আমাদের শেখাবে।

ঠোঁট উলটে আর একজন বলল— আমাদের মধুরা আছে। নিমেষ আছে। বন্দিগুলো যদি দুর্ভাগ্যবশত মরে-ঝরেও যায়, ওরা ঠিক পদ্ধতি বার করে ফেলবে।

একজন উঠে দাঁড়াল, —বন্দিগুলিকে দেখে আসি।

—মারিস না যেন।

—না, না।

—তবে আমি জানি, লোকটি দাঁত বের করে বলল— নারীর খোঁজে যাচ্ছিস। বি-গোষ্ঠীর নারী যখনই চাইবি তখনই পাবি, এ তো স্ব-গোষ্ঠীর নয়! তাঁদের ইচ্ছে হবে, মনে ধরবে, সময় নিয়ে নানা বাহানা! ঠিকঠাক দশা হওয়া চাই।

—যদি যাই-ই নারীর খোঁজে, তো তোদের কী? আমাকে নিমেষ বন্দিদের দেখাশোনার ভারও দিয়েছে, জানিস না?

—অধ্যক্ষ তো ভগ।

—ভগ অধ্যক্ষ হলেও, দলে আমি আছি।

ব্যক্তিটি চলে গেল।

বন্দিদের মোটের ওপর একই জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছিল। সামান্যই ব্যবধান দুজনের মধ্যে। যাদের হাত-পা গেছে তাদের মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আঘাত যাদের অপেক্ষাকৃত অল্প তাদেরই চিকিৎসা হচ্ছে। ভগর বিশেষ হাতযশ আছে চিকিৎসায়। সে বনের অন্তত একশো ওষধির গুণাগুণ জানে। যখনই তাকে দেখবে ভগ লতাপাতা দেখছে। ছেঁচছে, আহত জন্তুর ক্ষতে লাগাচ্ছে, নিজেদের স্ফোটকে লাগাচ্ছে। যেদিন বৎস জন্মাবার পর মধুরার রক্তপাত থামছিল না, সেদিন ভগ অলৌকিক দেখাল। কী যে লতাপাতার রস খাওয়াল, যোনিদ্বারের ক্ষততে কী প্রলেপ লাগাল, মধুরা দু-চার দিনের মধ্যেই আবার আগের মতো। বিধা ভেবেছিল মধুরা মারা যাবে। সে মধুরার স্থান নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। হল না। বিধা খুব নিরাশ হয়। কিন্তু নিজেদের সুরক্ষার জন্য সকলেই এখনও মধুরার ওপরই ভরসা করে। বিধা যতই নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করুক।

অস্ফুট কাতর ধ্বনি করছিল আতুর, সুধনু, অর্যা, শম, ছন্দ, কর্ম, পুলহ, স্রাবী, নদী... কিন্তু ধীরে ধীরে আরাম আসছিল। চোখ বুজে আসছিল। একে একে ঘুমিয়ে পড়ছিল ওরা। ভগ হৃষ্টচিত্তে দেখছিল তার ওষধির সম্মোহন। কতক্ষণ এরা নিদ্রাঘোরে থাকবে? সে আকাশের দিকে তাকাল। সারাদিন বন্দিগুলি কষ্ট পেয়েছে— জল জল করে কাতর প্রার্থনা করেছে। ভগও সারাদিন ভেবেছে তার ওষধি ঠিক কতখানি দিলে এরা নিদ্রা যাবে, আবার তাদের নিদ্রা ভাঙবে। দিনের বেলা দিলেই হত। সূর্যর আরোহণ যত সহজে লক্ষ করা যায়, চন্দ্রের তত না। যা-ই হোক। এ জন্য তাকে মধুরা বকতে যাচ্ছে না।

একটি বাদামি ঘোড়া ছুটতে ছুটতে অদূরে এসে থামল। মধুরা! এসে গেছে। সে অতি বলিষ্ঠ নারী, যেমন দীর্ঘকায়, তেমনই তার পেশিসমূহ। স্তন দুটি সে তুলনায় আকারে অনেক ছোট। বর্তুল, কঠিন, এতটুকুও নমিত নয়। সে তার হরিণের চামড়ার পরিধানটি ফালা ফালা করে

পরতে ভালবাসে। চলাফেরা করতে সুবিধে হয়। লাফিয়ে অশ্ব থেকে নামল মধুরা।

—কী সংবাদ ভগ? মানুষগুলো বাঁচবে না পচে যাবে?

—নিশ্চয়ই বাঁচবে।

—এখনই তো কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

ভগ রহস্যময় হাসি হাসে— ওরা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। মধুরা, ওদের বিরক্ত করবার দরকার নেই। ভগর কার্যকলাপ নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দাও।

—তাই নাকি! মধুরাকে মানো না নাকি?

—ভুল বুঝো না মধুরা। এ ওষধির ব্যাপার, জন্তু-জানোয়ারকে গভীরভাবে দীর্ঘদিন লক্ষ করে, নিজে বিষফল, অমৃতপাতা খেয়ে শিক্ষা করছি, এখানে তোমার নাসিকাটি প্রবেশ না করালেই ভাল।

—বীজকণাগুলি সিদ্ধ করে নতুন খাদ্য কে তৈরি করেছিল? কার বক্ষ থেকে অমৃতধারা বেরোয়? বৎসগুলিকে নিজের শরীর থেকে খাওয়ায় কে?

—মানছি, মানছি, সব মানছি। কিন্তু এখন বিরক্ত কোরো না।

লাফিয়ে অশ্বের ওপর উঠে বসল মধুরা, মুখে তির্যক হাসি। সে সব কিছু পরিদর্শন করছে, না করলে এই মূর্খগুলি একটার সঙ্গে একটা গুলিয়ে ফেলবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধান্য, ধান্য, এবং সেই ধান্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া যারা শেখাবে তারা।

সন্ধ্যাতারা আকাশে জ্বলজ্বল করছে, বিপুল বনস্পতির তলায় এসে দাঁড়াল মধুরা— কী যেন একটা জটলা পাকিয়ে আছে! অদূরে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে কে? —নিমেষ? কেন?

আবার নামে অশ্ব থেকে মধুরা। এগিয়ে যায়। বিশালকায় এক নারীর মৃতদেহ, কালো, শক্ত হয়ে গেছে, মৃদু দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে অল্পবয়স্ক একটি নারী।

—নিমেষ— বজ্রকঠিন স্বরে ডাক দিল মধুরা।

চোখ তুলে তাকায় নিমেষ। তার আগুনটি এতক্ষণে ভালভাবে

জ্বলেছে। আরও কিছু কাঠকুটো সারারাতের জন্য সংগ্রহ করে রাখা দরকার।

—এই শবটি এখনও এখানে পড়ে কেন? দূষিত হবে না চারদিক। ভাসাওনি কেন?

—ওই নারীটি কিছুতেই শব ছাড়তে চায় না।

আশ্চর্য হয়ে মধুরা আলাদা আলাদা উচ্চারণ করল— শব ছাড়তে চায় না? বলো কী? কেন?

—জানি না মধুরা। বলছে মা, আমার মা, আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। উঠছে না, খাচ্ছে না, কথা বলছে না, একভাবে উপুড় হয়ে রয়েছে।

—মা? অতি আশ্চর্য! বৎসগুলি স্তন্যদাত্রী মারা গেলে কাঁদে বটে। দুধ পায় না বলে কাঁদে, দ্বিতীয় কেউ স্তন্যপান করালেই চুপ করে যায়। কিছু দিন প্রথমাকে খোঁজে, অতি মধুর ভঙ্গিতে ঠোঁট ফোলায়। কিন্তু বয়স্ক শবের জন্য অল্পবয়সি কাউকে তো কখনও কাঁদতে দেখিনি। ওকে টেনে নিয়ে যাও। শবটি বরং পুড়িয়ে দাও।

—মধুরা, ওকে একটু সময় দিতে হবে। ও শোকাতুর।

শেষ কথাটা নিমেষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে শব্দটি তৈরি করল। এরকম সে প্রায়ই করে থাকে, সকলেই বুঝতে পারে। মধুরা প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভগ ও নিমেষ মধুরার বিশেষ প্রিয়পাত্র। নানা ভাবে তারা গোষ্ঠীকে সাহায্য করে।

—আর সময় দেওয়া যায় না নিমেষ। আমি চলে যাচ্ছি। একটু পরে কাউকে পাঠাব, এই বৃক্ষতলে যেন মৃত্যুর ছোঁয়া না থাকে।

—মধুরা, এই সেই নারী যার সাহায্যে আমি শস্য খুঁজে পেয়েছি।

—কীরকম?

—ও নদীর ধারে বসে বড় পত্রাধারে সাদা বীজের মতো কিছু খেত। একদিন চলে যেতে খেয়ে দেখি এ আমাদের সেই শস্য যা থেকে থেকে অরণ্যে পাই, খাই দুর্লভ, লোভনীয়। রাত নেমে আসছিল। মেয়েটিকে অনুসরণ করে আমি চাঁদের আলোয় বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আবিষ্কার করি। তারপরেই তো আমাদের যত পরিকল্পনা।

—এর মধ্যে ওর সাহায্যের কী হল? তুই নিজের বুদ্ধিতে বার করেছিস।

—ও না থাকলে কি পারতাম?

—বেশ। তবে আমার ওই শেষ কথা। কিছু সময় পরে কাউকে পাঠাব, বৃক্ষতল যেন মৃত্যুহীন থাকে। আর ওই মেয়েটাকে ভগর কাছে পাঠিয়ে দে। হাতটা তো বেশ ফুলেছে দেখছি।

মধুরা খটাখট করতে করতে চলে গেল।

সহসা মাতঙ্গীর দেহ থেকে মুখ তুলল রঙ্কা।

—ও কে?

—আমাদের নেত্রী।

—মাতঙ্গীর মতো? উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকাল রঙ্কা। তারপর বলল— ভগ কে?

—ভগ ক্ষত সারায়। খুব আশ্চর্য ক্ষমতা তার।

—মাতঙ্গী তা-ও পারত। মাতঙ্গী অসাধারণ ছিল। ওরকম আর হবে না। আমি মাকে অবহেলা করেছি, তার কথা শুনিনি। নির্দেশ অমান্য করে কত কাজ করেছি। আজ তার শাস্তি দিল অরণ্য, নদী, আকাশের দেবতা। আমাকে ভগর কাছে নিয়ে চলো। আমি সুস্থ হতে চাই। মাতঙ্গীর দেহ পুড়িয়ে দাও হে বিদেশি। নদীতে ভেসে গেলে মাছে খোবলাবে, ক্রমশ বিকৃত কুৎসিত হয়ে উঠবে দেহটি। আমি সইতে পারব না।

নিমেষ আবার তাকে তুলে নিতে যাচ্ছিল। রঙ্কা বলল— আমি চলতে পারব। আমাকে শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। —বলে সে নিজেই পা বাড়াল। নিমেষ তা সত্ত্বেও এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার গালে ঠোঁট ঘষল। পলকের মধ্যে লাফ দিয়ে নীচে নেমে, আগুনঝরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল রঙ্কা। বলল —আমার ইচ্ছে নেই, নেই, নেই। —সে হাত দিয়ে গালের ওপর নিমেষের স্পর্শ মুছে দিল। মুখ বিকৃত করে বলল— দুর্গন্ধ, দুর্মতি বিদেশি। শস্যর জন্যে আমাদের আক্রমণ করলে? মাকে মারলে? শস্য কি কারও একার? আমরা ফলাতে শিখেছি। তোমরাও শিখে নিতে পারতে।

—শিখতে চাইলে মাতঙ্গী দিত?

—কেন? তোমাদের মধুরাও তো নেত্রী, যে ভাবে মানুষগুলিকে মারলে তাতে মনে হয় তুমিও বীর্যবান, যে ভাবে আমাকে অনুসরণ করে শস্য আবিষ্কার করলে, তাতে মনে হয় তুমি অতি ধূর্ত। শস্য আর জল, বীজ আর ছোট ঘাসের খেলা দেখে ধান্যর রহস্য জানতে বুদ্ধিতে কুলোল না? আমাদের সবাইকে এমন করে... মাতঙ্গীকে... মাকে... বলতে বলতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সে দু হাতে নিমেষের বুকে ঘুসি মারতে লাগল। ধূর্ত, দুষ্ট বি-গোষ্ঠী। যাও এখান থেকে চলে যাও... আমাকে ভগর কাছে নিয়ে যাবার দরকার নেই। আমি হরিণদের বন্ধু। গহন থেকে গহনে চলে যাব, আমি ওষুধ বার করে নেব। যাও, যা—ও বলছি।

নিমেষের মাথা খুব ঠান্ডা। সে কোমল স্বরে বলল— আমি পথ দেখাচ্ছি, তুমি সঙ্গে সঙ্গে এসো। ভগ দুই সূর্যের মধ্যেই তোমাকে ভাল করে দেবে।

কিন্তু রঙ্কা পেছন ফিরে তাকাল না। জ্বলন্ত চোখে নিমেষের দিকে চেয়ে সত্যি বনের গহনে হারিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল নিমেষ। নারীটিকে খুব নরম মনে হয়েছিল। নরম নারী তার ভাল লাগে। কিন্তু নারীরা কখনও পুরো নরম হয় না। বৎস ধারণ করে বলে, যুদ্ধ পরিচালনা করে বলে, শিকারের মাংস ভাগ করে বলে তাদের ভীষণ অহংকার। এমনও হয়েছে ঘুরতে ঘুরতে তারা কোথাও জল পায়নি। কণ্ঠ শুষ্ক, একেবারে প্রাণ বেরোনোর অবস্থা, তখন মধুরা তাদের নিজের বুকের দুধ দিয়েছিল। আরও যে কটি নারীর বুকে দুধ ছিল, তাদের নির্দেশ দিয়েছিল প্রত্যেকের পিপাসা মেটাতে। তারপর তারা একে অপরের পিপাসা মেটায়। দেবতারা— এই আকাশ, জল, মাটি, অরণ্যানী যে নারীদের কী শক্তি দিয়েছে, কেন দিয়েছে— ভাবলে অবাক লাগে। সে বুঝেছে রঙ্কাকে অনুসরণ করলে সে তাকে আরও ঘৃণা করবে। ওকে যেতে দেওয়াই ভাল। ক্ষত এমন কিছু নয়। বাতাস, জলই কিছুটা সারিয়ে দিয়েছে, সে নিজে কিছু প্রাথমিক ওষধি লাগিয়েছে, রঙ্কা

যদি জানে আরও ওষধি, সত্যিই সে নিজের চেষ্টাতেই সেরে উঠবে। সে বন থেকে প্রচুর শুকনো কাঠ সংগ্রহ করল, মাতঙ্গীর ভারী দেহটি টেনে তার ওপর তুলল, আরও ডালপালা চাপা দিল। তারপর পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিল। মাঝে মাঝেই কাঠকুটো ফেলতে হল। কিন্তু এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল দেহটি, দেখে নিমেষ চমৎকৃত হয়ে গেল। তারা মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেয়। বন্যজন্তুদের বিচরণ স্থানে রেখে আসে। কিন্তু এই পদ্ধতিটি বেশ। অনেক রাতে মধুরা পরিদর্শনে এসে বৃক্ষতল পরিষ্কৃত দেখে খুব খুশি হল। চাঁদ মাঝ গগন ছাড়িয়ে নামতে শুরু করেছে। চরাচর অনাবিল আলোয় পরিপূর্ণ। গাছগুলি মৃদু বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দূর থেকে ধন্যার ছলচ্ছল শোনা যাচ্ছে। মধুরা এক লাফে অশ্ব থেকে নামল। তারপর নিমেষকে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিল। শবদাহর স্থানটি থেকে একটু দূরে তারা মিলিত হল। মধুরার যতক্ষণ না তৃপ্তি হল, নিমেষকে বারংবার চেষ্টা করতে হল। গালে সপাটে চড় খেতে হল। অবশেষে নারীকণ্ঠের সন্তোষের শিস যখন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে ধন্যার তীর ভরে দিল, তখন নিমেষ ছুটি পেল।

মিলনের সময়ে ব্যাঘিনির মতো তার ঘাড় কামড়ে ধরেছিল মধুরা। নিমেষ নিমেষ, তুই আরও বলবান হয়ে ওঠ, সিংহবিক্রম হোক তোর, তুই যেন আমাকে এক শয়নে তৃপ্ত করতে পারিস, কেননা তোর তুল্য পুরুষ আর গোষ্ঠীতে দেখি না। গলগল কলকল করে আদরের রাগের সোহাগের কত কথাই যে সে বলে যেতে থাকল। কিন্তু নিমেষ সে ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারছিল না। কেন সে বুঝতে পারল না। অন্য সময়ে মধুরার কঠিন স্তনে বক্ষ পিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দু পায়ের ফাঁকে অঙ্গটি তলোয়ারের ফলার মতো হয়ে যায়। আজ তার সেই প্রিয় অঙ্গটি যেন কেমন আনমনা হয়ে রয়েছে। কপোতীর মতো ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে তাকে চুম্বন করে ছেড়ে দিল মধুরা। অস্ফুটে বলল—নিমেষ, তুই আমার তুই আমার তুই আমার... যাঃ, ভাগ এবার, বেশ ভাল হয়েছে মিলনটি।

সর্বমঙ্গলা

সর্বমঙ্গলা ঠাকরুনের দেহটি আশি বছর পরে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। সাদা গরদের কাপড়ে সরু একটু মেরুন পাড়। সারদা-মার যেমন থাকত। ফুলের মালা গলায়। বস্তুত সারা শরীরই ফুলে ঢাকা। কপালে চন্দনের রসকলি। মাথার শনের নুড়ি চুলগুলি গুছিয়ে চারদিকে ছড়ানো, তার ওপর রঞ্জার মামিমারা ছোট ছোট সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। মামিরা বলতে সাতজনের মধ্যে অবশিষ্ট তিনজন। চারজন এক-এক করে মারা গেছেন। মামারাও বেশির ভাগই গত। দুজন কোনওক্রমে বেঁচেবর্তে আছেন। যে মহিলা দুটি সর্বমঙ্গলার দিন ও রাতের সেবা করত তারাই খালি সাশ্রু নয়নে বসে আছে। তাদের খুব সম্ভব চেষ্টা করলেই চোখে জল আসে এবং কোনও মৃত্যুর ক্ষণ কান্না ছাড়া অশুভ এমন একটা ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সেই প্রফেশন্যাল মোর্নার বা রুদালিদের মতো কান্না সাপ্লাই করছিল। রঞ্জার মা বেদবতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন—সেজবউদি বললেন, বস বেদো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কিছু করতে পারবি?

বেদবতী বসলেন। বেদবতীর আনা কাপড়ই মাকে পরানো হয়েছে। একমাত্র মেয়ে। জীবিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনিই এখন সবচেয়ে বড়। না, তিনি কিছু করতে চাননি। এর আগে যখন মা আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, তখন কিছু করার ছিল কি না ভাবছিলেন। কোথাও কোনও ত্রুটি হয়ে গেছে কি না। যে কোনও মানুষের মৃত্যুর সময়ে আপনজনদের মনে এই প্রশ্নটা জাগে। 'একটু চিকিৎসার সময় পাওয়া গেল না' কি 'একটু সেবা নিলে না মা'—এই ধরনের কথাবার্তা মৃত্যুর পর শোনা যায় খুব। সবাই জানে চিকিৎসার সময় পাওয়া গেলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হত সেটা ভাবনার কারণ, কঠিন অসুখ এক চিকিৎসায় সারেও না। এক পৌনঃপুনিক কষ্ট ও দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয়ের উৎসও হয়ে থাকে। আর সেবা নেওয়া? সেবা যাকে নিতে হয়, আর যাকে দিতে হয়, দিনের পর দিন উভয়েই মনে মনে কী প্রার্থনা করে? সে কি উচ্চারণ করা যায়?

নাঃ, সর্বমঙ্গলার জন্য বেদবতীর কেন, কারওই কিছু করার ছিল না। তাঁর রোগ বার্ধক্য। বয়সের ভারে একটি একটি করে দেহযন্ত্র বিকল হয়েছে। সর্বমঙ্গলার মনের, মগজের মৃত্যু ঘটে গেছে অনেক দিন, বেদবতীর এখন যা বয়স তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি মনে করতে পারেন মা সামান্য কটা গোলমেলে কথা বলেছিলেন একদিন।

—নাতজামাই পরশু দিন এসেছিল, বড় ভাল লাগল রে।

—কে নাতজামাই?

—ওই যে রে তোর রঞ্জুর বর?

—সুবীর? এসেছিল?

—হ্যাঁ, বউমারা নুচি মাংস খাওয়ালে। আমায় পেন্নাম করলে। বেশ ভাল আঁব এনেছিল।

তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সুবীর কাউকে পেন্নাম করবার পাত্র নয়, মামা-শ্বশুরবাড়িতে কবে নাকি সে অপমানিত হয়েছিল, জীবনে কখনও পা দেয়নি। আজও আসেনি। তিনি জনান্তিকে বউদিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁরা অবাক! —সুবীর? নুচি...? আঁব... তুমিও যেমন বেদো, মায়ের আজকাল ভীমরতি হয়েছে। মনে মনে ভাবেন, কল্পনার জগতে বাস করেন।

তাঁর দাদাদের নাতি-নাতনিরা কেউ-কেউ হাসাহাসি করে বলেছিল কর্তা মা এবার গপ্পো লেখো। ভালই তো বানাতে পারো দেখছি।

ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে ছিলেন মা। —সুবীর আসেনি? তবে কে এল খুকি? কে আঁব দিল? ছাড়িয়ে দিল আমাকে সেজবউমা, এখনও যে জিবে সোয়াদ লেগে রয়েছে রে!

তখন আরও বুঝেছিলেন বেদবতী— এ স্বপ্ন কল্পনা। সেজবউমা অর্থাৎ তাঁর সেজবউদি প্রমীলা মাকে আদর করে আঁব ছাড়িয়ে দেবার পাত্রীই নয়। সাত বউয়ের মধ্যে সবচেয়ে মুখরা, কুচুটে, মায়ের মুখের ওপর কড়া কথা বিশ্রীভাবে বলতে প্রমীলা বউদির কখনওই বাধত না।

—নুচি-ক্ষীর খেতে সাদ হয়েচে? আর কত খাবে মা? নিজের তিন তিনটে ছেলেকে, দুটো বউকে তো গপাগপ খেলে! এর ওপর আবার

-ুচি-ক্ষীর? হেগো ছত্রাকার করলে কে পোস্কার করবে? কোন বউ, ডিউটি ভাগ করে দাও দিকিনি!

এসব বেদবতীর উপস্থিতিতেই। ধমধম করে চলত সেজবউদি, সেজদা মারা যাবার পর খেপে গিয়েছিল একেবারে। সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন সেজদা, মা কী করবেন? দিবারাত্র ছেলের মাথার ওপর আইসব্যাগ ধরে বসে থাকতেন। সে-ও শেষ হয়ে গেল। অপয়া বুড়ি। ছেলের পরমাই নিজে কেড়ে থুয়েছে।

সর্বমঙ্গলা তখনও একেবারে অ-ব্যক্তি হয়ে যাননি, ছেলের মৃত্যুর খোঁটা শুনে তিনি জ্বলে গিয়েছিলেন, বলেন—বউমা এখন আমি যদি তোমাকে অপয়া বলি, তো কী হয়? গ্রামদেশ থেকে বউ এনে কী ভুলই করেছি। কথাবার্তা একেবারে যাচ্ছে-তাই। শোনো মা, কোথায় লাগছে তোমার আমি বুঝতে পারছি। তুমি পেড়ে শাড়ি পরবে, গয়না গা থেকে নামাবে না, এই আমি তোমার শাউড়ি আজ হুকুম দিয়ে দিচ্ছি। তোমার মাছ-ভাত যেন কেউ বন্ধ না করে। করলে আমার এই মেয়ের মাথার দিব্যি!

সর্বনাশ! ছেলে খেয়েছে আবার মেয়েও খেতে চায়! সবাইকার মনোভাব তখন এইরকম। কিন্তু সত্যিই আজও সেজবউদির মাছ-ভাত অটুট আছে। অন্যরা বৈধব্য পালন করে। সেজবউদির বেলা ঠাকরুনের অমোঘ নির্দেশ। সেজবউদি দেখতে সুন্দর ছিল। মানে ফরসা, বড় বড় চোখ নাক এই। বেদবতীর ভাল লাগত না। সুন্দর হলেই কি আর সুন্দর হয়? যেন বিষধর সর্প। কথার বিষে সংসার জ্বালিয়ে দিত। সব তার চাই। কাপড় গয়না না পেলে সেজদার ধুধ্ধুড়ি নাড়িয়ে দিত। খাবার সময়ে বলত—আমার বাপ-কাকা সব জমিদার। পাত-কুড়োনো খেয়ে ভাই আমার অভ্যেস নেই। আগে আমার ভাত-তরকারি আলাদা করে রাখবে। বড় গাদার মাছ ছাড়া আমি খেতে পারি না। শেষ পাতে একটু দুধ চাই। খেতেও পারত খুব। বলত—বাপ মা চিরকাল খাইয়েছে মাখিয়েছে। সাত ছেলের পর এক মেয়ে, আদরে মানুষ হয়েছি—আমি সেইরকমই চালিয়ে যাব, না দিতে পারো তো বাপের বাড়ি চললুম।

মেয়েরা সব শেষে হাঁড়ি-কড়া-পোঁছা খাবে। মাছ জুটবে না, ছাল কাঁটা দিয়ে সধবা-ধর্ম রক্ষা করতে হবে, দুধ বাচ্চারা বুড়োরা আর ব্যাটাছেলেরা খাবে—এইরকমই তো নিয়ম তখন সব বাড়িতে। ভাল জিনিসটি আগে ব্যাটাছেলেদের পাতে পড়বে—এই। সেজবউদি তুমুল করত। কুটুম বাড়ি থেকে তত্ত্ব এল—আগে একটা বড় রেকাবির মতো ক্ষীরমোহন তুলে নিল। শাশুড়ি বললেন—ও কী করছ, তত্ত্বের জিনিস যে ভাগ হবে গো, ওই ক্ষীরমোহন যে তিন ভাগ হবে, বাড়ির সবাই, এপাশ ওপাশ দু বাড়ি, আত্মীয়স্বজন... সেজবউদি বলল—আমার মা-বাবা সবচেয়ে আগে আমার পছন্দের জিনিসটি তুলে নিতে দিত, সে শাড়িই হোক খাবারই হোক। এখন তো আপনাকে মা মেনেছি, আপনি না দিলে অগত্যা আমাকেই নিতে হয়। আমার বাপের বাড়ি থেকে ঠিলে ঠিলে পাটালি, কলসি কলসি নলেন গুড়, মুক্তকেশী বেগুন, কাঁড়ি কাঁড়ি সজনে ফুল খাচ্ছেন না? —খাউন্তি-বউ, জাঁহা বেজে, অলক্ষ্মী, কিছু বলেই সেজবউদিকে কায়দা করতে পারা যায়নি।

সেই সেজবউদি আজ বেদবতীর জন্যে এক গেলাস মিছরির পানা এনে দাঁড়িয়েছে—খাও দিকি! তোমার আমার বয়সটাও কিছু কম হল না। শোকবাড়িতে কারও সেসব মনে থাকবে না, আরেকটা মিত্যু ঘটে যাবে।

দাঁত বাঁধানো হলেও সেজবউদি র-ফলা ঋ-ফলা উচ্চারণ করতে পারছে না আজকাল।

—চলো, ভেতরে চলো বউদি।

—কেন বেদো? সবার সামনে খেতে লজ্জা করছে? আশি বছরে ঘা দিলুম, কেউ আর আমাদের দিকে দেখবে না। কী রে, দেখবি তোরা? মাঝখান থেকে পিত্তি পড়ে আমরাই ভুগব। নাও দিকি খেয়ে নাও। মায়ের পরানটা ঠান্ডা হবে। 'আমার খুকি খাচ্ছে।' খুকি বলবার আর কেউ রইল না তোমার।

গড় হয়ে সর্বমঙ্গলার পায়ে প্রণাম করলেন সেজমামিমা—কত অকথা কু-কথা বলেছি মা। মাফ করে দিয়ো। দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল সেজমামিমার চোখ থেকে।

এখনও এক পিঠ কাঁচা-পাকা চুল মামির। মায়ের চেয়ে ক' মাসের ছোট। মানে ওই আশিই। সোজা দাঁড়ায়, পেন্নাম করে হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখটি যেন ঘষামাজা, সবুজ নকশাপাড় টাঙাইল শাড়িটি পাটভাঙা। মৃতদেহ নামানোর পর মামিমা ভাল শাড়ি পরে চুলটুল গুছিয়ে পাবলিক-এ নেমেছেন।

হাসিও পেল। কিন্তু সূক্ষ্ম একটা শংসা এঁর জন্য তার বরাবরই ছিল। মা জীবনে কখনও কারও নিন্দে করেননি। সেজমামিরও না। কিন্তু অপছন্দটা তো বোঝা যেত! রঞ্জা কিছু বললে অবশ্য খুব মন দিয়ে শুনতেন, মাঝে মাঝে মাথা নাড়তেন।

—আচ্ছা মা, গ্রামের ধনী ঘরের আদরের দুলালি। নির্ভীক স্পষ্টবাদী তৈরি হয়েছেন। একটু স্পয়েল্ট মানছি। শ্বশুরবাড়িতে এসে একজন মেয়ে অর্থাৎ শাশুড়ির অন্য মেয়েদের জন্য বরাদ্দটা যদি পছন্দ না হয়, বঞ্চনা আর অপমানটা যদি ভাল না লাগে? অন্যরা মেনে নিয়েছে মুখ বুজে। আড়ালে গজগজ করেছে। সেজমামি সোজাসুজি প্রোটেস্ট করেছেন। নিজের অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছেন। না দিলে তো কেড়েই নিতে হবে। হবে না? কেড়ে নেওয়ার ভাবটা কড়াই হয়।

মা মৃদু হেসে চিন্তিত মুখে মাথা নাড়তেন—কী জানিস রঞ্জা, মেয়েদের এই যে সব ব্রতপার্বণ জয় মঙ্গলবার, ইতু, শীতলষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী... এসব আমার মনে হয় মেয়েদের খাওয়ানোর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। জয় মঙ্গলবারে আম। ইতুতে নতুন শীতের তরিতরকারি ঘি দিয়ে, শীতল বা চাপড়া ষষ্ঠীর তরিবতও কিছু কম নয়। আমাদের গোটাসেদ্ধর সঙ্গে, ঝুরো পোস্ত, সজনে ফুল চচ্চড়ি, দই— এসব পাঁচরকম ব্যঞ্জন থাকতই, একেবারে মাস্ট।

তাই নাকি? তা দুর্গাষষ্ঠীর উপোসটা? জামাই-ষষ্ঠীতে ষোড়শ ব্যঞ্জন রান্না করে নিজের উপোস, না ফলার? তা-ও আবার কোন ভাগ্যবানের জন্য? কে না কে জামাই, যে নাকি কক্ষনো আপন হয় না তার জন্য। হাসালে মা।

—ফলার তো ভাল রে! ফলে শরীর সুস্থ হয়। ফল দুধ তো সব রকমের ভিটামিন তোকে দিচ্ছে। তাই তো মেয়েরা বেশি বাঁচে।

—যদিও সে বাঁচার তেমন কোনও...

'মানে নেই' বলতে গিয়েছিল রঞ্জা। সামলে নিয়েছিল। মায়ের জীবনের কোনও মানেও তো তা হলে অস্বীকার করা হবে। নিজেকে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল রঞ্জার।

মা মৃদু চোখে চেয়ে ছিলেন। রঞ্জার বরাবর ধারণা মাকে যতটা মনে হয় মা তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরেন। অসাধারণ ডিপ্লোম্যাট। কোনও মেয়ের যদি মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস খুব বেশি থাকে তা হলে সে তার যুক্তি বুদ্ধি এসব স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে। কিছু কিছু লোকে তাকে বাড়ির বড়সাহেব কি ডেপুটি কিংবা জাঁহাবেজে ইত্যাদি বললেও সে তার অস্তিত্ব চমৎকার টিকিয়ে রেখে নিজের সংসারের মঙ্গল করতে পারে, যেমন দিদিমা সর্বমঙ্গলা। কিন্তু যে বুদ্ধিমতী অথচ মৃদু স্বভাবের, চাপা, তাকে অবলম্বন করতে হয় ডিপ্লোম্যাসি, যার ঠিকঠাক বাংলা 'কূটনীতি' নয়। কিছুই বুঝি না, আমি ভালমানুষ লোক বাপু এই ভাবে এরা বুদ্ধি খাটিয়ে যায় অন্তরাল থেকে। বেদবতী সেই জাতীয় মেয়ে। রঞ্জার হঠাৎ মনে পড়ল তার দিদি মঞ্জুলিকার যৌবনের একটা ঘটনার কথা। দিদি খুব ফরসা ছিল, খুব কেশবতী, বয়সের মায়ায় তার দেহে তখন রূপের জোয়ার, মনে আবেগের। পাড়ার একটি দাদা-গোছের ছেলের প্রেমে পড়ল দিদি। পুজোর সময়ে যেসব অস্থায়ী প্রেম গজায় তেমনই সবাই মনে করেছিল। কিন্তু দাদা অর্থাৎ সঞ্জয় একদিন এসে মুখ গম্ভীর করে ঘোষণা করল রমেনের সঙ্গে মঞ্জুকে এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে। মা বললেন—তোরা ওকে কেউ বকাঝকা করতে যাসনি!

—মানে? তোমার প্রশ্রয়েই...

—হ্যাঁ বাবা, প্রশ্রয়ও আমার, আশ্রয়ও আমার। আর দেখো, বাবার কানে তুলো না, আমি দেখি কী করতে পারি।

রঞ্জা পুরো ঘটনাটা জানত। সে উৎকর্ণ হয়ে আছে মা কী করেন, কী

গেলেন দেখতে। মঞ্জু তার প্রথম প্রেমের ঘোরে রাতে তখনও জেগে আছে, মা ভেবেছেন রঞ্জা বুঝি ঘুমিয়ে গেছে। আস্তে ডাকলেন—মঞ্জু-উ।

—উঁ!

—তোকে একটা কথা বলব?

—কী বলবে জানি মা। আমায় তোমরা ক্ষমা কোরো। আমি রমেন ছাড়া আর কাউকে...

—না না, আমি সে কথা বলছি না রে। ভালবাসার ওপর কারও হাত নেই। তুই যদি ওকে সত্যিই ভালবাসিস, নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব। আমি নিজে। তা তুই সতিন নিয়ে ঘর করলেও।

—মানে?

—না, দ্বিতীয় বিয়ে এখন আইনে অসিদ্ধ হলেও অনেকেই করছে। লুকিয়ে রাখছে।

—তো?

—শুনেছি রমেনের কলাবাগান বস্তির যমুনার সঙ্গে গত বছর থেকে জানা-শুনো। যমুনার মা বলছিল। কে জানে কালীঘাটে সিঁদুর দিয়েছে কি না। ও বিয়ে অবশ্য সিদ্ধ নয়। যমুনা যমুনার মা কিচ্ছু করতে পারবে না... আমি ভাবছিলুম... মা কথা শেষ করলেন না।

কিছু দিন পর রমেন ও তার দলবলের হাতে মঞ্জুর ছোটভাই রঞ্জন যারপরনাই লাঞ্ছিত হল।

রাস্তার ঠিক মোড়ে, রঞ্জন বাড়ি ফিরছে। রমেন বলল—কী হে ছোট সম্বন্ধী, আমার নামে নাকি যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছ। খচড়ামো বার করে দেব মেরে, ঠ্যাং নিয়ে আর জীবনে হাঁটতে হবে না। আরও বহু গালাগাল। রঞ্জন কাঁদো-কাঁদো উত্তেজিত মুখে বাড়ি ফিরে মঞ্জুলিকা অর্থাৎ তার অতি প্রিয় দিদিকেই সব বলল—শালা, খচড়ামো, ঠ্যাং ভেঙে দেব...সব। রঞ্জন কিছুই জানত না। মঞ্জুলিকা শুনে চুপ। সাত দিন বাড়ি থেকে বেরোল না। তারপর তিন দিন ঠিক ইউনিভার্সিটি গেল। চতুর্থ দিন বাড়ি এসে বলল—মা, আমি রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছি, যদি অ্যাসিড বাল্‌ব মারে! ভয় দেখিয়েছে।

বাগবাজারে এই মামার বাড়ি থেকে মঞ্জুলিকার বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম বারো বছর সে আমেরিকায় ছিল, এখন দিল্লিতে দেবেশদা পোস্টেড। সেখানেই আছে। বাড়ি করেছে ময়ূর বিহারের দিকে। শিগগিরই দেবেশদার রিটায়ারমেন্ট।

সর্বমঙ্গলার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জার মনে হল—এই মাতামহী ঈশার প্রমাতামহী, পুতির বিয়ে দেখে গেছেন। কী অসীম উৎসাহ ও দাপট। উনি যখন স্ববশে ছিলেন বাগবাজারের বাড়িতে, সর্বমঙ্গলার কথাই ছিল শেষ কথা। কত গ্রীষ্মের ছুটিতে বাগবাজারের বাড়িতে কাটিয়ে গেছে। মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে হুল্লোড়। দিদিমার টঙের ঘর থেকে আচার চুরি করে খাওয়া। দিদিমা বুকে একটা কোমরে একটা গামছা পরে মাংস রাঁধছেন, সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে ভাইবোনেদের হাসি, ছোটমামার ঘোষণা গামছা পরে রাঁধা পাঁঠা সে খাবে না, দিদিমার মুচকি হাসি—কী করব বল, তোদের বাবা বেঁচে থাকলে লাল পাড় শাড়ি পরে রেঁধে দিতুম এখন। কাপড়টা অবশ্য তারপর কেচে দিতে হত। কিন্তু এখন আর... গামছাই তো ভাল। কী ভীষণ শুচিবাই ছিল দিদিমার। দিনে কতবার যে স্নান করতেন! রাস্তার কাপড়ে ট্রেনের কাপড়ে কেউ ছুঁলে স্নান। সকালবেলা পুজোর আগে স্নান, দুপুরবেলা ভাত খেয়ে স্নান। বিকেলের নিয়মমাফিক গা ধোয়া, তাদের কারও দিদিমাকে প্রণাম করার হুকুম ছিল না।

রঞ্জু, মঞ্জু শুনে যা... ভাইবোনেরা ছুটল, সবার হাতে একটা করে আপেল দিলেন। দিদিমার রাত্রে ফলাহার বলে ফল থাকত বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনও ফল হাতে করে আসতেন। ডাক্তারের হুকুম ছিল রোজ একটা করে আপেল তাঁকে খেতেই হবে। দরকার হলে সেদ্ধ করে। কিন্তু আপেল নাকি বিলিতি ফল, তাই নাতি-নাতনিদের একটা করে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে কাপড় কেচে ফেলতেন দিদিমা। তখন মাথায় জল না দিয়ে স্নানকে 'কাপড়-কাচা' বলত, বৈঠকখানাকে 'বাইরের ঘর' বলত, শৌখিন স্ন্যাক্স জাতীয় খাবারদাবারকে 'খাবার' বলা হত। ন'মামিমা খুব ভাল 'খাবার' করতে পারতেন। তখন লোকে বাড়ি এসে কড়া নাড়ত।

'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া/বন্ধ হল রাতের কড়া নাড়া'... সেই কড়া-নাড়ার রূপকল্পতে বছরকয় পরেই ফুটনোট দিতে হবে। এই অতীত এখন ওই খাটে শুয়ে। শ্মশানে চলে যাচ্ছেন সেজেগুজে। কিছু দিন স্মৃতি-ছবি হয়ে থাকবেন, তারপর সমাজে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবেন। 'সেকালের নারী' বলে কেউ ইতিকথা লিখবেন। 'শেষ প্রমাতামহী' বলে উপভোগ্য রম্যরচনা। কোথাও মধুর, কোথাও বিধুর কোথাও আবার হাস্যরসে টইটম্বুর।

হে সর্বমঙ্গলা, তুমি সমাজের হাতে গড়া রক্তমাংসের এক প্রতিনিধি পুতুল। আমি জানি না তুমি বিশেষ কি না। তুমি সেই সময়ের সব বধূর মতো শাশুড়ি-নিপীড়িতা, সব শাশুড়ির মতো বউ-কাঁটকি। সব মায়ের মতো ছেলেদের ব্যাপারে স্নেহান্ধ, মেয়েদের ব্যাপারে ভীত, তুমি সে সময়ের কলকাতা চব্বিশ-পরগনার ভাষায় আঁব, নুচি, নংকা বলতে, নেপ রোদে দিতে, নেবুর আচার করতে, কোনও অজ্ঞাত বিচারে বিলিতি আমড়ার ভক্ত থাকলেও বিলিতি বেগুন নৈব নৈব চ। টকের কাজ সারতে তেঁতুল দিয়ে, মিষ্টির কাজ সারতে গুড় দিয়ে, তোমার শিলে প্রতিদিন তিন চারটি গোলা পিষে ঘষে তৈরি হত হলুদ, জিরে, ধনে ও লংকা। এই এবং গুড়-তেঁতুল সম্বল করে তুমি অমৃত রাঁধতে তোমার কালিঝুলিমাখা রান্নাঘরে। তুমি কোনও পদ 'বানাতে' না, রান্না করতে কিংবা তোয়ের করতে। তোমার হেঁশেলে তরিতরকারি কোটা হত, আনাজ কাটা হত না। তুমি দইয়ে দম্বল দিতে, সাজা না, তুমি ঝোল সাঁতলাতে, 'সম্বরা' দিতে না। ব্রাহ্মণ-বালককে গুরুপুত্র বলে প্রণাম করতে। পইতের ওপর তোমার গভীর ভক্তি ছিল। ভক্তি করে তাকে মাছের 'মুড়ো' দিয়ে মুগের ডাল নামক এক নশ্বর অমৃতটি খাওয়াতে। মাছের 'মাথা' কী জিনিস তোমার কাছে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিল; তুমি মাছের বিশেষত ইলিশ মাছের টক রাঁধতে ওস্তাদ ছিলে। তোমার গুরু ও গুরুপুত্র দুটি পাত চেটে চেটে পিঁপড়ের জন্য আর কিছু বাকি রাখত না। মৌরলা মাছ কুমড়ো বেগুন কখনও বা মুলো দিয়েও তুমি অম্বল রাঁধতে। মাছের টক, কিন্তু আঁবের অম্বল।

হে সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে, তুমি দু বছর অন্তর একটি করে শাবকের জন্ম দিতে। স্তন্য দিতে দিতে সংসারের কাজ সারতে। তোমার ঘুঁটে ও গুল দেওয়া আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এরা সংসারের প্রভূত সাশ্রয় করত। কাপড় ছিঁড়লেই তা দিয়ে ছোট ও বড় কাঁথা সেলাই করা ছিল তোমার দুপুরের অবসরযাপন। বুড়ো আঙুলে পাড় বেঁধে তা থেকে সুতোর গুছি বার করার দৃশ্যটি ভাবলে এখনও আমরা রোমাঞ্চিত হই, বড়ি আচারের একটি সাংবৎসরিক ভাঁড়ার ছিল তোমার, যা প্রায় মধুসূদনদাদার ভাঁড়ের মতো অনিঃশেষ, তোমার ছোট ছাতের কিচেন গার্ডেনের দৌলতে দু'চার দিন ভারী বৃষ্টিপাত হলে বাড়ি থেকে কারও বাজার যাবার দরকার হত না। অর্থাৎ তুমি জন্মদাত্রী, তুমি মহাপালিকা। তুমি সেবিকা হিসেবেও অনন্যা। দাদামশাই, মামারা ও মামিরা যাঁরা দুরারোগ্য রোগে মারা গেলেন তাঁদের প্রত্যেককে তুমি অনন্য মনে সেবা করেছিলে, সেই সেবার মিষ্টতা আমার যখন চিকেনপক্স হয় আমিও পেয়েছিলাম। তুমি আমাদের টালিগঞ্জের পুরনো বাড়িতে এসেছিলে যত দিন না আমার নিম হলুদ হয়। সংসারের কত টাকা তুমি তোমার পরিশ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র। কেননা রোজগেরে পুরুষমানুষের অন্নপানের রাজকীয় ব্যবস্থা নিজেকে এবং বউমাদের বঞ্চিত করে তুমিই করতে। টাকার অঙ্কে সবটা অনেক। মামিরা কিছু হাত-খরচ হয়তো পেতেন তাঁদের স্বামীদের কাছ থেকে, কিন্তু ভাত-কাপড় ছাড়া আর কিছু তোমাকে দেওয়ার কথা কারও মনে হয়নি। নাপিত-বউকে পুজোয় একটা শাড়ি, ছোটনাতির একটা খেলনা, প্রতিবেশী গিন্নিকে অর্থাৎ সখীকে একখানা ছাঁটা ফুলের আসন বুনে দিতে ইচ্ছে করলে টাকাটুকুর জন্য শরণার্থী হতে হত। অসীম কর্ত্রীত্বময়ী তোমার নিজের বলতে কিছু ছিল না। গহনাগুলি বউমারা মেয়েরা নাতনিরা দফায় দফায় পেয়েছে। সাচ্চা জরির বেনারসি দিয়ে বাসন কিনেছ। আর কী থাকতে পারে এক গৃহকর্ত্রীর। যোগ বিয়োগ করে হাতে সে-ই একটা ক্ষয়া পেনসিল।

হে প্রপিতামহী, সুফলা তুমি এত দিন এত দীর্ঘ সময় নিষ্ফল বেঁচেছ যে আজ তোমার জন্য সামান্য দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারছি না। ক্ষমা কোরো।

ইশ্‌শ্‌শ্‌

সন্ধেবেলা হাঁটতে বেরিয়েছে ঈশা। মেয়েকে পড়তে বসিয়ে এসেছে। পড়া মানে আঁকাই একরকম। কী সোশ্যাল সায়েন্সের প্রজেক্ট ওয়র্ক আছে, তার প্রচুর আঁকা, সেইগুলোই করছে। শুধু পড়া হলে সে এতক্ষণে সারা বাড়ি বলে শুট মেরে বেড়াত আর টেবিলে এসে ডিঙি মেরে একটা করে পাতা উলটে যেত। সামনে না থাকলে পড়বে না। কবে যে মানুষের মতো হবে মেয়েটা? এদের পড়াশোনাটা মায়েদের জীবনে একটা বিরাট ইস্যু। সে তো নিজে মেয়ের জন্য প্রাণপণে খাটে। এখানে অন্য যেসব প্রদেশের মায়েরা আছেন, গুজরাতি, মাড়োয়ারি ইত্যাদি, তাঁরা টু-থ্রি থেকেই ছেলেমেয়েকে কোচিং-এ দিয়ে দেন। কেউ-কেউ হয়তো একটু খেয়াল রাখে। ফোন করে রায়ানের মা একদিন চলে এলেন। ছেলে হিন্দি হোম-ওয়র্ক লেখেনি, কোনও সময়ে বাচ্চারা নিজেরাই ব্যাগ ঘাড়ে করে চলে আসে, মিস ক্লাসে কী লিখিয়েছেন, সে লিখতে পারেনি বা চায়নি, সুতরাং সন্ধেবেলা টনক নড়েছে। আর এই শায়রীকে কারও বাড়ি পাঠাও তো! কিছুতেই যাবে না। শেষ পর্যন্ত যেতে বাধ্য করলে গোমড়া মুখে যাবে এবং বেশির ভাগ সময়েই গোমড়া মুখেই ফেরত আসবে। মেয়েটা কি তার মতো অমিশুক তৈরি হচ্ছে? তার পছন্দ অপছন্দ খুব দৃঢ়। অভদ্রতা সে করে না কারও সঙ্গে, কিন্তু কেউ তার সঙ্গে অভদ্রতা করলে বা মনে আঘাত দিয়ে কথা বললে সে তাকে পরিহার করে চলে। ক্ষমা করতে তার খুব অসুবিধে হয়। এই নিয়ম শিথিল হয় একমাত্র বাবা, মা ও নিশীথ অর্থাৎ তার স্বামীর বেলায়। বাবার ধরনটা উদাসীন গোছের, কোনও সমস্যাকেই গুরুত্ব দেয়

না। নিজের নিয়ে থাকে, মা যেমন অনন্ত ভালবাসে তেমন অনন্ত উপদেশ দেয়। এত উপদেশ ঈশা পছন্দ করে না। সে-ও তো প্রাপ্তবয়স্ক, তারও তো কিছু ভাবার, চাওয়ার, করার বা না ভাবার, না চাওয়ার, না করার অধিকার আছে, না কি? সাধারণত সে মাকে এ সব বলে না। যদি কখনও বলে ফেলে মা চুপ করে যায়, কিন্তু হাল ছাড়ে না। হয়তো ধরনটা একটু বদলে গেল, হয়তো কিছু দিন চুপচাপ রইল। এই পর্যন্ত। তবে নিশীথের কাছে ঈশা জব্দ। নিশীথের জীবনে তার স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি সব যাকে বলে অ্যাকসেসরি। সে তাদের যেমন ভাবে ব্যবহার করবে ঠিক তেমন ভাবেই ব্যবহৃত হতে হবে। তার ইচ্ছে করলে বেড়াতে যাবে, ইচ্ছে না করলে যাবে না। ইচ্ছে হলে হেসে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবে, ইচ্ছে না হলে ভুরু কুঁচকে মুখটা বিকৃত করে থাকবে এবং ঈশার কাছে তার প্রতিদানহীন দাবি-দাওয়ার অন্ত নেই। স্বাস্থ্য-হণ্টন হাঁটতে হাঁটতেও ঈশার মুখের বিস্বাদ যায় না। পুরো হাউজিংটা দু ফের হেঁটে ঈশা বাড়ি ফিরবে ঠিক করল। এই বাড়ি বা ফ্ল্যাটের চার দেওয়াল তার কাছে অসহ্য মনে হয়। যখন বাইরে থাকে বেশ থাকে। ঢুকলেই হুড়মুড় করে দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ, বিরক্তি ও কষ্ট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে। এখন যেমন বেল দিল। দুবার দিতে হল, উদ্‌বেগ এসে দরজা খুলে দিল। উদ্‌বেগ মানে— শায়রী।

—তুই দরজা খুললি কেন? সানিয়াদিদি কী করছে? বলতে না বলতেই বিরক্তি সামনে এসে দাঁড়াল। বিরক্তি অর্থাৎ সানিয়া।

—ভাবিজি, মেরা কোই কসুর নহি, বেবি তো পয়লেই দওড় লাগায়া না?

ভাল, তো তুমি এতক্ষণ কী করছিলে মা! তোমার সেই পিণ্ডিটা রান্না করা কি হয়ে গেছে? রান্নাঘরে ঢোকে ঈশা— রাগ ছুটে এসে তার ঘাড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে, আভনের পেছনে তেল ছিটকে পড়ে গড়াচ্ছে। রান্নার বেদিটায় সবরকমের মশলার গুঁড়ো জলে মাখামাখি, তরকারি কাটার ছুরি ও বোর্ডটা উপচে পড়ছে। পাশেই ডাল নামানো। তার পাশে গোটা তিনেক বাসন। গ্যাস জ্বলে যাচ্ছে ... ওহ্ ওহ্ ওহ্!

—এ ক্যা হ্যায় সানিয়া? ইতনা গন্ধা! ইতনা গন্ধা। ক্যা বোলি ম্যয় তুমে? বলতে বলতে তো মেরি জান নিকল যাতি হ্যায় বাবা। উঠাও সব, উঠাও জলদি, ট্র্যাশ ক্যানমে ফেকো উও সব ছিলকা-উলকা, পোঁছ নিকালো, নিকালো! আচ্ছা ছাককে পোঁছে লাগাও। গ্যাস বন্ধ করো। আভভি।

সে নিজেই হাত লাগাল। অমনি সানিয়া একপাশে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল। এই এর রীতি। যতটা পারে কম কাজ করবে, যতটা পারে বেশি পয়সা আদায় করে নেবে, মাইনেতে, ছুটিতে, ধার-খোরে ...। সব শিখিয়ে দিলে তুমি, কী ভাবে পরিষ্কার করে কাজ করতে হবে, দুটো তিনটে ঝাড়ন সাপ্লাই দিলে, লাল ডোরাটা বাসন পোঁছার, সবুজ ডোরাটা বেদি পরিষ্কার করার, নীল ডোরাটা হাত মোছার, তলায় একটা আস্ত কালো টার্কিশ তোয়ালে আছে— বালিশ সাইজের। পা দিয়ে টেনে টেনে সব সময়ে পড়ে থাকা জল মোছে। জলে একবার পা পড়লে আর দেখতে হচ্ছে না। সব বুঝিয়ে তুমি চলে গেলে, একদিন করল, দু দিন কোনওমতে। তৃতীয় দিন নোংরা ও জল থই-থই রান্নাশাল। ডালটা এরা ডাল রাঁধে, সেটা একপাশে ঢাকা রয়েছে। মাছগুলো কাঁচা তেলে ছেড়েছে নির্ঘাত, সব ভেঙেচুরে একেক্কার। তরকারির রং বলে দিচ্ছে, মুখে দিলেই টাকরা অবধি জ্বলে যাবে। যেই তুমি হাত লাগাতে গেলে অমনি ধারে গিয়ে হাত গুটিয়ে ভিজে বেড়ালের মতো দাঁড়িয়ে রইল। চারশো টাকা কেজির পমফ্রেট। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলছে।

—মালুম হ্যায় তুমে? এ চার শও রুপেয়া কা মছলি! কামাল কিয়া। বাহ্।

কলকাতার কাজের লোকগুলো, কত বেশি খাটে, এদের তুলনায় কত কম মাইনে পায়! ভাবলে এত কষ্ট লাগে। তা ছাড়া খোপড়িতে কিছু থাকা দরকার। এদের খোপড়ি শূন্য, কিংবা ভরা থাকলেও শয়তানি বুদ্ধিতে ভরা।

এবার ইনি বিদায় নেবেন। নিলেন। হাত থেকে একগোছা চিঠিপত্র সেন্টার টেবিলে রেখেছিল ঈশা। এখন সেগুলো তুলে নিল। রিলায়েন্স,

আরও লোভজনক সব স্কিম দিচ্ছে। একটা লাইফ-স্টাইল ম্যাগের নাকাড়া— সস্তায় এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, পর্দা, কুশন ও কভার, টেবল ল্যাম্প, দাঁড়বাতি, ঝাড়বাতি, ল্যাম্প-শেড, ওয়াল হ্যাঙ্গিং রাখছি সব ফেং শুই-ফ্রেন্ডলি। বাস্তু-ফ্রেন্ডলি। আমাদের এক্সপার্ট বিনা পয়সায় আপনাকে পরামর্শ দেবার জন্য হুজুরে হাজির থাকবেন। জাঙ্ক মেল সব। এক্ষুনি কুচো কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া যায়। এটা কী? মায়ের হাতের লেখা না? মা যে চিঠি লেখে না তা নয়। মা চিঠি লিখতেই পছন্দ করে। কিন্তু ঈশা একটারও উত্তর দেয় না। ভীষণ কুঁড়েমি লাগে তার। লিখব, লিখব করে আর হয়ে ওঠে না।

মেয়েকে খেতে দিল ঈশা। ওদিকে 'পোগো' না কী একটা কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর প্রোগ্রাম হচ্ছে। সেইটি দেখতে দেখতে ইনি খাবেন। মাঝে মাঝে হাত আর মুখের গ্যাপটা এত বড় হয়ে যায় যে মনে হয় খাওয়া শেষ, পাতের দিকে নজর দিলেই মালুম হয় খাওয়াটা শুরুই হয়নি। শায়রী-ই-ই..., তাড়াতাড়ি একটা গরস মুখের দিকে ওঠে। মায়ের চিঠিটা খোলে ঈশা।

ঈশ্,

কেমন আছিস? অনেক দিন ফোন করিস না। আমার এবারে টেলিফোনের বিল চার হাজার উঠেছে। নিশীথ দেড় লাখ (?) টাকার চাকরি করে যদি এরকম বিল অ্যাফোর্ড করতে না পারে, তা হলে আমি বাইশ হাজার টাকার বোকা পণ্ডিত আর তোর অবসৃত বাবা সামান্য পেনশন আর একমুঠো টাকা হাতে দিয়ে বিদায় হওয়া বাবা কী করে এত অ্যাফোর্ড করব? অথচ একমাত্র সন্তান, একমাত্র নাতনির খবর সপ্তাহান্তেও একবার না পেলে মন আঁকুপাঁকু করে।

মা সবই জানে, তবু যে কেন রাগ করে। রাগটা জামাইকে দেখালেই তো পারে। কিপটের জাসু একটা! তার বেলায় তো বাড়িতে ডেকে খুব চপ-কাটলেট খাওয়ানো হয়, ঈশাকে যে উপদেশধারা বিতরণ করে জামাইকে তার কিছুটা অন্তত করলে পারে। কী, না, ভদ্রতায় বাধে। ভদ্রতা না আরও কিছু, আসলে ওই বাঘের মতো মুখ, রাগিমতো চোখ,

কোঁচকানো ভুরু দেখে মা-ও ঘাবড়ে যায়। অবশ্য বাড়ির বাইরে নিশীথদার খুবই উদার মিশুক ভাবমূর্তি। কথা বলতে পারে ভাল। মেলামেশায় দড় এ কথা বলা যাবে না। যারা মিশুক এবং সত্যিকারের সপ্রতিভ হয়, তারা যে কোনও সমাবেশে সবরকম ধরনের অতিথির সঙ্গে মোটামুটি সব বিষয়েই কথা বলতে পারে। নিশীথ নিজের কাজের বিষয় ছাড়া আর কিছুটা ফিলমে ইন্টারেস্টেড। এ ছাড়া সে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না। অথচ এইটুকু ক্ষমতার পুঁজি নিয়েই সে বিশাল একটা সামাজিকতা গুণের দাবি করে থাকে।

মার চিঠিটা পড়া যাক— তোর বুড়োমা চলে গেলেন। গত ২৩শে মার্চ। মার্চ মাস আমাদের অনেককে কেড়ে নিয়েছে। বুড়ো মানুষরা সাধারণত শীতে শুকনো পাতার মতো ঝরে যান, বসন্তের মাঝমধ্যিখানে যখন দোলখেলার রেশ মেলায়নি, তখন যাওয়াটা খুব অদ্ভুত। মামিমা আর দাদা-বউদিরা এত দিনে মুক্তি পেল। সর্বমঙ্গলা দেবী তো আসলে অনেক দিনই গত হয়েছেন। জীর্ণ দেহের খাঁচায় প্রাণপাখিটুকু ঝিমিয়ে ছিল— দানাপানিটা খেত, কখনও খেত না, অর্থহীন কলকলানিও ইদানীং থেমে এসেছিল। কাজেই মুক্তিটা প্রধানত ও বাড়ির আর পাঁচজনের। মায়ের প্রজন্মের সেজমামিই এখন জ্যেষ্ঠ, তিনি তো দিবারাত্র বলছেন— ঠাকুর আমায় হাত পা মন মগজ থাকতে থাকতে তুলে নাও। কী অদ্ভুত জানিস, সেজমামির কীরকম একটা অদ্ভুত পাপবোধ হয়েছে। বলছেন আমি শাশুড়িকে যা জ্বালিয়েছি তার কর্মফলে আমিও বোধহয় ওইরকমই জ্বলব।

ঈশা, আমার মনে হয় প্রত্যেক পরিবারেই একজন ম্যাদার ফিগার থাকে। যৌথ পরিবারে তো বটেই। এঁর ওপর সবাই নির্ভর করে, মানে এঁকে। এক ধরনের মাতৃতন্ত্র আমাদের পরিবারে পরিবারে এখনও বেঁচে আছে। অনেক ফ্যামিলি হয়তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, যে যার মতো চলছে। কিন্তু কোনও গুরুতর কিছু বৃহত্তর পরিবারে ঘটলে সবাই এঁকে জানায়, এঁর পরামর্শ নেয়। ছেলেরা বাইরের দিক থেকে অনেক কিছু ঠিক করে হয়তো, হয়তো কেন, করে তো বটেই। কিন্তু অন্দরের

ব্যাপারে, নিয়মনীতির ব্যাপারে মাদার ফিগারের কর্তৃত্ব। আমার মামার বাড়িতে দিদিমার পরে সেই জায়গাটা সেজমামি নিয়েছিলেন, এখন এক ধাক্কায় তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা-সাহস কেমন গুলিয়ে গেছে। এখন ওখানে কর্ত্রীর স্থান নিচ্ছেন ছোটমামি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সেজমামির ছোট পুত্রবধূ পূর্ণা, সম্পর্কে আমার মামাতো বউদি হল, যদিও ছোট, দুজনের মধ্যে খুব গোপন একটা রেষারেষির খেলা চলছে। একদিন গিয়ে দেখলুম ছোটমামি চোখে চশমা এঁটে হিসেব কষছেন। পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণা। সেগুলো বলতে বলতে ছোটমামি কয়েকবার গুলিয়ে ফেলল। পূর্ণা বেশ ব্যক্তিত্বভরা গলায় বলল— আপনাদের দ্বারা হবে না ছোটমা, আমাকে দিন, অডিট মিলিয়ে দিচ্ছি। আমায় দেখে ছোটমামির হাতবাক্স থেকে টাকা নিয়ে খাবার-দাবার আনাতে চলে গেল। ছোটমামি আমায় বললেন— তুই-ই বল রঞ্জা, উনিশের নামতা শক্ত নয়? তোরা অবশ্য পড়ালেখা নিয়েই থাকিস। পূর্ণা আজকাল এমন করে যেন আমি, সেজদি, কনেদি কিচ্ছু জানি না।

বহুকাল আগে মাতৃতন্ত্রে এই কর্ত্রী হবার লড়াইটা মেয়েতে মায়েতেও হত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের "ভোলগা থেকে গঙ্গা"য় এরকম একটা চিত্র আছে। আমার চোখে সিনেমার দৃশ্যর মতো সেটা ফুটে উঠল। মা মেয়ে দুজনে নদীর জলের মধ্যে সাঁতরে সাঁতরে যুদ্ধ করছে। কে শেষ পর্যন্ত হারল আমার মনে নেই। খুব সম্ভব মেয়েই। পূর্ণাবউদি কিন্তু জিতে যাবে। হারের কালি ইতিমধ্যেই ছোটমামির মুখে ভেসে উঠেছে। যাক গে, তোর খবর বল। আমার ইদানীং বড্ড মা-মা করে মন। মনে হয়, হয় মাকে আমার গর্ভে ঢুকিয়ে নিই নয় নিজেই মায়ের গর্ভে ঢুকে যাই। সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে নিকট স্থান।

এই পর্যন্ত পড়ে ঈশা কেমন শিউরে উঠল। কেন সে জানে না। সে, তার মা রঞ্জাবতী, তাঁর মা বেদবতী, তাঁর মা সর্বমঙ্গলা। মানুষ আলাদা, কিন্তু গর্ভ যেন এক। একই গর্ভ।

—তোর খাওয়া হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করল। এক প্রাচীন, সুপ্রাচীন গর্ভের ভেতর থেকে জিজ্ঞাসাটা উঠে এল যেন।

—ন্ না। আমি এই বড়াগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু খাব না।

কী যে হয়েছে আজকাল ছেলেমেয়েগুলো— দিবারাত্র চকলেট আর আইসক্রিম, আর গুচ্ছের বাহারি বাহারি টুকটাকের দিকে ঝোঁক। লিভারের বারোটা বাজাচ্ছে।

—তা হলে খা। শোবার সময় ড্রিংক দেব কিন্তু। আমি একটু মাকে ফোন করে আসি।

কিন্তু ফোনে মা বা বাবা কাউকেই সে পেল না। বাবাকে অবশ্য ফোন করাও যা, না করাও তা।—কী রে, কেমন আছিস? দিদিভাই ভাল করে পড়াশুনো করছে? বি ফিলজফিক্যাল ইন ইয়োর অ্যাটিটিউড টু লাইফ! ডিট্যাচড্। হেথা নয়, হেথা নয়। অন্য কোনখানে। ঠিক আছে, ভাল থাকিস সবাই।

এই।

আনসারিং মেশিন মায়ের গলায় বলল— আমরা কেউ এখন বাড়ি নেই। দয়া করে বিপ শব্দের পরে আপনার বক্তব্য, নাম, টেলি-নম্বর বলে রাখুন।

ঈশা বলল— ইশ্‌শশ্‌শ্‌শ্। —বলে ফোনটা ঠক করে নামিয়ে রেখে দিল।

ঠিক যখন দরকার তখনই থাকবেন না এই ভদ্রমহিলা। কী যে করে বেড়ান! এত রাজ্যের এত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যে কী করে মেলামেশা করেন! ভালও তো লাগে। সে এবং নিশীথ এসব দিক থেকে খুব, খু-উব এক্সক্লুসিভ। নিশীথেরটা একরকম, সেটা তার বিরক্তিকর লাগে। একই আত্মীয়স্বজন, তাদের কারও স্নবারি, কারও কালচারের অভাব এসব সে অনুভব করলেও সেসব জায়গায় তবু যাবে, কিন্তু ঈশার আত্মীয় তার বন্ধুবান্ধবের কাছে যেতে বলো— মুখ ভার, কিংবা ইচ্ছে করছে না। অথচ ওর প্রত্যাশা নিশীথদের মাসি-পিসি কাকা জ্যাঠা সংবলিত বিশাল পরিবারের সবার সঙ্গে সে, একমাত্র সে বউমা-সুলভ যোগাযোগ রেখে যাক।

নিশীথের নীতিদি কর্পোরেট হাউজে উচ্চপদে কাজ করে, তার স্বামী

প্রশান্তদাও তাই। দুজনেই অহংকারে ডুবুডুবু। যাকে তাকে নিয়ে কেমন হাসাহাসি করে। নীতিদি, প্রশান্তদা, ওদের দুই মেয়ে টুল আর টিল, সব্বাই এরকম। অবাক লাগে তার। সে এরকম ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়। শ্বশুরবাড়ি থাকতে তো প্রতিমুহূর্তে অবাক কাণ্ড ঘটত। একটা উচ্চশিক্ষিত পরিবার, কর্তা জজ, গিন্নি জজ-গিন্নি হওয়ার সুবাদে উঁচু পাহাড়ের বাসিন্দা, কিন্তু তাঁরা এমন কর্কশ, প্রচণ্ড ক্রিটিক্যাল, তার ওপর অত হৃদয়হীন হবেন, ভাবা যায়নি। সুযোগ পেলেই বলবেন নিশীথের কত কোয়ালিফায়েড মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল, সব এককথায় রাজি। নেহাত ঈশার বাবা-মা ধরে পড়লেন তাই। আরে দুর! নিশার বাবা মার— বাবার প্রশ্নই নেই। আর মা? মার বয়ে গেছে কাউকে ধরে পড়তে। সে বান্দাই তিনি নন। তাঁর ধারণা মেয়ে তাঁরই মতো উচ্চশিক্ষিত হবে, চাকরি করবে, যেসব পাত্র তাকে চাইবে তাদের মধ্যে স্যুটেবল বয়টিকে শুধু খুঁজে নিতে হবে। ঈশাই নিক না, তাতে কারও কোনও আপত্তি নেই। সেই ঈশাই নিল, বা তাকে নেওয়ানো হল। মাসতুতো দিদির বিয়েতে ঈশাকে দেখে একেবারে মাসির পায়ে পড়ে গেল নিশীথ। মা শুনে বলেছিল— নিশীথ? ওই গম্ভীরমতো ছেলেটি? ও যে হাসে না দিদি! স্যুট করবে কী?

এর আগে ঈশাকে ওইটুকু জীবনেই অনেকে চেয়েছে। ঈশা বিব্রত হয়েছে। এই নিশীথ, যাকে তার মোটেই তেমন কিছু লাগেনি, গম্ভীর, বাবা-রে-টাইপ মনে হয়েছিল, সে যে কী করে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিল সে নিজেও জানে না। আসলে যৌবন এলেই মেয়েদের মধ্যে এক স্বপ্নে-গড়া রাজপুত্তুরের প্রতীক্ষা শুরু হয়ে যায়। বিশেষত ঈশা একেবারেই কেরিয়ার মাইন্ডেড ছিল না বলে। স্কুল-কলেজের জীবনে যেসব ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, অসুবিধে আসে— কোনও সহপাঠিনী তাকে দেখে হিংসেয় নীল হয়ে যায়, সবসময়ে ছোবল মারার চেষ্টা করে। কোনও টিচার অজ্ঞাত কারণে তাকে পছন্দ করেন না, কোনও পাঠ্য সহজে বুঝতে না পেরে ভেতরে ভয়— এ বোধহয় আমার দ্বারা হবে না ... যা মোটের ওপর সবার জীবনেই আসে, কেন কে জানে এগুলোর চাপ

ঈশার ওপর ভয়ানক বলে মনে হত। চাকরি-টাকরি করতে গেলে যেসব পরিস্থিতি আসে, সেসব গল্পও অনেকের কাছে, বিশেষত মায়ের কাছে যথেষ্ট শুনেছে এবং গৃহের বাইরের জীবন ততই তার কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। সে বিমুখ হয়ে গেছে। তার মা, ঈশার ধারণা, তাকে কিচ্ছু বোঝে না। মার আছে একটা মন-গড়া ঈশা। ঈশা ঠিক মায়ের মতো করেই সব জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, ঈশা হতাশ হবে, হীনম্মন্যতার মুখোমুখি হবে। কিন্তু কতকগুলো অস্থায়ী দশা, সেগুলো ঈশা মনের জোরে কাটিয়ে উঠবে। স্ট্রাগল্ করবে। কী ভাবে বিরূপ সংসারকে জয় করে শেষ হাসিটা হাসতে পারা যায় সেটা ঈশা এমনি এমনিই শিখে যাবে। কেননা ঈশার আবার একটা অতিরিক্ত সম্পদ আছে, সেটা তার রূপ, তার স্বাভাবিক মাধুর্য। এমনিভাবে মা ভেবে যাচ্ছে, এদিকে ঈশা তার ইয়েসপার্সন হাতে নিয়ে ভাবছে— বাব্বা, কবে এসব শেষ হবে। এমন চমৎকার শেক্সপিয়র শেলি কিট্স হার্ডির মধ্যে আবার ইয়েসপার্সন ঢুকে পড়েন কেন? নো-পার্সন হয়ে গেলেই তো পারেন। ঈশা, ছোট্ট ঈশা কত্থক নাচছে, লাবু বলে আর একটি মেয়ে একটু বড়, চমৎকার নাচে। একই বোল, একই স্টেপ, একই ফিগার অথচ লাবু তার খুব সাধারণ চেহারা নিয়েও অসাধারণ নাচছে। দেখতে দেখতে ঈশারই যেন মনে নাচের দোল লেগে যায়। মা কিন্তু কখনও বলে না, দেখেছিস? লাবু কীরকম নাচে! তোকেও ওরকম নাচতে হবে! কখনও বলেনি, কিন্তু ঈশার নিজেরই মনে হয় লাবুর মতো নাচতে না পারলুম তো নেচে কী হবে? অতসীর মতো গাইতে না পারলুম তো গেয়ে কী হবে, লহনার মতো লিখতে না পারলুম তো লিখে কী হবে, অর্ণার মতো রেজাল্ট না হল তো পরীক্ষা দিয়ে কী হবে! চুপিচুপি ঈশা বরাবর এরকম ভেবেছে, মাকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়নি। মা স্বপ্নে মশগুল— আমার ঈশা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলবে। ঈশাকে অক্সফোর্ড কিংবা ইউ.এস.এ-র কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠাব। 'জগৎ আসি যেথা করিছে কোলাকুলি'— সেইখানে তাঁর ঈশা জীবনকে দেখবে, উপভোগ করবে। বজ্রাঘাতের মতো এল স্বপ্নামাসির ফোনটা।

—রঞ্জা একটা দারুণ খবর আছে।

—কী খবর? মুনমুন চান্স পেয়েছে?

—হ্যাঁ মুনমুন চান্স পেয়েছে, আই.আই-টিতে কিন্তু এ খবরটা আরও দারুণ।

—কী!

—নিশীথ, সুতীর্থর বন্ধু রে! ওই ফরসামতো লম্বা-চওড়া ছেলেটি ও একেবারে ঈশার জন্যে পাগল। সবে চাকরির প্রোবেশন শেষ হয়েছে, ও এক্ষুনি বিয়ে করতে চায়। কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ার।

—মানে? ঈশা মাস্টার্স করবে না? কুড়ি বছরের মেয়ের আবার বিয়ে কী? স্বপ্না, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি এখন মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছি না। প্লিজ!

—আরে তোর ঈশাও তো রাজি! গত তিন চার মাস দুজনে একটু ঘোরাফেরা করেছে, দুজনের মন বোঝাবুঝি হয়েছে। মাস্টার্স-এর ভাবনা কী? একেবারে মডার্ন বাড়ি। ব্যালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে নিজেদের বাড়ি। বাবা আর মা। বাবা হাইকোর্টের জজ হয়ে রিটায়ার করেছেন। ঝাড়া-ঝাপটা ফ্যামিলি। মেয়ের মতো থাকবে।

শেষ কথাটা মা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল— মেয়ের মতো থাকবে?

কথাটা কেমন যেন লাগল! কাজের লোক মানে ছোট মেয়ে রাখলে চালাক-চতুর গিন্নিরা বলেন মেয়ের মতো থাকবে। বউ তো মেয়েই! সে মেয়ের মতো থাকবে— এ কথা ঘোষণা করে বলতে হবে? আর ঘোরাফেরাই বা কবে করলি ঈশা, বলিসনি তো!

—আহা! মাসির বাড়ি গিয়ে! বলার কী আছে?

—কিছু নেই রে, কিন্তু তুই তো বলিস, তুই আমাকে স-ব বলিস বলেই আমার ধারণা ছিল! আমি তো তোর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ... তুইও আমার! মা গভীর আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু জানতে দেয়নি। ঈশা এখন বুঝতে পারে। তখন সে পড়াশোনায় পণ্ডিতিতে গজগজ বাড়ি, আর ভাইয়ের অকাল-প্রয়াণের দুঃসহ বিমর্ষতা মাখানো চার দেয়ালের বাইরে

অন্য কোনও স্বপ্নের জগতে যাবার জন্য উন্মুখ, রাজকুমার আসবে তাকে ভালবাসবে, শুধু তাকেই, আর কোনও বড় রানি, ছোট রানি থাকবে না। আর সেই আদর ভালবাসা সে দু হাতে বিলিয়ে দেবে সংসারকে। একচক্ষু হরিণের মতো সে মাত্র একটা দিক দেখতে পেয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি, স্বামী এসব যে এত অস্বাভাবিক জটিল ব্যাপার হতে পারে তা সে জানত না। জানত না শাশুড়ি এ ভাবে চেঁচিয়ে বকতে পারেন, 'ফুলদানি থেকে এক ফোঁটা জল পড়েছে, কী করে পড়ল-ও-ও-ও চিৎকার! জানত না শ্বশুর এক্স জজসাহেব বলতে পারেন, —'রাত্তিরে আমাদের বাড়ি মাছ-মাংস হয় না। তোমাকেও তাতেই অভ্যস্ত হতে হবে।' কলেজের সময়ে সকাল সকাল খেয়ে যাবে আলুভাতে ভাত। একটু, একমুঠো বাসমতী চালের ভাত সে বরাবর খেতে অভ্যস্ত। — 'সকালে কী খেয়ে যাবে?' শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলেন। তাই সে বলল, মা, আমাকে একটু বাসমতীর ভাত আর আলুভাতে দিয়ো, আর কিছু খেতে পারব না।

বাসমতী? এ আইডিয়াটি আবার তোমার মাথায় কে ঢোকাল? তোমার মা বোধহয়!

তারা তো ধনী নয়। কিন্তু এইটুকু তো তারা বরাবর পেয়েছে। ছেলেমেয়ের খাবার পুষ্টিকর হচ্ছে কি না— এদিকে মায়ের ভীষণ নজর ছিল। যৌথ পরিবার, তারপর বামনি যা-তা করে রান্না করে, মা হরলিক্স-কমপ্লান খাওয়াবে, ফল আসবে! মাছ ছাড়া খেতে পারে না বলে দাদু তাকে বেড়াল বলে ডাকতেন। আর যখন কসবার বাড়িতে চলে এল, দাদু ঠাকুমা মারা যাবার পর, তখন তো মায়ের রান্নার হাতও খুলে গেল। তাদের যা খেতে ইচ্ছে করে, অন্যায় আবদার না হলে মা যথাসাধ্য মিটিয়েছে।

আর এই ধনী শ্বশুরবাড়ি, রিটায়ার্ড জজ, এঁদের কলকাতাতেই তিন চারটে বাড়ি, দুটো তিনটে ক্লাবের মেম্বারশিপ, এঁরা নিজেরাও এক তরকারি ভাত খাবেন। আচ্ছা, তাঁদের না হয় বয়স হয়েছে, তাই বলে তাকেও তাই খেতে হবে? খালি ছেলে সকালে খেয়ে যায় না বলে রাত্তিরে তার জন্য একটু স্পেশ্যাল ব্যবস্থা থাকে।

আর স্বামী? যে নাকি প্রায় তার পায়ে পড়ে গিয়েছিল! তার ওল্ড ফ্লেমের বাড়ি নিয়ে গেল। ওল্ড ফ্লেম, তার স্বামী আর তার নিজের নিশীথকান্ত পরস্পরের দিকে চেয়ে চোখ মটকাচ্ছে, হাসছে, ওল্ড ফ্লেমের স্বামী বলছে— ঈশা, লেটস লিভ দেম টু দেমসেলভস্। আমরা বরঞ্চ বারান্দায় গিয়ে বসি, দেখা যাক তোমার সঙ্গে আমার কেমিস্ট্রি জমে কি না। —অবাক কাণ্ড। সে হতবাক। জড়সড় একেবারে।

সে নিজের বাড়ির বারান্দায় সন্ধেবেলা বসে আছে। রবিবার। নিশীথকান্ত না বলে কোথায় যে বেরিয়ে গেল? ও কী! সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে তার চোখে টর্চ মারছে আর হাসছে। কে? ওই ত্রয়ী? এ কীরকম কুরুচিকর ঠাট্টা? এ কীরকম সোসাইটি! আর মৌ? কলেজের জুনিয়ার ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে মৌ? সে কোন সময়ের ফ্লেম কে জানে! সে বাড়িতে ঢুকে, বাবা না, মা না, ঈশা না, কারও সঙ্গে কথা না বলে 'হ্যালো' না করে সোজা ঢুকে যাবে নিশীথের ঘরে, বিছানায় গড়িয়ে পড়ে পড়ে গল্প করবে— আঁতেল আঁতেল গল্প, ফিচেল-ফিচেল কায়দায়। আর এক ফ্ল্যাটের মিষ্টি, তার গালে ফ্যাশন-চুমু দিল নিশীথকান্ত। যদিও সে প্রথম বিবাহের পর পরও কোনও দিন রাত ছাড়া তাকে কোনও সোহাগ-টোহাগ জানায়নি। শাশুড়ি পর্যন্ত বলতেন— মৌকে তুমি টলারেট করো কী করে ঈশা? অ্যালাও করবে না একদম। বাইরে বসে গল্প করুক। আর মিষ্টি? ডিটেস্টেবল্।

রাগে অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, অভিমানে অপমানে আছড়ে পড়ছে ভেতরটা। এই শ্বশুর-শাশুড়ি, এই স্বামী মাথার ভেতর নিয়ে সে কী করে কিছু করবে? প্রাণের ভেতরটা সবসময়ে দপদপ করছে, পড়াশুনো, গানবাজনা— সব চুলোয় গেল, সে শুধু তার সামান্য হাতখরচের পুঁজি দিয়ে আইসক্রিম খেয়ে বেড়ায় আর চোখ-টানা শাড়ি কেনে, আইসক্রিম-চকোলেট খায় বাড়ির ডাঁটাচচ্চড়ি আর কাঁটা মাছের বরাদ্দর শোধ নিতে, খায় আর মোটা হয়। খায় আর মোটা হয়। অবশেষে ... শায়রী। শায়রী এল তার সব ভোলানো, তার রুদ্ধ ভালবাসার দেয়াল চৌচির করে বেরিয়ে এল স্নেহের প্রবল জোয়ার, ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব না-পাওয়ার

দুঃখ, কিন্তু গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত আহারও তো তার জোটেনি। একদিন টি.ভি-তে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করছিলেন— গর্ভাবস্থায় মাকে মাছ-মাংস বিশেষত মাছ খেতে হবে, কার্বোহাইড্রেট কম, দুধ ও দুগ্ধজাত জিনিস, কিন্তু ফ্যাটেনিং কিছু নয় ... শুনতে শুনতে শ্বশুর বললেন— ও, আমাদের বাচ্চাটার তা হলে মাছ দরকার?

শাশুড়ি বললেন— সে তো আমি কবে থেকেই বলছি। কান দিয়েছ? বংশধর আসছে, খাওয়ার তরিবত দরকার। তা যা বাজার আনো তাতে পাচ্চার হয়?

বাচ্চা! বাচ্চাটা আসল! তার মা শুধু তার বাহক। ব্যস।

সেই তার মাছ বরাদ্দ হল। তার নয়, তার ভেতরে ওঁদের বংশধরের জন্য। কিন্তু তখন তো দেরি হয়েই গেছে। ভীষণ খিদে, বাড়িতে মাপা খাওয়া খেয়ে পেট ভরত না। তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই আইসক্রিম আর চকোলেট। পর্বতের মূষিক প্রসব হল। সেই একরত্তি শিশুর গায়ে সে কাউকে হাত দিতে দিত না। ডাক্তারের বারণ ছিল। বাইরের কাপড়ে বাইরের লোক ঘরের ভেতর আসবেই, ডাক্তারের সাবধানবাণী সবাই শুনেছেন তবু সবাই দিব্যি আসতে দিচ্ছেন। ভেতরে-ভেতরে সে ফুঁসছে, একান্তে নিশীথের কাছে ফেটে পড়ল, রাগ, কান্না। —কত কষ্ট করে জন্ম দিতে হয়, জানো? ...

নিশীথ বলল— আমিও তো কত কষ্ট করে রোজগার করছি!

সন্তান-জন্ম আর উপার্জন হল এক গোত্রের? এর পর আর এর সঙ্গে কথা বলার কোনও মানে হয়? সে বিনীত ভাবে বলল— মা, আমি বাচ্চাকে নিয়ে ক'দিন মায়ের কাছে থেকে আসি।

—তোমার মা তো পোয়াতি অবস্থায়ও নিয়ে যেতে পারতেন! বারণ করিনি তো!

—চেয়েছিলেন, আমি-ই যাইনি, আপনাদের অসুবিধে হবে বলে!

—আমাদের অসুবিধে? তুমি আমাদের কী সুবিধে করছ, থেকে? বাপের বাড়ি যেতে চাও না কেন বলো তো?

সে কী করে বোঝাবে ওই মুন্নি কখন এসে তার স্বামীর পাশে শুয়ে

পড়ে, কখন নিশীথকান্ত রাস্তার ওধারে ওল্ড ফ্রেমের বাড়ি চলে যাবেন, আর তার লিবারয়াল হাই-সোসাইটি স্বামী উইল লিভ দেম টু দেমসেলভস্! সে যে বড় দুর্ভাবনা।

কিন্তু শায়রী, ছোট্ট শায়রীর নিরাপত্তার জন্য সব দুশ্চিন্তা অগ্রাহ্য করা যায়। তা ছাড়াও শিশু ভালবাসা, শিশু ভগবান, শিশুই প্রেম। সে দেখতে পাচ্ছে নিশীথের চোখ নরম হচ্ছে, সে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসছে। ডাক্তার বাড়ি ছুটছে ...। এই শিশুই তাকে রক্ষা করবে, সে মায়ের কাছে চলে গেল অনেক দিন পর, অনেক দিনের জন্য। আহ্ কী শান্তি!

রক্ষা

শম, ছন্দ, পুলহ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ভগ বলল— আকাশ, নদী, বাতাস তোমাদের মঙ্গল করুন।

বনভূমিতে হেমন্ত এসেছে। কিছু কিছু গাছের পাতা ঝরছে, ঝরে যাচ্ছে, ঝরে গেছে। আবার কিছু কিছু বৃক্ষ পুরনো পাতার সজ্জা নিয়ে গম্ভীর দাঁড়িয়ে আছে। ধন্যা শীর্ণা হয়ে গেছে, বাতাসে ছুরির ধার এবং এবং — অদূরে সোনার মাঠ। —শম ছন্দের দিকে চায়, ছন্দ চায় পুলহর দিকে, পুলহ আবার শমের দিকে। তাদের হাত নিশপিশ করছে। নিজেদের হাতে গড়া সৃষ্টি ডাকছে, আনন্দে আকুল হয়ে ডাকছে। তাদের মনের মধ্যেটা সাড়া দিয়ে উঠছে— যাই, যাই, এই যে যাই সোনালি শস্য, আমরা আসছি। মন, মুখ চেপে ধরে তিনজনে।

ধোঁয়ার মতো কুয়াশা উঠছে দূর পাহাড়ের ওপর। নীলাভ কুয়াশা। আর একটু রোদ উঠলে সে কুয়াশাকে তাড়া করবে।

তোমরা তৈরি—? গম্ভীর স্বরে বলল দলপতি।

মাথা নাড়ে তিনজন।

—তা হলে বাকিদের নিয়ে এসো।

লোকগুলি বোকা। যে ছোরা দিয়ে শিকার করে সেইগুলি নিয়ে শস্য

কাটতে এসেছে। হাসি এসেছিল, হাসি চাপে শম। —এইগুলিতে হবে না।

গাছের কোটরে রাখা তাদের পাতলা বাঁকা ছোরা নিয়ে আসে তারা। উপায় নেই, নইলে শস্যগুলি নষ্ট হবে। এক হাতে মুঠো করে ধরা অন্য হাতে শস্য কাটার কায়দা শিখতে এদের কত চাঁদ কত সূর্য কাবার হয়ে যাবে! তারা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে, নিজেদের মনে কেটে যায়। হাত ভরে ওঠে। শুকনো ডাঙায় রাখা শস্য চিকচিক করে রোদের ছটার মতো। সারাদিন হাত চলে। বি-গোষ্ঠীর বোকা লোকগুলি গোছাগুলি পরপর সাজিয়ে রাখে। কাটার কাজ করতে পারে না।

সারাদিন কাজ চলে, সূর্য মাথায় উঠলে আধ-ঝলসানো হরিণ মাংস পায় ওরা। এইরকম আধপোড়া মাংস খাওয়ার অভ্যাস তাদের কবেই চলে গেছে। মুখ বিকৃত করে শম, অলম্বুষ। অন্যরা মুখ নিচু করে দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়তে থাকে ছিবড়ে মাংস। দলপতি লক্ষ করে— কী হল? তোমরা যেন ভাল করে খাচ্ছ না!

—বেশ খাচ্ছি— শম জানায়।

অর্যা বলে— হ্যাঁ, বেশ তো।

নিভৃত মধ্যাহ্নে মাংস চিবোবার শব্দ ওঠে। চবৎ, চবৎ, চবৎ। চ্যাৎ, চ্যাৎ। চবৎ চবৎ—

নিমেষ এখানে নেই। সূর্যকে ধান্য- কাটার দলপতি করে দিয়েছে সে। তার আরও অনেক কাজ আছে। প্রধান কাজ এই ধান্য রাখবার ব্যবস্থা করা। দূরের পাহাড়ে গুহা আছে বটে, কিন্তু তা তেমন ভাল নয়। অনেকটা দূরেও বটে। কেউ কেড়ে নিতে চাইলে রক্ষা করা শক্ত হবে। তারা অবশ্য অশ্বে চড়ে ওখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। কয়েকজনকে পাহারা রেখে দিলেও হয়। কিন্তু এরা কী ভাবে রাখত? নিমেষ ও মধুরা ভাবে ভাবে, ভাবতে ভাবতে একদিন বনের মধ্যে প্রবেশ করে, গাছগুলি ঘেঁষাঘেঁষি। এখানে অশ্ব ঢুকবে না। ধান্যভূমির আশপাশে কিছুই চিহ্ন নেই। শস্যগুলি কী ভাবে রাখা হত? জিজ্ঞেস করলে হয়, কিন্তু তাতে লোকগুলির চোখে বিদ্রুপ ঝিলিক দেয়।

ধান্যজয় হয়েছে, এবারে রক্ষার ব্যবস্থা তাদেরই করতে হবে।

ক্রমশ আরও গহন হচ্ছে জঙ্গল। বড় বড় গাছের শাখাপ্রশাখা পত্রজালের মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণ বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে ঢুকছে। পায়ের কাছে ঝোপঝাড়। সাপ চলে গেল এঁকেবেঁকে। কে জানে সাপটি নিমেষকে চেনে কি না। একবার ফণা তুলে যেন দেখে নিল, তারপর চলে গেল। সাপ সহসা আক্রমণ করে না, করে ভালুক, ভয় পেয়ে, বরাহও অতি রাগি এবং জেদি জন্তু। সিংহ কখন লাফিয়ে পড়বে, তিরের মতো ধেয়ে আসবে তুমি বুঝতে পারবে না। এই হয়তো দেখলে সিংহীটি শাবক নিয়ে শুয়ে রয়েছে, তোমাকে দেখে বেড়ালের মতো চোখ মিটমিট করল, তুমি পাশ দিয়ে চলে গেলে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার অন্য সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে নিঃশব্দে ছুটে এসে তোমার ঘাড় কামড়ে ধরল। আসলে সিংহ খিদে না পেলে আক্রমণ করে না। কখন তাঁর খিদে পেয়েছে, কখন পায়নি সে হিসেব করা কি সোজা? এই সব অশ্বও বনেরই জন্তু, হরিণের মতো ছোটে। বহু চেষ্টায় কতকগুলিকে বশ করেছে মধুরা, শব্দ আর সে। খোলা জায়গায় নদীনালা পাহাড়-পর্বত হলে আর দেখতে হয় না। কিন্তু এইরকম ভারী জঙ্গলে তারা অচল। হাতে কুঠার নিয়ে পথ চলতে হয় এসব জায়গায়। বন্যজন্তুর মোকাবিলাও করবে, ঝোপজঙ্গল কেটে সাফ করে এগোনোও যাবে।

মধুরা হঠাৎ শিস দিয়ে উঠল। খুব অবাক হলে বা আনন্দ হলে মধুরা শিস দেয়। —কী হল?

—আরে দেখ দেখ নিমেষ, ঝোপঝাড় কেটে চমৎকার একটি পথ কে কেটে রেখেছে। তাই তো! পরিষ্কার পথ। কোথাও কোনও বড় ঝোপ নেই। শুধু কিছু বুনো ফুল, ঘাসে সবুজ রঙিন হয়ে আছে পথটি। তবে কোনও রংই বেশি নয়। কেননা এই পথে নিয়মিত যাতায়াত হয়। দুধারে উঁচু গাছ। ওপরে বানর দোল খাচ্ছে।

শিস দিতে দিতে মধুরা আগে আগে যায়। নিমেষ পেছনে। হঠাৎ সে কর্কশ গলায় বলে উঠল— শিস থামাও মধুরা।

—ওহ্। তাই তো!

আর তার পরই তারা দেখল বনভূমির মধ্যে একটি পরিষ্কৃত স্থান, ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ রয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কিন্তু স্থানটি পরিষ্কৃত। এবং এবং এবং ... সেখানে ইতস্তত কতকগুলি লতাপাতার গুহা। ওপরে ছাওয়া, চারদিকে ছাওয়া, এক দিকে একটি চওড়া ফাঁক। গুহাটির সামনে লম্বাচওড়া একটি উঁচু সমতল স্থান।

পায়ের শব্দ থামাতে পারেনি তারা, খুব সতর্ক ছিল না। এইরকম একটি পত্রগুহা থেকে বেরিয়ে এল— রঙ্কা।

সে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল, তার হাতে একটি বড় পাতায় সিদ্ধ ধান্য। সে খাচ্ছে। তাদের দেখেই নিমেষে ভেতরে চলে গেল রঙ্কা। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল, দু হাতে দুটি বল্লম। বলল— এক পা এগিয়ো না, ঘৃণিত বি-গোষ্ঠী, খুনি, নৃশংস— দুটি বল্লম দুটি দেহে বিঁধে যাবে এক্ষুনি।

তারা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত নিমেষ। এই ক' মাসে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে রঙ্কার। সে যে কোনও সময়ে মারাত্মক আহত হয়েছিল বোঝবার জো নেই। শুভ্র বর্ণ, তাতে রক্তের আভা, পিঙ্গল কেশ পিঠের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। একটি বল্কল কোমরে আঁটা তাতে লাল নীল হলুদ ফুল আঁটা। রঙ্কার কেশে একটি রক্তবর্ণ ফুল গোঁজা। সে আরও লম্বা হয়েছে, চক্ষে নীল আভা। ছুরির ধার চোখে এবং আশ্চর্য প্রশান্তি তার দাঁড়িয়ে থাকায়। দৃঢ়, আত্মস্থ, সংকল্পে অটল।

নিমেষ বলল— আমরা শত্রু নই। আমি আর আমাদের নেত্রী মধুরা সবার জন্য ফলমূল সংগ্রহে বেরিয়েছি। ওদিকে ধান্য-কাটা হচ্ছে তো! তোমাদের লোকেরাই কাটছে, তাদের তো আমরা মুক্তি দিয়েছিই, বলো মধুরা?

মধুরা সতর্ক ভাবে তাকিয়ে বলল— ভগ তাদের ক্ষত সারিয়ে দিয়েছে। তারা ধান্য পালন ও কাটার কাজ শেখাচ্ছে আমাদের। আমরা বন্ধু।

—চলে যাও। —তীব্রস্বরে বলল রঙ্কা। রঙ্কার কণ্ঠস্বর যেন বনভূমিতে হিল্লোল বইয়ে দিল, অন্তত নিমেষের তাই মনে হল।

—আমাদের কুটির থেকে, পাড়া থেকে চলে যাও, যাও বলছি! সে একটি বল্লম নিমেষের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ল। ভাগ্যে নিমেষ বসে পড়েছিল তাই। তারা সভয়ে দেখল বল্লম নিমেষের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটি গাছকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছে। আবার ঢুকে গেল রঙ্কা, তিরধনুক নিয়ে বেরিয়ে এল। মধুরা মৃদুস্বরে বলল— ফিরে চলো নিমেষ। পরে আসা যাবে। এই পাড়া, কুটির ও এই মেয়েটিকে আমাদের দরকার হবে। এ যোদ্ধ্রী।

পিছু হঠতে হঠতে যতক্ষণ না নিশানার বাইরে চলে গেল তারা, উদ্যত ধনুর্বাণ নামাল না রঙ্কা। পেছন ফিরে বনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দেখল, অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল রাখল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে অস্ত্র নামিয়ে ঘরে গিয়ে তার অসমাপ্ত আহার শেষ করল। রঙ্কাদের গ্রামে বহু ধান্যবীজ সঞ্চিত আছে। একেবারে সিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, সে তার শিকার করা খরগোশটি ভাল করে ঝলসে নিয়েছিল, বনের লবণক্ষেত্র থেকে লোনা মাটি এনে মিশিয়েছিল। খাবারটা ভালই হয়েছে কিন্তু বি-গোষ্ঠীর লোক দুটি তার স্বাদ নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল। আজ আক্রমণ করল না ঠিকই, কিন্তু দেখে গেল তাদের পল্লি, তাদের পর্ণকুটির, তাদের শস্যঘর, শস্য আছড়াবার ঝাড়বার জন্য শুকোবার জন্য বেদিগুলি। এবং পুরো পল্লিতে সে একা। যদিও তার ঘরে অন্য আরও ঘর থেকে নিয়ে আসা অজস্র তির, বল্লম, কুঠার। সে চমৎকার স্বাধীনভাবে এই ক'মাস বিচরণ করেছে, আপন মনে শিকার করেছে, রেঁধেছে, খেয়েছে, কুটিরগুলি পরিষ্কার করেছে, শস্যগুলি রোদে দিয়েছে, পাছে কোনও পোকা লাগে। আশ্চর্য তার পোষা হরিণ নন্দ তো কোনও সূচনা দিল না! নন্দকে ওরা মেরে ফেলেনি তো? মেরে ফেললে আরও নন্দ তৈরি করে নিতে তার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সে একা এই পুরো পল্লি রক্ষা করবে কী করে? কত দিন? এই অসভ্যগুলি শস্য বুনতে জানে না, বিকটাকৃতি জানোয়ারে চড়ে, এদের হাত থেকে সে নিজের পল্লি কী করে বাঁচাবে? কী বলে গেল, তাদের আহতরা সেরে গেছে? তারা এখন শস্য তুলছে! তবে কি সবাই হার মেনে গেল? হায় মাতঙ্গী, সিংহ, দেখো কী অবস্থা হল

তোমাদের গোষ্ঠীর। তোমাদের সন্তানদের। মাতঙ্গী-ই ... তার ডাক বন চিরে দেয়। সে রাগে উন্মত্ত হয়ে নিজেকেই আঘাত করে। চুল ছেঁড়ে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকে মাটির ওপর, কলকল করে জল বেরোয় চোখ দিয়ে। এই জলধারা সে খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখে। আঘাত লাগলে, খুব জোর আঘাত, ধরো তির বিঁধে গেল, কুঠারের আঘাত লাগল, কি বন্যজন্তু মাংস খুবলে নিল, তখন এই জলধারা বেরিয়ে আসে চোখ থেকে। এখন তো কোনও চোট নেই, ক্ষত নেই, কেন এরকম হচ্ছে তার? মাতঙ্গী বাতাসে মিশে যাবার সময় থেকেই এরকম হচ্ছে। তবে কি কোথাও ক্ষত আছে? কোথাও শরীরের গভীরে, সে আঁতিপাঁতি করে দেখতে থাকে; এবং নিশ্চিত হয়, নেই। শরীর অটুট, তা হলে? শরীরের ভেতরে কোথাও ক্ষতটি আছে ঠিকই। এবং তা মাতঙ্গীর অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে যুক্ত।

হঠাৎ তার মনে পড়ে শুক্কো বলে বালকটিকে যখন তরক্ষু নিয়ে গেল! মাতঙ্গী সবাইকে বকছিল অসাবধান হবার জন্য, সেই সময়ে তার চোখ দিয়ে এমনি জলধারা নেমেছিল। তার মানে কারও অদর্শন হয়ে যাবার সঙ্গে যুক্ত এই ক্ষত। এই কান্না, চোখের ভেতর থেকে, শরীরের যেসব অংশ দেখতে পাওয়া যায় না সেখান থেকে, ক্ষতমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে জলধারা। এই ক্র ক্র করে ক্রন্দন।

রঙ্কার আশঙ্কা অচিরেই সত্য হল। কিন্তু সে যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়।

ঠিক দু সূর্য পরে রঙ্কার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শম।

—শম তুই?

—আমরা সবাই আছি রঙ্কা, বেরিয়ে আয়।

বেরিয়ে রঙ্কা দেখল সত্যিই তাদের গোষ্ঠীর শম, দম, অলম্বুষ, অর্যা— ইত্যাদি সবাই উপস্থিত।

অর্যা বলল— আমরা দুই গোষ্ঠী মিলে গেছি রঙ্কা। আর আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। আমরা ওদের ধান্য লালনপালন, তার থেকে বীজ বার করে শুকনো সব কায়দা শিখিয়ে দিয়েছি, ওরা আমাদের

অশ্বের পিঠে চড়তে দিচ্ছে। কী ক্ষতি বল যদি আমরা মিলে এক হয়ে যাই।

দম বলল— দেখ ওরাও শ্বেত, আমরাও শ্বেত। ওরা তুষারের মতো, আমরা অত সাদা নই। ওদেরও কেশ পিঙ্গল, আমাদেরও। ওরাও উচ্চনাস, আমরাও তাই। শুধু ওরা দূরে, বহু দূরে ছিল বলে পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা হয়নি। আমাদের এই যেমন ধান্য আছে, ওদের তেমন অশ্ব আছে। ওরা আমাদের চেয়েও তীক্ষ্ণ ফলা তৈরি করতে পারে।

—আর মাতঙ্গী... সিংহ... অদ্রি... যারা বিনা কারণে নিহত হল!

রঙ্কার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

এই সময়ে পেছনে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি লোক, সকলে পথ ছেড়ে দিল, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল যেন যুদ্ধে পরাজিত, আত্মসমর্পণ করবে। খুব ধীর গম্ভীর মধুর গলায় লোকটি বলল— আমি ভগ, শুনেছি তুমি রঙ্কা। আমি ক্ষত সারাই। বহু গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ জানি, আরও একটা কথা জানি। এই তুমি, মধুরা, শব্দ, অর্যা, রোধিনী— আর এই আমি, নিমেষ, শম, দম, অলম্বুষ, কৌর... আমাদের ভেতরে কোনও তফাত নেই। প্রত্যেকের দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ দুটো কান। দুই নাসাছিদ্র, রক্ত এক রঙের— নারীদের দুটি অতিরিক্ত অঙ্গ আছে। তাদের প্রজনন অঙ্গও ভিন্নরূপ, কিন্তু সব নারীরই এক। তা হলে? —আমি এই মহান কথা জানতে পেরেছি— আমরা সবাই একরূপ। আমাদের মিলে যেতে হবে। যখন কিছু পাওয়ার স্বার্থে যুদ্ধ করি, হত্যা করি, নিজেদের প্রতিরূপকেই করি।

রঙ্কা একটু থমকে গেল। লোকটি অতি শ্বেত, তার চুলগুলিও সাদা, যদিও সে বৃদ্ধ নয়। এই সর্বশ্বেতত্ব তাকে কেমন একটা মহত্ত্ব, বিশেষতা দিয়েছে, সে যেন আকাশ বাতাস থেকে নেমে এসেছে, জলের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। সমীহ চোখে নিয়ে রঙ্কা তার দিকে তাকিয়ে রইল। বাক্যহীন।

ভগ বলল— জানি তোমাদের গোষ্ঠীর অনেককেই আমরা হত্যা করেছি। ভুল করেছি। আমি ওদের বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম

দেখো ওরা আমাদের মতো দেখতে, আমরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারি। এ হত্যা এ যুদ্ধ কোরো না। আমি ওদের হয়ে তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি। কী শাস্তি দেবে দাও। এই নাও কুঠার, বল্লম, এই সব তিরধনুক। মারো। —ভগ হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

রঙ্কা কথা বলল না। ভেতরে চলে গেল। তার ভেতরে কল্লোল জাগছে। কেন? কেন? এমন লোক সে কখনও দেখেনি, এমন কথাও কখনও শোনেনি। সবাই এক! ভুল করেছে! মেরে ভুল করেছে! শাস্তি নিতে চায়! বাইরে তাকালে সে দেখতে পেত নিমেষ, মধুরা... এবং বি-গোষ্ঠীর আরও সব লোক আস্তে আস্তে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা কুটিরগুলিতে ঢুকে যাচ্ছে। ধান্যের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে, ওই কিছু ধান্যঘাস বেদির ওপর চড়াত শব্দ করে আছড়ে ফেলল। শমের নির্দেশে একটি মোটা বেঁটে যষ্টি দিয়ে ওরা ধান্য প্রহার করছে। সূর্য আকাশ পরিক্রমা করছে। কোলাহল শুরু হয়ে গেল। কুটিরগুলি ভাগ ভাগ হচ্ছে। দু'তিনজন করে একেকটিতে থাকবে। ধান রাখার গর্তগুলি পরিষ্কার করছে কেউ কেউ। আগুন-চক্র তৈরি করার জন্য কাঠকুটো বয়ে আনছে কেউ কেউ, কাছাকাছি ঝরনাটি দেখিয়ে দিচ্ছে একজন। চক্ চক্ গব্ গব্ করে জল পান করছে সব।

—তোমরা মধুরাকে নেত্রী বলে মানবে। —মধুরা বলল।

নিমেষ বলল— মধুরা, নিমেষ তোমাদের রক্ষা করবে, তোমরা নিশ্চিন্তে ধান্য-উৎপাদন করো, মৃত্তিকা থেকে পাত্র তৈরি করো, তোমরা পশুগুলিকে চরাও, পশুলোম কাটো। হরিণ ইত্যাদির চামড়াগুলি পেটো, গাভিগুলিকে ঘাস খাওয়াও, ওরা দুধ দেবে, কে কী করবে আমরা বলে দিচ্ছি।

রঙ্কা বুঝতে পারছিল বাইরে কোলাহল হচ্ছে। কিন্তু তার কানে যেন কিছু ঢুকছিল না। সে একটি সর্বশ্বেত মানুষকে দেখছিল। শ্মশ্রু ও কেশ এমনকী ভ্রূ ও চোখের পাতা পর্যন্ত শ্বেত, কিন্তু বৃদ্ধ নয়। বলিষ্ঠ সুন্দর মানুষ, তার চোখ দুটি কেমন আকাশের মতো। বক্ষ যেন বনস্পতির প্রাচীর। তার ভেতরটা ক্রমশ শান্ত হয়ে যাচ্ছিল, কেমন ঘুম আসছিল।

কেননা অনেক দিন সে শুধু নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসেছে। সম্পূর্ণ একা কাটিয়েছে। এতটা একা থাকা তার অভ্যাস ছিল না। মাতঙ্গীর ঊর্ধ্বনেত্র, দৃষ্টিহীন চোখ, মৃদু প্রাণবায়ুর সেই রঙ্কা... আ আ বলে ডাক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, শুকনো কঠিন দেহ নিশিদিন তার চোখে ভাসছিল। সে সবচেয়ে দুর্বল বলে তাকে এবং ছন্দ সবচেয়ে সবল বলে তাকে ভালবাসত মাতঙ্গী। সে স্পষ্ট বুঝতে পারত। কী ভাবে খেলার সময়ে তার দিকে তাকাত মাতঙ্গী। কীভাবে সে তার ফুল তোলা বাকলগুলি দেখে প্রশংসা করত। তিরধনুকের শিক্ষায় সে যখন প্রথম লক্ষ্যভেদ করল পরপর তিনবার, মাতঙ্গী তাকে প্রায় পিষ্ট করেছিল বক্ষে, বলেছিল কে বলে রঙ্কা আনমনা? সে তো লক্ষ্য বিঁধল! প্রথম হরিণটা যখন শিকার করল! সে কী আনন্দ মাতঙ্গীর। সে এখন বুঝতে পারে মাতঙ্গীর গর্ভে যে যে জন্মেছিল, সে, ছন্দ, শুক্কো, বভ্রি, অন্যা... এদের সবার জন্য মাতঙ্গীর বিশেষ ভালবাসা ছিল। ভালবাসা মানে একরকম টান। সে আর মাতঙ্গী বলে মাতঙ্গীকে ভাবে না, যে মাতঙ্গী গোষ্ঠীনেত্রী, শিকারে, যুদ্ধে, বিতরণে, পরামর্শে অগ্রণী, যার কাছে সব শিশু বালকই সমান, তার ভেতর থেকে এক স্নেহশীলা, কারও কারও প্রতি বিশেষ টানযুক্তা মাতঙ্গী বেরিয়ে এসে তার স্মৃতিতে বসবাস করছে। সে মাতঙ্গীর কথা ভাবলে এখন নিজেকে মাতঙ্গীর নিম্নদেশের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে তারপর কোলে-পিঠে উঠে তার স্তন্য পান করা একটি শিশু হিসেবে দেখতে পায়। মাতঙ্গীর মুখের কোমল হাসি, তার উন্নত কপালে তার জন্য নিশ্চিন্ত আশ্রয়, তার দেহ মনের বলিষ্ঠ প্রশান্তি বোঝে, এবং কেন কে জানে 'মাতঙ্গী' নয়, শুধু 'মা' ডাকটিই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ক্রমশ ছায়া লম্বা হতে থাকে। ধূসর অপরাহ্নের দিকে রঙ্কা কেমন এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পাখিদের কলকাকলিতে যেন বহু ধন্যার জল বইছে চারদিকে। গোলাপি কমলা আলো নেমে আসছে আকাশ থেকে। কুটিরগুলোতে কুলোচ্ছে না। আরও কয়েকটি গড়া শুরু হয়ে গেছে। শম, দম, অর্যা নেতৃত্ব দিচ্ছে, সবাই মিলে তৈরি করছে। সন্ধে নেমে যাওয়ার আগেই আরও কয়েকটি কুটির তৈরি হয়ে গেল। আর করতে হলে

আরও বন কাটতে হবে— এখন ক্ষান্ত দেওয়াই ভাল। পাড়া ঘিরে আগুনের ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনটি বরা ও প্রচুর খরগোশ পোড়ানো হচ্ছে। রঙ্কা বহু দিনের টান-টান পাহারাদারি, ক্রোধ, শোক থেকে আজ বোধহয় মুক্তি পেয়েছে। সে ঘুমোচ্ছে। শমেরা নোনা মাটি থেকে লবণ বার করে মাংসে মিশিয়ে দেয়। অপূর্ব তার স্বাদ। মধুরা গোষ্ঠীর লোকেরা খেতে খেতে মুখে নানারকম প্রশংসাসূচক শব্দ করছিল— 'আহ্, বাহ্। ওহ।'

বেদবতী

অশৌচের দিনগুলোয় বেদবতী ফল মিষ্টি নিয়ে প্রায়ই যান। সেজবউদি বলছিল— কী নোলাই হয়েছিল শেষটা ঠাকরুনের। মাংসের স্টু করছি। গন্ধ ছেড়েছে। নাক উঁচু উঁচু করে শুঁকছে— বউমা কী রাঁধছ? আমাকে দিয়ো তো! শোনো কথা। পঞ্চাশ বছর বেওয়া, মাছ-মাংস ছেড়ে মুশুর ডাল সুদ্ধু মুখে তোলেনি, সে খাবে মাংস।

বেদবতী শক্ত কথা বলতে পারেন না, তবু সাহস করে বললেন এবার— তোমাকে কিন্তু কিছুই বারণ করেননি মা। বরাবর মাছের হেঁশেলে।

সেজবউদি কথাটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন— আমার কথা যদি বলো, তোমার সেজদা গিয়ে অব্দি মাংস ছুঁইনি বেদো। মা অত বড় দিব্যিটা তোমার মাথার ওপর দিলে। কী করি বলো, একটু মাছমুখ করতুম। একাদশী, পুন্নিমে— সব বাদ দিয়ে কিন্তু।

বেদবতী বললেন— শেষকালটায় যা ইচ্ছে হয় মহাপ্রাণীর, দিতে হয়। কী-ই বা খাবে!

—মাথা খারাপ! ওদিকে নরক যদি না-ও হয়! এদিকে? ছেরাবে। কিছু মনে কোরো না ভাই। শয্যাগত এইরকম উলুধাবড়ি রুগির সেবা করা ভয়ানক কর্ম। চারটি এরকম কথা বেরিয়েই যায়।

নিশ্বাস ফেলে বেদবতী বললেন— মনে আর কী করব! এসব তো

আমার মায়ের গায়ে লাগছে না। তিনি তো আর নিজেতে নিজে ছিলেন না। যিনি ছিলেন তিনি সর্বমঙ্গলা দেবী নন।

—তবে কি ভূতে ধরেছিল?

বেদবতীর মেয়ে রঞ্জা বলল— সে আবার কী মাইমা, তুমি সেনিলিটি জানো না? এত বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচলে, শরীরের অন্য যন্ত্র ঠিকঠাক, কিন্তু মস্তিষ্কটা কাজ করছে না ঠিক— এরকম অবস্থা তোমার আমার সবার হতে পারে!

—বাপরে! ভাবলে ভয়ে কাঁটা দেয়। ভগবান করুন যেন হাত-পা থাকতে থাকতে যাই।

আজ সেই সর্বমঙ্গলা ঠাকরুনের শ্রাদ্ধবাসর। যে ছবিটি দানসাগরের হরেক সামগ্রীর মধ্যে খাটবিছানার ওপর রাখা হয়েছে, সেটি অন্তত বছর কুড়ি আগেকার। বেশি তো কম নয়। ইতিমধ্যে ছবি বিশেষ তোলা হয়নি। যে কটি গ্রুপ ফটোয় পাওয়া গেল, বেদবতীর পছন্দ হয়নি। তাঁর সংগ্রহে মায়ের যে সবচেয়ে সুন্দর ছবিটি ছিল সেটিই চমৎকার করে বাঁধিয়ে চন্দন-মালা পরিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে রাখা হয়েছে। শুভ্রবসনা। মুখে মায়ের হাসি। চুলগুলি যে পাকা তারও একটা মাধুর্য আছে। যেন মহিমায় মহিমা যোগ করছে। কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা পরতেন উনি। বানপ্রস্থের জপমালাটি অবশ্য নেই। যতই গুরুপুত্রকে প্রণাম করুন, দীক্ষা নিন, রাধাগোবিন্দর পুজো করুন, এত উপবাস করুন, সর্বমঙ্গলা জপে বসেছেন এ দৃশ্য কেউ কখনও দেখেনি। বললে বলতেন— ওই তো জল বাতাসা দিলুম রাধাগোবিন্দকে, পাশে লক্ষ্মী রয়েছেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ, আমার গুরুদেব বালানন্দজি। সব নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করে নেবেন এখন। ওঁরা তোদের মতো বেআক্কিলে নয়। যেদিকে না যাব সেদিকেই সব ছত্রাকার, যেটি না দেখব সেটি হবে না। বলি ও সেজবউ, বাচ্চাগুলোর শিঙিমাছের ঝোল, আলুভাজা হল? এখনও হয়নি? আর হয়েছে। শাউড়ির তো খুব নিন্দে হয়, বলি আর একটু কাজে মন দিলে হত না? তোমার নিজের ছোটটাই তো আপসাচ্ছে।

সে যাই হোক— ছবিটিতে তাঁকে বেশ গুরুমা গুরুমা লাগছে। যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সদাসর্বদাই দেখা হচ্ছে। বন্ধুর সম্পর্ক। তিনি নিজেও যেন সব কাজের কাজি, সবার আশ্রয়স্থল। মা বলে একবার হত্যে দিয়ে পড়লে জগতের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

অভ্যাগতরা অনেকেই ছবিটির প্রশংসা করছিলেন।

—বয়সকালে রূপে জগদ্ধাত্রী ছিলেন বোঝাই যায়— একজন বললেন, জোড় হাতে নমস্কার করলেন ভক্তিভরে।

রঞ্জার মনে হল— জগদ্ধাত্রী যদি না থাকতেন বয়সকালে তো কী হত! শ্রাদ্ধবাসরে ভক্তি শ্রদ্ধার ঝুড়ি কি খালি যেত? কী যে এদের ভ্যালুজ! সেই একঘেয়ে তুলনা— লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীশ্রী, স্বয়ং দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, আর কী কী! সীতার মতো চরিত্র, সাবিত্রী সমান হও, এক কথা, এক কথা। লক্ষবার শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

বেদবতী কথা বলতে চাইছিলেন না। তাঁর মন পড়ে ছিল সেই কোন কালের ছোটবেলায়। তখন ভাইবোনেরা, মা বাবা... সেসব কি স্বপ্নে দেখেছিলেন? যেন কোনও রিয়্যালিটি নেই সেই ছোটবেলার। একেবারে অবাস্তব! কে এই তিনি? আয়নায় মুখ দেখে সাত আট বছরের সেই এক্কা-দোক্কা খেলা বালিকাকে তো চিনতে পারেন না। অথচ সে-ই সত্যি। এই পলিত কেশ আশি বছুরে বৃদ্ধা নয়। অনেক চেষ্টা করে একটা আবছা ছবির মতো মনে পড়ল ডুরে শাড়ি পরা যুবতী মাকে। মুখখানা এত আবছা যে মানুষটা যেন স্কন্ধকাটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদিকে কীর্তনের ও-ও-ও-ও হুংকার উঠেছে। মাথুর গাইছেন একটি দল। তাঁদের ছোটবেলার সেই সব ময়না ডাল-টাল জাতীয় কিছু আর নেই। এখন বেশির ভাগ বাড়িতেই একজন কোনও শিল্পীকে ডাকা হয়, কীর্তনও গান, আবার নানারকম ভক্তিমূলকও গান তাঁরা। রঞ্জার পিসি মারা গেলেন, তখন রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত গাইয়ে। চার জেনারেশন বাস করছে এ বাড়িতে, এখনও ছোটকনে বেঁচে। এখানে এসব হবার জো নেই। কিন্তু সবাই এদিকে ওদিক দল বেঁধে গল্প করছে।

গানে কারও মন নেই। গানের হা-হুতাশও কাউকে স্পর্শ করছে না। চা আসছে, মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংক। কেউ কেউ উঠে গিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। মূল গায়েনও উঠে গেলেন এবার। রঞ্জা বলল— সিগারেট ব্রেক মা।

রঞ্জা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, চতুর্দিকে খালি বৃদ্ধ বৃদ্ধা। এত বুড়োবুড়ি সে যেন আগে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। সাদা পাঞ্জাবি কিংবা ফতুয়া ও ধুতি পরা বৃদ্ধ, থান, ধুতি, চওড়া পাড় পরা বৃদ্ধা। অনেকের পাকা চুলের মাঝে বিন্যস্ত সিঁদুর, মাথাময় ছড়িয়ে গেছে। একজন বিধবা বহু দিন জ্বলবার ও জ্বালাবার পর মারা গেছেন। তিনিও জুড়িয়েছেন, বাড়ির লোকও জুড়িয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের সধবা-গৌরব ঘোষণা করতে এসেছেন চওড়া লাল জরিপাড় শাড়ি ও বিসদৃশ সিঁদুরে। অনেক অল্পবয়সি বধূ ও গিন্নিও রীতিমতো গয়না পরে এসেছেন। বৃদ্ধদের মুখগুলি কেমন উদ্ভ্রান্ত মতো। অন্তত রঞ্জার তাই মনে হল। আত্মস্থ নয় যেন। এত দিন তাঁদের চেয়েও বয়সে বড় কেউ বেঁচে ছিলেন, এখন তিনি চলে যাওয়ায় সে আড়াল সরে গেল। এক্সপোজড্ হয়ে গেছেন শেষের সে দিনের সামনে। অনেকরকম কথা কানে এল। কেউ বল্‌ছেন— বড় ভাল ছিলেন দিদি/বউদি। আগের বার আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বললেন হরি না? অথচ দেখ এরা বলে নিজের লোকেদের পর্যন্ত নাকি কখনও-কখনও চিনতে পারতেন না।

একজন বললেন— তুমি তা হলে আপনজনের বাড়া ছিলে হরিদা...। কী জানো। বুড়ো হয়ে গেলে কেউ আর পোঁছে না। বাড়ির লোকেদের থেকে বাইরের অতিথিকে তাই আপন মনে হয়।

—সেনিলিটির সাইকোলজি বোঝা অত সোজা নয়। একজন শক্তপোক্ত বৃদ্ধ বললেন, তা হলে জেরন্টোসাইকোলজিস্ট হতে হয়।

একজন হেসে বললেন— তোমার ওই বোম্বাই কথাটার কোনও মানে নেই শম্ভু। এরা যে বৃদ্ধদের বাঁচাবার জন্যে এত চেষ্টা কেন করছে আমার বোধগম্য হয় না, তা যদি বলো। ষাট বছরে বিদায় দিবি, ফিজিক্যাল অ্যাজিলিটি আর মেন্টাল অ্যালার্টনেস নেই বলে। স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ দিনে দিনে কমিয়ে দিবি যাতে বুড়োটা দুধ-মাছ-ফল খেতে না পারে।

কোনওক্রমে ডাল ভাত, তো এত ওষুধ-বিষুধ কেন? সর্ব বউঠানের বোধহয় চুরানব্বুই পঁচানব্বুই হয়েছিল। আমার শ্বশুর গেলেন নব্বুইয়ে। তাঁকে টানা দশ দিন লাইফ-সাপোর্টিং-এ রেখে দিলে! আরে সে লোকটা দশ দিন আগে মারা গেছে! কেন বলো তো! লাখ-লাখ টাকা পার্টির হাত থেকে আদায় করবে। তোরা, তোদের জেনারেশন উচ্ছন্নে গেছিস, মানুষের প্রাণ নিয়ে বেচাকেনা করিস তো আবার জেরন্টো-টেরন্টো কেন শম্ভু? হরি, তুমিও বলো।

একজন বললেন— আমার কী মনে হয় জানেন, বৃদ্ধরা এক ধরনের গিনিপিগের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনও সময়ে পুনর্যৌবনের কি অক্ষয় যৌবনের ওষুধ বার করবে বলে বুড়োদের বাঁচিয়ে রাখছে। নানা এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে।

একজন পদস্থ বৃদ্ধ কোঁচানো ধুতি ও গিলে পাঞ্জাবি পরে হাতে রুপো বাঁধাই লাঠি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। আর পারলেন না। এঁদের দিকে তির্যক তাকিয়ে উঠে পড়লেন। সার সার ভুজ্যি উৎসর্গ করছেন সর্বমঙ্গলার নাতবউরা। ছোটমামার মেয়ে গীতালি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল— দাদু, আপনি চলে যাচ্ছেন? একটা থেকেই খাওয়া শুরু হয়ে যাবে।

কাষ্ঠ হেসে ভদ্রলোক বললেন— দাদুদের কি আর ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে বসে থাকা মানায়? আমি উঠি। ...না না ঠাট্টা করছিলুম। উঁহু, আমার ওসব চলে না, স্রেফ সেদ্ধ ভাত উইদাউট মাখন অর ঘি।

নিজেদের অবস্থানের বিষাদ ও বিরক্তিতে একজন বৃদ্ধ উঠে যাবার দৃশ্যটা কেউ লক্ষ করল না।

শম্ভু নামের ভদ্রলোক বললেন— আজকাল বলছে লাইফ স্টার্টস অ্যাট সিক্সটি। লাইফ স্টার্টের বয়সটি ক্রমে উঠছে। একসময়ে বলত ফর্টি, তারপর বলল ফিফটি, ইদানীং সিক্সটি। তা সিক্সটির আগে কি সব প্রস্তাবনায় ছিল। বই শুরুই হয়নি! —হাসলেন কয়েকজন, বললেন— বই-ই বটে!

একজন বললেন— দেখবে রিঙ্কলফ্রি ক্রিমের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। মাথার

চুল কালো করে দেবে, চোখের তলার থলে অপারেশন করে দেবে। ক্রিম মাখিয়ে রিঙ্কল তুলে দেবে, লেজার ট্রিটমেন্ট করে ঝোলা চামড়া টান করে দেবে। আর কী চাই?

—চাই টাকা! আর কী! সুদের দরুন যে আট পার্সেন্ট পাচ্ছ, তাই দিয়ে খাবে? না রিঙ্কল মাখবে? এত যখন সুবিধে তখন দে টাকা। সুদটা বাড়িয়ে আগের মতো টুয়েলভ পার্সেন্ট করে দে! কী সর্বনেশে, চশমখোর গভমেন্ট বাবা। সারাজীবন সার্ভিস নিলে। চোখে কানে দেখতে পেলুম না। হঠাৎ বলে, ওঠ বুড়ো তুই বাড়ি যা। পেনশন? পাবি না, কাগজপত্তর তৈরি হতে হতে টেঁসে যাবি আশা করছি।

এ বাড়ির একটা সুবিধে আছে। দাদাদের ছেলে-বউ-মেয়ের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তারা কেউ বাইরে সেটল করেনি। তারাই কাজকর্ম করছে। জীবিত ভাইদের মধ্যে কনেভাই ভবানীপ্রসাদ আর ছোটভাই শিবানীপ্রসাদ। দু'জনেই বেদবতীর থেকে ছোট। সেজবউদি তাঁর বয়সি। রাঙাবউদিও ছোট। তবে সবারই ৬৭/৬৮ থেকে ৭৮/৭৯-র মধ্যে বয়স। ছোটবউ ললিতা বলল— কত দিন পরে বলো ঠাকুরঝি? দেখাসাক্ষাৎ-ই নেই। আমার বিয়ে হল, তখন রঞ্জিত তোমার কোলে। কী ফুটফুটেই ছিল। ক'দ্দিন দেখি না। ভাল আছে তো সব?

বেদবতী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন— রঞ্জিতই একমাত্র সাগরপার এবং সঞ্জু আর নেই। কিন্তু অন্য ছেলেরাও এককে ভাই এককে ঠাঁই। যে কোনও বেলা সে ছোটবেলাই হোক আর যৌবনবেলাই হোক বৃদ্ধের দৃষ্টিতে দেখলে কত অন্যরকম। একেবারে অবাস্তব। রঞ্জিত মুড়ির মোয়া খাচ্ছে, তিনি গলদা চিংড়ির হাঁড়ি কাবাব রান্না করছেন। মঞ্জু পাশে বসে বসে শিখছে। সঞ্জয়ের কাছে কানমলা খেয়ে রঞ্জা হাসছে। টাস্ক্ করেনি। কত ছোট ছোট দৃশ্য।

দুই ভাইবোনের একসঙ্গে জলবসন্ত হল— এক মশারিতে দুজনে শুয়ে। যতক্ষণ না মা আসবে উশখুশ উশখুশ। নিমের ডাল নিয়ে খেলা। সেই প্রথম শুনলেন চিকেন-পক্স-এ মাছমাংস অর্থাৎ প্রোটিন অবশ্যই খেতে হয়। জ্বর কমে গেলেই ছেলেরা ফল দুধ মাছমাংস সবই খেল।

সেরে যাবার পর না রইল কোনও দুর্বলতা, না রইল কোনও দাগ। উনিই বললেন এসে— ভাল চারা পোনা এনেছি। লাফাচ্ছিল, আর মুরগি। ব্যস খাবে আর লাফিয়ে উঠবে।

—চারা মাছ খাব না।

—সে কী রে? চারা মাছের চারা নেই। নির্মল ডাক্তারবাবু ভীষণ রেগে যাবেন। দু'চার দিন খা বাবা, তারপর আবার বড় মাছ আনব। পেঁপে দিয়ে ঝোল করে দিয়ো বুঝলে?

—পেঁপে? হোয়াক থুঃ ...

—বলিস কী রে পেঁপে, পাপায়া! যে খাবে তার পাপ নাশ হয়ে যাবে, জানিস না?

উনি ওইরকম মজা করে কথা বলতেন। ফুর্তিবাজ মানুষ।

—এসব কি স্বপ্নে দেখেছেন, না কোনও বইয়ে পড়েছেন? এসব অভিজ্ঞতার কিছুই যেন তাঁর আশি বছুরে সাদা কুঁচকোনো শরীরের কোথাও নেই।

—দিদিমা আমার জলবসন্তর বেলায় এসেছিলেন আমার কাছে। মনে আছে মা তোমার? রঞ্জার কথায় শ্রাদ্ধবাসরে ফিরলেন বেদবতী।

—হ্যাঁ মায়ের সেবাটা খুব ছিল— ছোটবউ বলল, কনেবউ সায় দিল। কটাক্ষে একবার সেজর দিকে তাকাল, নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

বেদবতীর মনে পড়ে গেল রাঙাদার বিয়ের সময়ে সর্বমঙ্গলা এক কাণ্ড করেছিলেন। প্রত্যেক বিয়েতেই অবশ্য কাণ্ড হত। শয়ে শয়ে মেয়ে দেখা, মেয়েদের চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে দেখা। অত্যন্ত লজ্জাকর। বেদবতীর সেসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে হত না। কিন্তু কী করবেন মায়ের জেদ। খুকি নইলে 'আজকালকার' পছন্দ অপছন্দ কে বুঝবে!

—তুমি বড়বউদিকে নিয়ে যাও, মেজবউদিও তো রয়েছে।

—ওরা তো যাবেই, তুইও যাবি। খালি সেজকে নেব না। কী বলতে কী বলবে!— নিজে যেন খুব ভাল কথা বলতেন।

খোঁপাটা একটু খোলো তো মা! ভেতরে আবার গুছিটুছি কিছু আছে

ন্যাকি! গুছি বেরোল। বললেন— অতখানি খোঁপা চাই না। খোঁপা নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব মা! মাথা সাজানো চুল হলেই হল। নকল দিয়ে কী হবে? মুখে কি পেন্টও করেছ, আজকাল সব হয়েছে কতরকম।

বেদবতী বললেন— আঃ মা!

—আঃ কেন? আমার এক কথা। শোনো মা, আমার ডানাকাটা পরি, কেশবতী মেমসায়েব চাই না। সাধারণ মেয়ে, ছিরিছাঁদ থাকবে। এই পর্যন্ত। নম্র, বিনয়ী, সংসারের কাজকর্ম জানবে, গুরুজনকে সম্মান করবে, ছেলেমানুষকে স্নেহ করবে— ব্যস।

অরুণা অর্থাৎ রাঙাবউদি লাল মুখে বলেছিল— সাজগোজ করেই তো দেখতে চান সবাই। সাজগোজ করতে হলে একটু স্নো পাউডারও মাখতে হয় মাসিমা। এমনি দেখতে হলে রান্নাঘরে এসে দেখুন না, কে বারণ করেছে!

বলে আবার একটু ফিক করে হেসেছিল।

মা হেসে বললেন— ঠিক কথা। একশোবার ঠিক। তুমি তোমার দিক থেকে একবারে খাঁটি কথাটি বললে। তা আজ মাসিমা বললে, কাল মা বলতে পারবে তো?

অবিনয়ী, মুখরা বলে অরুণাকে বরবাদ করেননি মা। রাঙাবউদি মায়ের খুব প্রিয়ও ছিল। মাঝে মাঝে বলতেন— সে আমায় জব্দ করেছিল একজন। পাউডার মেখে ফরসা হয়ে, চুলের ভেতর গুছি দিয়ে মস্ত খোঁপা করে, জরিপাড় জর্জেট শাড়ি পরে পরিটি হয়ে বার হলেন। যে-ই না খোঁচা দিয়েছি অমনি পরির মধ্যে থেকে বুদ্ধিশুদ্ধিঅলা গোটাগুটি একটা মানুষ বার হয়ে এল, বলল সর্ব দেখ, কী অন্যাই কথা বলেছিস। শুধরে নে। শুধরে নে।

শুধরে অবশ্য নেননি সর্বমঙ্গলা। ন' বউদির বেলা তত্ত্ব পছন্দ হল না। ফেরত দিলেন। মায়ের ছেলেরা ছাড়া সবাইকার লজ্জার একশেষ। ছেলেরা মায়ের সিদ্ধান্তের ওপর কথাটি বলত না।

কেন অপছন্দ? —বেনারসি জ্যালজেলে, দু'খানা না দিয়ে একখানা ভাল দিলেই তো হত! নমস্কারি সব সস্তার ফরাশডাঙা দিয়েছে।

—আচ্ছা মা। বেদবতী বলেন— বেনারসি তো তুমি পরবে না, পরবে বউদি, তোমার কী? ও সব নমস্কারি পরবে পাঁচজনে। তোমাকে তো গরদ দিয়েছে!

—আহা হা হা, একটা দেখনাই আছে না! লোকে এসে তত্ত্ব দেখবে। পাঁচজনে যদি বলে কুটুমের নজর ছোট তো কার মাথা কাটা যায়?

—কারও না। সেজবউদি হেঁকে উঠল— আমার বিয়েতে তো সাতখানা বেনারসি এসেছিল, দামি দামি, তার মধ্যে চারখানাই তো অন্য বউদের দিয়ে হাপিস করে দিলেন। কী, না ওদের নেই। তা এগুলোও হাপিস করে দিন, অন্য বউদের আলমারি থেকে নিয়ে কনেবউকে দিয়ে দিল দেখান। তা না, তত্ত্ব ফেরত দিচ্ছেন। কী অপমান! কী অপমান!

কিছুতেই টলেননি সর্বমঙ্গলা। তত্ত্ব ফেরত গেল। সেই বেলার মধ্যেই ভদ্রলোকের ভাল নমস্কারি জোগাড় করতে হল। সর্বমঙ্গলার হাতে-পায়ে ধরলেন— বেনারসি তো আমার মেয়ে পরবে দিদি, ছেড়ে দিন, আর পারব না। মিষ্টির তত্ত্ব, ফলের তত্ত্ব কীরকম করেছি, দেখুন! পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সব কিছু একেবারে ফার্স্টক্লাস। সত্যিই রেকাবির মতো ক্ষীরমোহন, বিরাট সাইজের শিঙাড়া, টেনিস বলের মতো খাস্তার কচুরি, প্রচুর মাছ এল সাত সেরি। ফলের ঝুড়িতে শীতের দিনের সব ফল। তরিতরকারি। সেই ক্ষীরমোহনই সেজবউদি খপ করে তুলে নিয়ে খেয়েছিল।

আহা! ভদ্রলোকের প্রচুর দেনা হয়েছিল। কালো মেয়ের বিয়ে দিতে ডুবে গিয়েছিলেন একেবারে। কিন্তু এ বউদিরও খুব বুদ্ধি। তাঁকে চুপিচুপি বলেছিল— বুঝলে ঠাকুরঝি, তোমার ভাই খুব বুঝদার। অনেক ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছি। বাবার ধার শোধ দিচ্ছে মাস মাস। কাউকে বলবে না তো!

—ছিঃ, কাকে আবার বলতে যাচ্ছি!

প্রথমটা তাঁর খটকা লেগেছিল, এ আবার কী! সবে বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরের দেনা শোধ করছে! কাউকে বলেননি। খটকাটা সমানে খচখচ করছে। কনেভাইয়ের একটু পরে বিয়ে হয়েছে। তাই কি এখন থেকেই

বউয়ের ভেড়ুয়া। শ্বশুরবাড়ির পোষা হয়ে গেল? ছি ছি। কাউকেই বলেননি— বউদি বিশ্বাস করে তাঁকে বলেছে। বউদি লোক চেনে। বুদ্ধিমতী তো? তারপর ভুলে গেছেন কবে। পণপ্রথা নিয়ে যখন কথা চালাচালি হতে লাগল, খবরের কাগজে, মানুষের মুখে মুখে... তাঁর স্বামী বললেন— টাকা নিচ্ছে, মানে ছেলেকে বেচে দিচ্ছে ধর্মত। তো তাই দাও! ছেলেও রইল ঘরে বাঁধা, মায়ের জন্যে দাসীও এল, তো টাকা কেন? দাসীতে কি টাকা আনে? আনে রানি জাতীয়রা। তবে তাকে রানির মতো রাখো। তাঁবে থাকো। হুকুম পালন করো। এ এক আচ্ছা গোলমেলে সমাজ তৈরি হয়েছে! একটা প্রিন্সিপলে চল। ডাবল, ট্রিপল হয়ে যাচ্ছে যে! প্রত্যেকটা সেলফ কনট্র্যাডিকটরি।

স্বামীর বন্ধু সচ্চিদা বললেন— পেছনে যুক্তি নেই বলছ! ছেলেকে যে এত কাঠখড় পুড়িয়ে পয়সা খরচ করে বড় করলুম, সে উশুল করতে হবে না! ছেলে দামি নয়!

হা হা করে হাসছেন কিরণময়— ভাল বললে। তুমি জন্ম দিলে, পয়সা খরচ করে উপার্জনক্ষম করা তোমার কর্তব্য, তাই করেছ! তো? সে উপার্জন করে তোমাকে বুড়ো বয়সে দেখবে, এর মধ্যে মানুষ করার খরচ-খরচা উশুল করার কথা আসছে কোত্থেকে? ছেলেই উশুল করবে বাপকে দেখে— এই তো সোজা হিসেব। ছেলের বউয়ের বাবার থেকে কী সুবাদে টাকা নিচ্ছ? সেও তো তার মেয়েটিকে খাইয়ে-পরিয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে বড় করেছে। উশুল তো পাচ্ছেই না, বরং উশুল করবার সময়ে পরের ঘরে সংসার করতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিচ্ছে তো? তা তার ওপর পণের টাকা, একশো চল্লিশখানা নমস্কারি, এসব কী! মেয়েটিকে নিলে বলে টাকা বরং তুমি কিছু গুনে দাও! যদিও কন্যাপণও ছোটলোকি কারবার। মানুষ কেনাবেচা যায় না। তা করলেই দাস-ব্যাবসা হয়ে গেল। বুঝলে ভায়া?

ভায়া কতটা শুনলেন বা বুঝলেন কে জানে। কেননা সংস্কার, অভ্যাস বা ঐতিহ্য, বিশেষত তার সঙ্গে যখন স্বার্থ জড়িত আছে, তা ত্যাগ করা খুব শক্ত। যুক্তি, বুদ্ধি সেখানে কাজে লাগে না। অনেকবার দাদা বা

ভাইদের বিয়ের সময় 'ঘরখরচা' কথাটা শুনেছেন বেদবতী। 'ঘরখরচা' হাজার দুই তো দিতেই হবে, যত বেশি দেবেন তত জাঁক করতে পারব।

-কে বলছেন? —বাবা, আড়-লম্বা, দোহারা চেহারা, এইসা ঝোড়ো ভুরু আর গোঁফ। খট করে লাগত কানে। বউদির বাবা টাকা দেবেন, সেই টাকাতে পোলাও-মাংস দিয়ে জাঁক হবে। তাঁদের বাড়িতে? কেমন যেন বিসদৃশ, অসংলগ্ন। তবু তেমন করে প্রশ্ন করেননি মৃদু স্বভাবের মানুষটি। বাবা গত হবার পর মা যখন সেই ভূমিকাটাই নিলেন, আরও খারাপ লাগল। সেজবউদির বেলাতেই আপত্তি করেছিলেন। —মা, এগুলো কি না চাইলেই নয়? নিজেদের কেমন খেলো লাগে না?

—তুই থাম, বেদবতী বিদ্যেবতী। এগুলো আমাদের পাওনা। তা ছাড়া তারা নিজে থেকে দিতে চাইছে। একটা দর কষাকষি হচ্ছে, কিন্তু যা চাইব, অন্যায্য তো চাইব না। রাজি হয়ে যাবে। হাঘরে-হাবাতে তো আর নয়, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের সম্পন্ন গেরস্থ। বহু জমিজমা, চালকলে গমকলে টাকা খাটছে। মেয়ে বলতে একটি।

—আমিও তো তোমার একমাত্র মেয়ে। দিয়েছিলে? কত দিয়েছিলে মা?

—সে তখন তো কর্তা বেঁচে। তিনি কী দিয়েছেন আমি জানি না। —মা স্পষ্টই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন।

—তোমার জামাই আপত্তি করেননি?

—কিরণ? সে তো তখন বছর বিশের ছোকরা। সবে পাসের পরীক্ষা দিচ্ছে, সে জানতই না, জানবার কথাই না।

নিজের ভেতরের সত্তা যেই বলে দিচ্ছে এটা ঠিক নয়, তখনই বেদবতীর কান খাড়া হয়ে গেছে— কে কী বলছে। স্বামীকে তাঁর নানা ত্রুটি ও অবিবেচনা সত্ত্বেও খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। মানুষটি ছিলেন দরাজ-স্বভাবের। ভাল উপার্জন করতেন, কিন্তু যত্র আয় তত্র ব্যয়। তিনিই মাঝে মাঝে টেনে রাখতেন। তা হলে পণ স্বামী ভাল মনে করেন না? তাঁর বিয়েতে তাঁর বাবা পণ নিয়েছিলেন— জানেন না। কিরণময়ের নিজের জীবনে সংস্কার না শুভবুদ্ধি, কোনটা সত্য হয়

জানবার জন্য তাঁকে বড়ছেলের বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

—এসব কথা উচ্চারণও করবেন না মিত্রমশায়।

—তবু ঘরখরচা বলে তো কিছু... সব মেয়ের বেলাই দিয়েছি।

—মেয়েকে দিন, তার নামে তার কাছে দিন, শেয়ার-টেয়ার কেনা থাকুক। কিন্তু আমার ছেলের বিয়েতে আমি যেমন পারব তেমন খাওয়াব। তার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে নেবার মতো আহাম্মক, বেহায়া আমি নই।

উঃ শান্তি। বড় শান্তি। বড় শান্তি। একসময়ে মৃদু হেসে স্বামীকে বলেছিলেন, তোমার বিয়েতে কিন্তু আমার বাবা পণ দিয়েছিলেন।

একটু চমকে উঠলেন, তারপরে বললেন— সেই জন্যেই তো তোমায় রানির মতো রেখেছি। রাখিনি?

—নইলে রাখতে না?

তারপর কার্তার হাসির বহর দেখতে হয়।

মা, তোমার বড্ড দোষ। একে ছুঁতে না, ওঁকে ছুঁতে না। দেশ থেকে বিধুখুড়ো এলেন, তাঁকে খাওয়ানো-দাওয়ানো হল— কাঁসার থালা বাটি গেলাস মেজে-ধুয়ে তুলে রাখা হল। তাতে আর কেউ খাবে না। বিধুখুড়োর মতো ছোট জাতের কেউ এলেই খাবে। তার জন্য তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা খাতির-আদরের তফাত হত না। ভেবে দেখতে গেলে সে তো উঁচু জাতের বেলায়ও হত। কুলগুরু নারায়ণ ভট্টাচার্য মশাই আর তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রটি এলেও আলাদা পাথরের বাসন বার হত। ভট্টাচার্য মশাই বোধহয় চক্ষুলজ্জায় নিরমিষ্যি ছাড়া খেতেন না। কিন্তু তাঁর পুত্রটি পাথরের থালায় দিব্যি পাঁচ রকমের মাছ, পরমান্ন স—ব খেত। সেসব বাসনও তোলা থাকত। তাতে আর কেউ খাবে না।

মা, তোমার শরীরে এত স্নেহ, দয়া-মায়া, কাজের লোক ভুবনকে পর্যন্ত নিজে সেবা করেছ, জলপটি, পাখার বাতাস, খল-নুড়িতে কোবরেজের ওষুধ মেড়ে খাওয়ানো। তবু তুমি কেন প্রশ্ন করতে না? এই সব জাতপাত, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ দেওয়া-নেওয়া। তুমি কেন এত অন্ধ

ছিলে! চোখবাঁধা অবস্থায়ও গান্ধারী নিজের স্বামী ও ছেলেদের সমস্ত অনাচার অন্যায় বুঝতেন, প্রতিবাদ করতেন, তুমি চক্ষুষ্মতী, স্নেহময়ী হয়েও সংসার ও সমাজের কূটকচালে নিয়মকানুনের সামনে চোখে পটি বেঁধে, কেমন হাঁটু গেড়ে রইলে!

... আজ তোমার সেই ভুলে ভরা জীবন, শুচিবায়ুতে অশুচি দেহমন নিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ। যাও মা অগ্নিশুদ্ধ হও। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে মাতা। অগ্নিতে সমর্পণ করছি সব। আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুল ভ্রান্তি সব গেছে চুকে/ রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত দুঃখসুখ/ থামিয়াছে বুকে। যত কিছু ভাল মন্দ যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছু আর নাই!/ বলো শান্তি, বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি হয়ে যাক ছাই।

ঈশার অসুখ

এখানে সূর্যাস্ত একটু আগেই হয়। পশ্চিমের জানলার কাচে আলো ঝলকাচ্ছে। ছোটবেলায় তারা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করে কাগজ পোড়াত। কোণের বাড়ি থেকে কে একটি ছেলে তার চোখ তাক করে আয়না দিয়ে সেই একই কাজ করত। পড়ার টেবিলে সরিয়ে তবে শান্তি। শায়রী ঘুমোচ্ছে। জানলার দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ মনে হল; ওই সূর্যাস্তের পুঞ্জীভূত তাপ কি একমাত্র তারই পশ্চিমের জানলায়? গৃহদাহ হবে না কি? উঠে পড়ে সে বৈকালিক গোছগাছ শুরু করে দিল। জামাকাপড়গুলো ছাত থেকে তুলে পরিপাটি করে পাট করে যার যার জায়গায় রেখে দেওয়া। ঝাড়ন দিয়ে একবার সব কিছু দ্রুত ঝেড়ে নেওয়া। ময়লা, ধুলো, অপরিপাটি সে দেখতে পারে না। বেডকভারের কোণ টেনে দিল সমান করে। এবার এক কাপ চা করে খাওয়া যাক। এখানে ভাল চা পাওয়া যায় না। সব অসম। দুধ চিনি চা পাতা একত্র করে ফোটায় এরা, পুরো ভারতেই প্রায় এই রীতি। চলে যায়। লিকার চলে যায়। কিন্তু মকাই বাড়ির চা যেটা মা পার্সেলে

পাঠিয়েছে সেটা একটা ডিলাইট, ঠিক আছে যত দিন থাকে তত দিন চলুক। বুড়োমার মৃত্যুর খবরটা তাকে এত নাড়িয়ে দেবে সে ভাবেনি। চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে সে ভাববার চেষ্টা করল মায়ের দিদিমার কী স্মৃতি তার মনে সঞ্চিত আছে। মায়ের মামার বাড়ি প্রতি বিজয়াদশমীতে অবশ্যই যেত। বিচিত্র সব খাবার হত ওখানে। কত রকমের মিষ্টি, মিষ্টির ফুলঝুরি। খাজা, কুড়মুড়ে, খুব মিষ্টি নয়, মালপো, ভেতরটা নরম বাইরেটা কড়া, রসবড়া—রসে টুপটুপু, এলাচ গন্ধওয়ালা চন্দ্রপুলি, এগুলো মনে করতে পারছে। অদ্ভুত একরকম শুকনো খাস্তা গজা করতেন ওঁরা। সেটা সে খুব ভালবাসত। সব মামি-দিদাই অদ্ভুত ভাল রান্না করতে পারতেন। একটা বড় ঘরে, পালঙ্কের ওপর পিঠে বালিশ ঠেস দিয়ে বসে থাকতেন বুড়োমা। সবাই এলেই নেমে আসতেন, প্রণাম হবে, চিবুক ছুঁয়ে। এটা বোধহয় তার বারো তেরো বছরের স্মৃতি। স্মৃতি খুঁড়লে আরও আগের বুড়োমাকে সে সাদা থান পরে খটখট করে ঘুরে বেড়াতে দেখে। খুব স্পষ্ট করে কেটে কেটে কথা বলতেন। ওঁকে সবাই ভয় করত কি না কে জানে, কিন্তু মানত খুব। মামি-দিদারা সবসময়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। স্বামী, ভাশুর দেওরদের সঙ্গে কথা বলতেন না। যেমন

—ঈশা তোর ছোটদাদুকে জিজ্ঞেস কর তো অম্বল নেবে কি না।

ছোটদাদু বললেন— ঈশা তোর ছোড়দিদিকে বল অম্বল, আবার দই। দুটো খাব না।

এই ভাবে সাক্ষী মেনে মেনে কথা। একমাত্র সেজদিদা এসব মানতেন না। গরমকালের দুপুর। ফট করে ঘোমটা খুলে ফেললেন। বাপরে, ঘাড়ে একটু বাতাস লাগুক। বুড়োমা বললেন— আরও তো পাঁচটা বউ রয়েছে বউমা। গরমটা কি তোমার একারই? সেজদিদি বললেন— হ্যাঁ মা, সে তো আপনি জানেনই। ও রাঙাঠাকুরপো শোনো, শোনো— শুনে যাও, বলতে বলতে চলে গেলেন।

বুড়োমা বললেন— বেহায়া মেয়েমানুষ! শিখবে না, ওকে কী শেখাব? মা বলত— আরও বুড়োমাকে রাগাবার জন্যে ওইরকম করেন সেজমামি।

ও-বাড়িতেও তো এখন তাদের জেনারেশন এসে গেছে। তারা কী করে কে জানে! মায়ের মামাতো বউদি ও বোন অর্থাৎ তার মামাতো মামি ও মাসিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক দিনই কমে গেছে। যদিও মামিদের মাথার আধ ঘোমটার কথা তার ভালই মনে আছে। সিঁদুর-টিপ, চওড়া সিঁদুর, শাঁখা, ঘোমটা। পাঁঠার মাংসের একটা সুরুয়া রাঁধেন দিদিমা, যেটা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে শেখা। এত ভাল— যে মাইলের পর মাইল হেঁটে সেটা খেতে যাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সে পড়েনি, কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথা যা যা লিখেছেন অদ্ভুত! আজব! মায়েতে মেয়েতে কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া! ভাবাই যায় না। মা মেয়েকে মেরেই ফেলল! কে জানে মাতৃতন্ত্রের সেই উত্তরাধিকারটাই শাশুড়িরা পেয়েছেন কি না! নিজের মা আর বরের মা! আকাশ-পাতাল তফাত। তার বন্ধু ইন্দ্রাণীর মায়ের নিজস্ব টাকাপয়সা আছে। থাকেন কানপুরে। যখনই কদমতলায় ওদের বাড়িতে আসবেন, ইন্দ্রাণী, চাকরি করা, বাচ্চার মা একটা, শাশুড়ির খাস দাসীতে পরিণত হবে। আজ মোচার ঘন্ট করো, কাল থোড় ছেঁচকি। কুমড়ো ফুল ভাজো—ওসব ওখানে খাই না। কোনও দিন একটা উপহারও কিনে দেন না ইন্দ্রাণীকে, তার ছেলেকে, বেশি কথা কী, ফ্যাশনেবল মহিলা কলকাতা এসে বিউটি পার্লারে চলে গেলেন। একবারও খাটাখোটা বউয়ের কালিপড়া মুখখানা তাকিয়ে দেখলেন না। 'তুমিও চলো বউমা'—বলতেই তো পারতেন। শুধু তাই নয়। ছেলের সঙ্গে গিয়ে একখানা গাদোয়াল কিনে আনলেন নিজের জন্যে, বাড়িতে যে একটা ইয়াং মেয়ে রয়েছে, একটা বাচ্চা রয়েছে এসব কিছু না।

সে নিজে যে ভয়াবহ ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছিল, যার থেকে এখনও বেরোনোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, পারছে না। মাকে সে একবারও বলেনি তার এই দুর্গতির কথা। মা কষ্ট তো পাবেই ভীষণ, সেইসঙ্গে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে বলবে—আমি তো পড়াশোনাটা শেষ করতে বলেছিলাম ঈশ, কথা শুনলি না। সেক্ষেত্রে বাইরের একটা জগৎ হতে পারত। ছোট জায়গা, অল্প মানুষ। কঠিন নিয়ম। এসবের আবর্তে পড়ে গেলে জীবনটা একটা কুয়োর জীবন হয়ে যায়।

মায়ের সেই 'বাইরের জীবনে' যে সে কখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করেনি, কেমন করে বলবে মাকে কথাটা? অর্ধেক জিনিস, ভাবনা-চিন্তা অনুভূতি গোপন করে যাওয়াই তার স্বভাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারে না। মা, গড়পড়তা মায়ের মতো কোনও দিন জিজ্ঞেস করেনি—শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন! এত বোকা মা, সবাইকেই নিজের মতো মনে করে। বাবা-মা তো! বাবা-মার মতোই হবেন! মেয়ে ছিল না, মেয়ে হল, কত আহ্লাদ! স্নেহ-ভালবাসা, আদর— এসব দিতে কোনও বাবা-মার কার্পণ্য থাকবে, মায়ের এটা কল্পনার বাইরে। কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা তার প্রত্যেকটি কাজে খুঁত ধরে চেঁচাবেন, কঠিন চোখে তাকাবেন, যেন এক্ষুনি একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন বলে।

—না না, রান্নাঘরে তোমায় আসতে হবে না—কর্কশ গলায় বললেন। আসলে যে চাইছেন সে রান্নাঘরেই যাক—কী করে বুঝবে? সে তো অত কুটিলতার মধ্যে মানুষ হয়নি! কাজেই সে গেল না। তা ছাড়া লোক রয়েছে তো!

শ্বশুরের চা দিতে গেল, গর্জন করে উঠলেন—ওঁর চায়ে তুমি হাত দিয়েছ কেন?

হকচকিয়ে যায় সে। ভেতরে একটা রাগ উথলে ওঠে। ব্যাপার কী? ব্যাপারখানা কী রে বাবা, এরা চায় কী?

নিশীথ বলত—একটু মানিয়ে নাও, লেগে থাকো, মা ওইরকম রাগি বরাবর, কাছে কাছে থাকো—ঠিক হয়ে যাবে।

মানিয়ে যে নেব, কীসের জোরে নিশীথ? তুমিই কি তোমার স্ত্রীকে কোনও পূর্ণতা দিতে পেরেছ? বিবাহিত স্ত্রীকে ফেলে তুমি বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করো। হতে পারে তারা আমার চেয়ে চালাক চতুর, খবর রাখে, পাকা ঝানু সব। তুমি তো তাদের বলতে পারতে দেখো, আমার বউ কিন্তু একেবারেই সরল, সাদাসিধে, সে কখনও এত মেলামেশা করেনি। ট্রাই টু পুট হার অ্যাট ইজ। বলারও দরকার করে না। ভদ্রতার নিয়মই হল নতুন কেউ এলে তাকে সহজ করে নেওয়া। নিশীথ তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে? কেন আমাকে ভোলালে? যদি বা করলে

কেন সর্বক্ষণ কূট দৃষ্টিতে আমার গতিবিধি নজর করছ! কে তোমাকে বারণ করেছিল ইকনমিক্স-এর ফার্স্ট ক্লাস, কর্নেল ইউনিভার্সিটির উৎপাদনকে বিয়ে করতে! আসলে তুমি-ই কনফিডেন্ট ছিলে না। এত বিদুষী তেজি মেয়ে সে কত দিন তোমার পুরুষ অহমিকা সইত! সে কত দিন তোমার মা-বাবার কর্তৃত্ব সইত? সইত না, সইত না। তুমিও যে প্রভুত্ব করাটাই পছন্দ করো। মালবিকাদির ওপর কর্তৃত্ব চলত না নিশীথ। সে তোমার থেকে অনেক বেশি উপার্জন করত। অনেক উঁচুতলায় ঘোরাফেরা করত, ইভেনচ্যুয়ালি। এবং সেখানে পৌঁছোবার জন্য তোমাকে হাড়ভাঙা ঘোড়দৌড়ে নামতে হত! স্ত্রীর থেকে কম হওয়া কোন পুরুষ সয়? টিকত না। তোমার আত্মাভিমান আর তার আত্মাভিমানে লড়াই লাগত। তোমাকে আমি যতটুকু দেখেছি, তুমি যেটা ঠিক করবে সেটাই হবে, তুমি যা ভাববে সেটাই ঠিক। তোমার সিদ্ধান্তই চরম। এ জিনিস মালবিকাদি কেন সইবে? তার কীসের দায়? প্রেম? প্রেমের দৌড় ন'বছরের বিবাহিত জীবনে, অন্যদের বিবাহ বিশ্লেষণ করে করে করে আমার জানা হয়ে গেছে। প্রেম বলে কিছু থাকতে পারে সেই প্লেটোর আদর্শর জগতে। কিন্তু এই নশ্বর পার্থিব জীবনে প্রেম নেই। বোঝাপড়া আছে, দয়ামায়া আছে, সয়ে নেওয়া আছে, সহযোগিতা আছে, কিন্তু প্রেম নেই। প্রেম নেই। প্রেম বলতে কী বোঝায়? সে কী বুঝত? দুজন মানুষ পরস্পরকে গভীর ভাবে চাইবে। শরীরে, মনে। পরস্পরের দিকে যখন চাইবে এমন ভালবাসা মুগ্ধতা ঝরে ঝরে পড়বে তা থেকে যে মনে হবে তা একলা ধারণ করতে পারছি না। সবাইকে আলোর মতো বিলিয়ে দিই। কোনও মানুষ, যে সত্যিকারের ভালবাসা পেয়েছে বা বাসতে পেরেছে সে কখনও নীচ হবে না, ইতর হবে না, ঈর্ষাকাতর হবে না। তার স্বপ্নের পুরুষ অবশ্য ছিল পরম সুন্দর। কার মতো? কার মতো! লর্ড বায়রনের ছবি দেখে একদা সে এত মুগ্ধ হত যে বইয়ের পাতা উলটে উলটে ছবিটা খালি দেখত। তারপর যখন মনে হত—এই লোকটি চূড়ান্ত দুশ্চরিত্র, কতজনকে মর্মান্তিক কষ্ট দিয়েছে, তখন তার মন বিমুখ হয়ে যেত। রূপকথার রাজপুত্রদের চেহারা বড়ই

মেয়েলি, ছবিতেই ভাল লাগে। সে কল্পনা করে নিতে পারে অর্জুনকে, কৃষ্ণকে—অপরূপ সুন্দর, কিন্তু বহুগামী। চলবে না। সৈয়দ মুজতবা আলিকে অল্প বয়সে দারুণ অ্যাট্রাকটিভ দেখতে ছিল, ওইরকম চোখা চেহারার পুরুষের যে শেষ বয়সে কী দুর্গতি হল, চেনাই যায় না! এমনই তার সৌন্দর্যের দিকে ঝোঁক, যে কোনও অসুন্দর পুরুষকে সে ভালবাসবে—ভাবতেই পারেনি। নিশীথ একজন বেশ ব্যক্তিত্ববান, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান যুবক। তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুর নয়। তবু তার প্রাণঢালা ভালবাসা সে দিয়েছিল তাকে। দোষের মধ্যে নির্ভর করেছিল, লতা যেমন গাছকে জড়িয়ে খুশি থাকে তেমনই। দুঃখের বিষয় এ গাছ লতা-টতা পছন্দ করে না। ঝেড়ে ফেলে দিল। কোথায় প্রেমিকের কূজন? কোথায় চোখে চোখে চাওয়া? স্পর্শের বিদ্যুৎ! ফর গডস সেক হোল্ড ইয়োর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ। কোথায়? কিছু উত্তেজিত কথা সহবাসের সময়ে, তারপরে উলটো দিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে অফিস যান। রাত করে বাড়ি ফেরেন, ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চান, কিংবা অনন্ত টি.ভি দেখে যান। এর মধ্যে প্রেমের ভূমিকা কোথায়? সে যত্ন করে চা করে এনে দিল। খাওয়ার সময়ে শাশুড়ি ছেলে-বউ পাশাপাশি বসে খাওয়া পছন্দ করেন না। মুখোমুখি বসা পছন্দ করেন না, পিঠোপিঠি বসতে পারলে বোধহয় ভাল হত। হনিমুন?

হ্যাঁ—পুরীতে, যে পুরীতে সে মা-বাবার সঙ্গে বার চারেক গেছে আগেই। আপত্তি করেছিল—গোয়া চলো না? খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

—পুরী হাতের কাছে। চট করে উইকএন্ড-এর সঙ্গে দু দিন জুড়ে নিলেই হবে। গোয়া আউট অব কোয়েশ্চন। তা ছাড়া পুরী ঠিক করেছি, পুরীই যাব। যখন গোয়া ঠিক করব তখন গোয়া যাওয়া যাবে। সব কিছু প্ল্যানমাফিক।

—কখন প্ল্যান করলে গো?

—কখন? অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে বিয়ের আগেই।

সে বেশি যুক্তিপূর্ণ কথা, কথার পিঠে কথা বলতে পারে না। চোর

পালালে তার বুদ্ধি বাড়ে। নবদম্পতি হনিমুন যাবে। পত্নীটির পছন্দ-অপছন্দেরও তো একটা ভূমিকা থাকার কথা! দুম করে এল কথাটা তারপর।

—ফর্ম্যালিটিজ, রিচুয়ালস— এসব চটপট সেরে নেওয়াই ভাল।

ফর্ম্যালিটিজ? হনিমুন ফর্ম্যালিটি? রিচুয়াল? হায় ভগবান, এ কেমন ভুল প্রেমের হাতে সে ধরা দিল?

মা কী খুশি! নিজের হনিমুন-টুন হয়নি। মেয়ে হনিমুনে গেছে, না মা-ই তার মধ্যে দিয়ে গেছে বোঝা ভার। চাপা খুশির আলো মুখে নিয়ে— তোদের বোঝাপড়া মানে রিলেশনস ঠিকঠাক হয়েছে তো!

—আঃ মা!

—না রে, সব মা সব মেয়েকে এ-কথা জিজ্ঞেস করে। খুব ইমপর্ট্যান্ট!

মাকে সে লজ্জার মাথা খেয়ে কী করে বলবে তার জামাইয়ের সবই প্ল্যান ও মর্জিমাফিক। তার মর্জি। তারই ইচ্ছে, তারই প্ল্যান—তার বাইরে কিছু নয়। কিচ্ছু নয়।

আমার বড় অসুখ করেছে মা! বড্ড অসুখ। ভালবাসা চেয়ে না পাওয়ার ভীষণ অসুখ। ন'বছরের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে কোনও অলৌকিক প্রত্যাশায়। ঘটল, এই বুঝি ঘটল। জাদুমন্ত্রে বদলে গেল সব। এখনও এখনও সেই দিবস রজনী কার আশায় আশায় থাকা। এ ভুল মানুষ, ভুল পরিবেশ, আমি নিজেও তো ভুলই। বুঝি, তবু তৃষ্ণা যায় না। চাতকের পিপাসা। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য হাঁ করে বসে রয়েছি যেন। কবে সেই একফোঁটা জাদু জল পড়বে, আমার মুক্তি হবে।

আচ্ছা, এই যে বুড়োমার মামি-দিদা, মাসি-দিদা, এমনকী দিদিমা... এঁরা পেয়েছেন? দুর, ওঁরা তো বুড়ো। যখন ওঁরা ছোট ছিলেন? দুর— ওঁদের অত সব আইডিয়াই ছিল না। বালিকা বয়সে বিয়ে হত। ধেড়ে একটা বরের সঙ্গে। বরটার সব জেগেটেগে গেছে, মেয়েটা নেহাতই খুকি। খুকি অবস্থায় সেক্স যে কী ভয়ানক বিতৃষ্ণা জাগায় তা অল্পবিস্তর সব মেয়েই জানে। যাই হোক, প্রকৃতি তো সংযোগ ঘটিয়েই দেয়।

সোহাগ খুব। তারপর একটার পর একটা বাচ্চা। প্রেম করেছ কি মরেছ! তখনকার দিনে আবার ঘরের সঙ্গে বাথরুমও থাকত না। হয়তো বা একতলায়, কোণে। কী করে কী করত বাবা সব কে জানে! এক মেয়ে হওয়াতেই যা কষ্ট তার! আগে, পরে। ওঁদের কী হত? দিনের পর দিন খেতে না পেরে, হড়হড় বমি করে, তারপর দিবারাত্র বুকের দুধ খাইয়ে, রান্নাবান্না করে, সংসার দেখে, বড় ছেলেমেয়েগুলো, শ্বশুর, ভাশুর, দেওর, ননদ, নন্দাই... ওরে বাপ রে বাপ! প্রেম বাপ বাপ বলে পালাবে।

তবে কি প্রেম খুব ভঙ্গুর কিছু! রিয়্যালিটির ধাক্কা খেলেই ভেঙে যায়? শকে পুড়ে যায়? থেকে যায় ছাই—বৈচিত্র্যহীন দাম্পত্যের, সহনশীলতার, বিতৃষ্ণাকে কোনওমতে চাপাচুপি দিয়ে রাখার? এমনই তো অভিজ্ঞতা তার বহু বন্ধুর। মাত্র পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে সংযুক্তার, বলে—কিছু মনে করিসনি ভাই, প্রেম করে বিয়ে করেছিলুম বটে, কিন্তু বরটাকে দেখলে আমার এখন গা জ্বলে যায়। আমাকে থাকতে হবে স্লিম। সুন্দর, টিপ কাজল পরে ফিটফাট। আর উনি? নোয়াপাতি ভুঁড়ি বাগিয়েছে একটা। সিগারেট খেয়ে খেয়ে আঙুলের ডগা, ঠোঁট ঝাঁজালো, দাঁত তামাটে, মুখে কড়া তামাকের গন্ধ, অনেকের নাকি খুব সেক্সি লাগে, জানি না ভাই আমার তো নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে হয়, তারপর এখন পাওয়া হয়ে গেছে, আর কী! লুঙ্গি পরে পা তুলে বসবে, গবগব করে খাবে, ঘোঁত ঘোঁত করে রাগবে, রোজ এই রাঁধো সেই রাঁধো, সুড়ুৎ করে যখন চা খায় না আমার ভেতরটা সিটকে যায়।

রুবি বলল—তা এত দিন মেলামেশা করলি বুঝলি না কিছু?

—কনশাসলি সব কন্ট্রোল করেছে। জ্ঞানপাপী তো!

রুবি বলল—লুঙ্গি তো ভাল। আমার বর তো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নাক খোঁটে, দমাস করে বায়ুত্যাগ করে আমার সামনেই। বললে বলবে—তুমি তো আমার নিজের বউ। —মানে পরের বউয়ের বেলায় বায়ু সংবরণ করবেন, নিজের বউয়ের বেলা আর কোনও কেতা, সভ্যতা, নিয়ন্ত্রণের দরকার নেই। আসলে আমার আর কোনও দাম নেই। কোনও ভব্যতার চাহিদা থাকতে নেই। আর আমি? আমি যদি একটা ম্যাক্সি বা

ট্রাউজ-কোট পরে ঘুরি। কাজের সময় সুবিধে হয় তো। বলবে— এই ঢোলাটা তুমি ছাড়ো তো, বিশ্রী লাগে। মাইন্ড ইটস আ ম্যাক্সি, নট আ নাইটি। তা আমার তো আর ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো চাঁছা-পোঁছা ফিগার নয়! হয়তো মডেলের মতো লাগে না। মডেল দেখে দেখে এদের ধারণা হয়ে গেছে বউ হবে না-রোগা না-মোটা না-বেঁটে না-লম্বা।

সংযুক্তা বলল—আর ওঁরা হবেন মোটা থলথলে ভুঁড়িদাস, ঘেমো, বেঁটে কি লম্বা কিছুতেই কোনও ছিরিছাঁদ নেই। আমরাও তো মডেল, ফিল্ম অ্যাক্টর, খেলোয়াড় দেখে দেখে বড় হয়েছি ভাই। কী দারুণ দারুণ সব চেহারা, কই বাস্তবে ওরকম হামলে পড়িনি তো, নিজেদের কালো কালো, মোটা বেঁটে বর নিয়েই তো খুশি আছি। আপত্তিটা এই গা-ছেড়ে দেওয়া ভালগারিটিতে। আমাকে সুন্দর থাকতে হবে, তুমিও থাকো, দুজনের জন্য দুরকম প্রিন্সিপল হবে কেন? পুরুষ জাতটাই ভালগার, ছিঃ!

কৃষ্ণা বলে তার এক বান্ধবী নিয়মিত স্বামীর কাছে মার খায়। ঠাস ঠাস করে চড়। ভাবা যায়? কোম্পানি এগজিকিউটিভ বর তার সফ্‌টওয়্যার প্রফেশন্যাল বউকে ঠেঙাচ্ছে? তবু ডিভোর্স হয় না। বাচ্চা আছে দুটো।

রুবি বলে—কেন যে পটাপট দুটো বাচ্চা নামাতে গেলি!

—ও কথা বলিস না। কৃষ্ণা বলল, ওরাই আমার জীবনের আসল মানে। তোরা এই যে সব স্থূলতা, বিয়ের পর টেক ফর গ্রান্টেড করে নেওয়া— এসব বললি না! এসব আমার কাছে কিছুই না। নিষ্ঠুরতা, নির্ভেজাল নিষ্ঠুরতার সামনাসামনি হতে হলে বুঝতিস বিয়ে কী জিনিস!

—কেন? তুই চাকরি করছিস, যথেষ্ট মাটি তোর পায়ের তলায়, লোকটার সঙ্গে থাকিস কী করে? ডিভোর্স নে!

—তা হয় না রে। এক তো ছেলেমেয়ে তাদের বাবাকে ভালবাসে, বাবাও ওদের জন্য করে, তাদের পিতৃহীন করি কী করে? ধর এটা আমার স্যাক্রিফাইস ওদের জন্যে। তা নয় তো অধীরের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। আমার মা-বাবা চলে যাবার পর বাপের বাড়ি

বলতেই বা কী? কতটুকু? তোদের সমাজই বা ডিভোর্সিদের জন্যে কী অভ্যর্থনা ডালায় করে সাজিয়ে রেখেছে, বল?

—মারে কেন? মদ খেয়ে?

—উঁহু। কেমন একটা অদ্ভুত রাগ আছে। সেসব মুডে মুখখানা ভয়ংকর হয়ে যায়, সে সময়ে কিছু বলতে গেলেই উঠে এসে এক চড়।

—এ তো মেন্টাল কেস রে! কাউন্সেলিং করা। ডিজঅর্ডার একটা।

—বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? বললে বলে—আমার কোনও মেন্টাল প্রবলেম নেই, আমি পাগল নই, তুমি যাও কাউন্সেলরের কাছে। আমিই নাকি ঘ্যানঘ্যান করে, ইমোশন্যাল হয়ে ওর রাগ বাড়িয়ে দিই।

সংযুক্তা বলে এই একুশ শতকে কাউন্সেলিং সম্পর্কে এই মনোভাব? এ যে একেবারে মধ্যযুগীয় রে! কিন্তু কৃষ্ণা তুই কি সত্যিই ঘ্যানঘ্যান করিস খুব? ইমোশন্যাল হয়ে পড়িস বেশি বেশি!

—দেখ ঘ্যানঘ্যান মানে ন্যাগিং প্রত্যেক স্ত্রীকে করতে হয়, স্বামী যদি একই ভুল বারবার করে, একই দায়িত্ব এড়ায়। ও শুধু চাকরি করবে, আর আমি চাকরি করব, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দেখব, সংসার চালাব, সামাজিকতা করব। স-ব। বাচ্চাদের স্কুলে পেরেন্টস-টিচার্স মিটিং-এ একটাতেও আজ পর্যন্ত যায়নি। অ্যানুয়াল ফাংশনে ওরা গান করবে,—বাবা যাবে না। প্রিন্সিপ্যাল, ক্লাস-টিচারের কাছে কথা শুনতে হয় আমায় এ জন্যে...

অন্যমনস্ক হয়ে যায় ঈশা। বিয়ে আছে, দাম্পত্য আছে, সহবাস আছে, ডেটিং আছে, আছে সাম্প্রতিক অতি পপুলার ভ্যালেনটাইনস ডে। খালি প্রেম নেই। কাগুজে ধারণা একটা। ভাবের ফানুস।

মৃদুল বলে তার এক সহপাঠী, এখনও যোগাযোগ রাখে। একদিন বলল—তোকে ম্যানেজ করতে পারলাম না ঈশা, ঘরে একটি যা জিনিস এসেছে না! যদি দেখতিস!

দেখাটাই তোদের সব, না!—সে ঝেঁঝে ওঠে।

না না, দেখতে ভাল। ফরসা, বড় বড় চোখ। ভাল ফিগার। কী

ডিমান্ডিং, কী ডিমান্ডিং, তুই ধারণা করতে পারবি না। আমাকে দেউলে করে ছেড়ে দেবে। মার্কেটিং... মার্কেটিং হল তার একমাত্র বিনোদন।

—একদিন বসলেই পারিস। ভাল করে বুঝিয়ে বল। ইয়ে মানে ভালবেসে বল—

—সে গুড়ে বালি। বলবে দুটো চুমুর ফাটকা খেলে আমাকে মেটিরিয়্যাল জিনিস না দেবার ধান্দা, না? অতি ধড়িবাজ মেয়েছেলে...

—ছিঃ মৃদুল!

—স্যরি—নিশ্বাস ফেলে মৃদুল বলল—কিন্তু আর কিছু ভেবে পেলাম না, অ্যাডজেকটিভ হিসেবে। আমার সন্দেহ টাকাগুলো নিয়ে আলাদা অ্যাকাউন্টে রাখছে।

—কেন? তুই কিছু পকেটমানি দিস না?

—দিই বই কী! সেটাই তো সরিয়ে রাখে। একসঙ্গে বেরোবে। তখন আমার গ্যাঁট থেকে যাবে।

কতরকম প্রবলেম। নারী-পুরুষ রসায়ন আর মিলছে না, মিলছে না। পরস্পরকে চাইছে। চেয়ে, পেয়ে দেখছে এ চাইনি। ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে! কেউ বলছে ও বড্ড চুপচাপ। কেউ বলছে ও বড্ড বকবক করে, কারও নালিশ অপর পক্ষ শীতল, কারও নালিশ ও পক্ষ বড্ডই গরম, যে রূপ দেখে বিয়ে সে রূপই আর কিছু দিন পর ভাল লাগে না, যে গুণ দেখে বিয়ে সেই গুণই কিছু দিন পর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। কেমিস্ট্রি হচ্ছে না, হচ্ছে না। এ কি প্রকৃতিরই নির্দেশ! কঠিন নির্দেশ! এত দিন তোমাদের মিলতে দিয়েছি, এখন থেকে আর দেব না—আলাদা থাকো, একা থাকো, একা ক্রমশ আরও একা হয়ে যাও।

ভোরের হিম বাতাস বইছে উত্তর থেকে। আবার আসছে শীত। কিছুকাল অন্তর অন্তরই এরকম হয়। পালটে যায়, আকাশ-বাতাস, জল, জলের রংচং। এ এক বিস্ময়। এই বিস্ময়ের সঙ্গে আজও মানিয়ে নিতে পারল না অর্যমা। প্রতিটি দিনের আলো-অন্ধকার এক বিস্ময়, নদীতে জোয়ার, ভাটা আরেক বিস্ময়। বিস্ময় চাঁদের ক্ষয়ে যাওয়া, পুবের ওঠা, তারপর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। সূর্য কিন্তু ওরকম করে না। সে সব সময়ে গোল। তার রং বদলায় অবশ্য। কিন্তু বর্তুলতা নষ্ট হয় না। ভেতরে কোনও কালো দাগও নেই চাঁদের মতো। অর্যমা যোদ্ধা নয়, তাই গোষ্ঠীতে তার তেমন কদর নেই। তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে যে মাতঙ্গী, সিংহ এদের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়নি বি-গোষ্ঠীর আক্রমণে— এটাই তার কাছে অনেক। সে দেখতে পাবে—এই সব দেখতে পাবে আরও অনেক দিন ধরে। সিংহরাও দেখছে নিশ্চয়। কিন্তু তাদের তো কেউ দেখতে পায় না। তারা কী ভাবে দেখে কে জানে! দেহহীন হয়ে দেখে কি? সে রাত্রে অর্যমা বনের অনেক গভীরে যে নিভৃত কুটির তৈরি করেছে, সেখানে বসে মাটিতে আঁচড় কাটছিল। অনেককাল ধরে সে এই আঁচড় কাটছে, ঠিক কত চাঁদ কত সূর্য পরে এই হিম আসে, তারপর দাহ আসে, তারপর আকাশ থেকে জল নামে এই সব হিসেব, গুলিয়ে গুলিয়ে যায়, গণনা সমান হয় না, কেন কে জানে? সে বোঝে তার থেকে অনেক অনেক শক্তিশালী এরা, নিজেদের ইচ্ছামতো নিজেদের চালনা করবে, কিন্তু তার ভেতর কিছু নিয়ম আছেই আছে। সেই নিয়ম তার কাছে এখনও অধরা, যদিও কাছাকাছি একটা হিসেব সে করতে পারে। মাতঙ্গী বলত—বাতাস গায়ে ঠেকলে, আকাশ দেখলেই তো এই বদল চোখে পড়ে, তার জন্য মাটিতে আঁক কাটতে হবে কেন! বুদ্ধু একটা! হয়তো ঠিকই। কিন্তু অর্যমার এটা নেশা। সে চাঁদের আকাশভ্রমণ দেখছে বসে বসে। অন্ধকারে গাছগুলি দুলছে চুপচাপ। হাওয়া নেই। চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে এসে পড়েছে গাছগুলির মাথায়। তার

ইন্দ্রিয় বলে একটা কিছু ঘটছে। কিছু একটা! সে বেরিয়ে এল, তার গায়েও পড়ল চাঁদের আলো। কেমন শিউরে উঠল সে। চাঁদ তাকে কী বলছে, কী বলছে! সে বুঝতে পারছে না, কী যেন তাকে একটু দোলা দিল। বুঝতে পারছে না কেন? হঠাৎ তার মনে হল—কেউ এসেছে, খুব কাছে দাঁড়িয়েছে, তার নিশ্বাসের চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে, চকিতে সে কুটিরে ঢুকে গেল। বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। কোনও জন্তু, এক্ষুনি পেছন থেকে তার টুঁটি টিপে ধরত। নিজেকে কেন্দ্র করেই সে কয়েক প্যাক ঘুরে গেল, কেউ নেই। কিন্তু বোধটা যাচ্ছে না, কেউ আছে! কে আছে! কে! সহসা সে বুঝতে পারে—এ মাতঙ্গীর ভারী দেহের প্রভাব। বিদেহী মাতঙ্গী এসে দাঁড়িয়েছে কাছেই। দেখছে, তার পুত্র অর্যমার মতোই দেখছে এই চন্দ্রালোকিত রাত! শুনছে এই নিস্তব্ধ বনভূমিতে পশুদের চরার শব্দ, গর্জন। পাখি পোকা সাপ এদের সবার চলা ফেরা ওড়া বসার অস্ফুট শব্দগুলি—সব একটার থেকে একটা আলাদা। মনে সাহস এনে সে চেঁচিয়ে উঠল—মাতঙ্গী! কী চাও! তোমার কি আর কিছু প্রয়োজন হয়! খাদ্য, বাকল, জল, কিছু! কিছু! একটা গভীর নিশ্বাস ভেসে এল কোন সুদূর থেকে। মাতঙ্গী বলতে পারে না। কিন্তু সে চায়। তার হাত পুড়ে গেছে তাই ধরতে পারে না। পা পুড়ে গেছে, তাই চলতে পারে না। তাই চলতে... এই তো এখানে চলে এসেছে তো! কী করে এল? অনেকক্ষণ ভাবে অর্যমা, এই বাতাসে মিশে রয়েছে মাতঙ্গী। বাতাস চালালে চলে। নইলে চলে না।

হরিণ মাংসর একটা পিণ্ড তার খাওয়ার জন্য ছিল, আর ফল। সে সেগুলিকে আধাআধি করল। তারপর পাতায় করে বাইরে রেখে দিল। বলল—মাতঙ্গী, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে। জন্ম দিয়েছ বলে আমি এই জীবন, এই পৃথিবী উপভোগ করতে পাচ্ছি। তুমি আমার অর্ঘ্য নাও, যদি তোমার খাওয়ার ক্ষমতা থাকে তো খাও। না থাকলেও তুমি তৃপ্ত হও। কম্পিত দেহে সে কিছুক্ষণ অর্ঘ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু ঘটে না। তার সামনে বিদেহী মাতঙ্গী কিছু করতে পারবে না। সে কুটিরের ভেতরে চলে যায়। ছিদ্রপথ দিয়ে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে

একটি শিয়াল এসে মাংসখণ্ডটি মুখে করে ছুটে পালায়। তবে কি মাতঙ্গী শিয়ালের দেহে প্রবেশ করেছে? নাকি মাতঙ্গী নেই, ওটা নেহাতই শিয়াল। মাংসখণ্ড দেখে স্বভাবমতো মুখে তুলে নিয়েছে। সারারাত অর্যমা ভাবল আর ভাবল আর ভাবল। শিয়াল না মাতঙ্গী? মাতঙ্গী না শিয়াল? ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেছে কখন। কখন ভোর রাতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সে জানে না, জানে একমাত্র সাক্ষী গাছপালাগুলি।

খড়মড় খড়মড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। এক বোঝা গাছপাতা হাতে একটি মূর্তি। সর্বশ্বেত। চুল, ভ্রূ, শ্মশ্রু— সব শ্বেত। চোখ দুটি পিঙ্গল। কীরকম যেন দৃষ্টি, যেন অনেক দূরের দিকে দেখছে। অনেক দূর অবধি দেখতে পাচ্ছে।

অর্যমা হাঁটু গেড়ে বসল—ভগ, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, আমার কৃতজ্ঞতা নাও।

উত্তরে ভগ বলল—এগুলি কী?—সে মাটির ওপর দাগগুলির দিকে আঙুল দেখাল।

—এসব অঙ্ক কীসের? অঙ্কিত করেছ? কী? চিত্র তো নয়?

অর্যমার ভাষায় কুলোয় না, সে ভয়ে ভয়ে বলে— এই হিম, এই দাহ, এই বৃষ্টি, ঘুরে ঘুরে আসে। কত চাঁদ, কত সূর্য পর—হিসাব করি।

—কী ভাবে?

—এক শীত থেকে আরেক শীত ছোট ছোট দাগ কেটে যাই। তারপর সেগুলির পাশে—একটি নতুন বড় দাগ বসাই। আবার ছোট ছোট দাগ বসাতে থাকি। আগের জায়গায় আবার শীত ঘুরে আসে দেখি দাগগুলি মিলল কি না!

—মেলে? ভগ আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

—মেলে না। একটু এদিক ওদিক হয়। তবে মোটামুটি মেলে।

—তুমি গণনা করো, প্রকৃতি বোঝো, তুমি মহান অর্যমা।

অর্যমা সসম্ভ্রমে বলল—তুমিই প্রকৃত মহান। তুমি আঘাত সারাও। প্রাণ ফিরিয়ে দাও।

—চেষ্টা করি অর্যমা। এই সব অরণ্যের বহু বহু গাছপালা, লতাপাতা,

বাকল শেকড়ের বন্ধুত্ব আছে মানুষের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে। আমি সেই বন্ধুত্বটুকু কাজে লাগিয়ে চলেছি। কিন্তু হায় একবার দেহ স্তব্ধ হয়ে গেলে, বুকের ধুকধুকি চুপ হয়ে গেলে দেহটি কেন শক্ত, পাণ্ডুর, দুর্গন্ধ হয়ে যায় বুঝি না। এই মৃত্যু থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারি না।

—মৃত্যু হলে শরীর বাতাসে মেশে ভগ, তখন বাতাসে মিশে দেহহীন ঘুরে বেড়ায় মৃতরা।

—সে কী? তোমার অনুমান সুন্দর। কিন্তু কেন এ কথা মনে হল তোমার?

—আমি মাতঙ্গীকে অনুভব করেছি...কাল। মাতঙ্গী এসেছিল। মাতঙ্গী তার সন্তানদের ভালবাসে, তাই এসেছিল।

—মাতঙ্গী? তোমাদের নেত্রী?

—হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ভগ, তারপর বলল—তুমি ঠিক জানো!

—হ্যাঁ ভগ, আমি তার ক্ষুৎপিপাসা বুঝে তাকে মাংস দিয়েছিলাম।

—তারপর? —ভগর স্বরে চাপা উত্তেজনা।

—একটি শেয়াল হয়ে সে এসে নিয়ে গেল।

—শিয়ালই নয়? শিয়ালের মধ্যে মাতঙ্গী? কী করে নিশ্চিত হচ্ছ!

—আমি অনুভব করেছি। স্পষ্ট অনুভব করেছি।

ভগ উঠে দাঁড়াল। বলল— চলো অর্যমা, এই কথা আমাদের পাড়ায় গিয়ে বলো। মৃতরা শান্তি না পেলে জীবিতরা শান্তি পাবে না। আমাদের কিছু করা উচিত।

অতঃপর তারা দুজনে যায়। পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে,

—শোনো মাতঙ্গী ও মধুরার মিলিত দল— আজ আমরা একটি নতুন কথা জেনেছি। মৃতরা যায় না। মৃতরা বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। তাদের দীর্ঘশ্বাস আমাদের জীবিতদের কাছে কিছু প্রার্থনা করে। এখনও সদ্যোমৃতদের ক্ষুৎপিপাসা যায়নি। তা মেটাও। আমাদের সমবেত হয়ে তা মেটাতে হবে।

—নইলে? —নিমেষ উদ্ধত ভঙ্গিতে ধানের শিষ দাঁতে কাটছে।

ভগ হাসল— কীসে কী হয়, তার কতটুকু আমরা জানি নিমেষ! যে কোনও অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত থাকো। হতে পারে সিংহ, তরক্ষু, বরাহ ও ভালুকের দল আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। হতে পারে ঝঞ্ঝা প্রবল হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব। হতে পারে বিষফল খেয়ে আমাদের শিশুগুলি মারা গেল। হতে পারে আর কোনও গোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর, আমরা যেমন ঝাঁপিয়েছিলাম মাতঙ্গীদের ওপর। এবং এ-ও হতে পারে নিমেষ, তুমি, মধুরা ও অন্যান্য বীর তাদের প্রতিহত করতে পারলে না।

—এই সব, শুধু মাতঙ্গীদের জন্যই হবে? —নিমেষ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করে।

—হতে পারে।

—কী মধুরা? তুমি এ কথা মানো?

মধুরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এক প্রবল শীতার্ত হাওয়া ধেয়ে এল। ক্রমে জোরালো হতে লাগল ঝড়, গাছগুলি বিপজ্জনক ভাবে দুলতে থাকল, পাখিদের আর্তনাদে ভরে উঠল বনস্থল! ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল উড়ন্ত পাখিরা। এবং ... এবং ভূ প্রকম্পিত হতে লাগল। চতুর্দিকে ছিটকে পড়ল মানুষগুলি। পাতার কুটিরগুলো উড়ে কোন দিগ্‌বিদিকে চলে গেল, গর্ত থেকে বেরিয়ে সাপেরা মৃতপ্রায় হয়ে শুয়ে পড়ল। আছড়ে পড়তে লাগল বড় বড় গাছ। ভূমি জায়গায় জায়গায় ফেটে গেল। তার মধ্যে কারও পা, কারও কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে ফাটল জুড়ে গেলে আর বেরোতে পারল না তারা। আর্তনাদ করতে করতে অঙ্গহীন হয়ে বেরিয়ে এল কেউ কেউ— অন্যান্যরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এরই মধ্যেই অশ্বগুলি তাদের বাঁধন ছিঁড়ে বিকট চিৎকার করতে করতে নদী পেরিয়ে ছুটতে লাগল। ভূ-কম্পনে বেশির ভাগই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল। অন্যরা উধাও। একই দশা অন্য পোষ্য পশুগুলির।

পৃথিবীর, বনের, বন্যজন্তুদের, মানুষের মূর্ছা যখন ভাঙল, ভস্ম রঙের আকাশে তখন কোথাও আর কোনও রং নেই। বন্যার জল প্লাবিত

করেছে চারিদিক। সহসা ছোট নদীটি যেন মত্তমাতঙ্গী হয়ে গেছে। সগর্জন ভীমদেহ নিয়ে বইছে। বিধ্বস্ত গ্রাম। কোনও কুটির নেই, ধান্য নেই, শস্যক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে গেছে। বন্যার জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। একটি সাপ জড়িয়ে ছিল নিমেষকে। সে নড়াচড়া করতে সাপটি সড়সড় করে চলে গেল। মধুরা একটি ভালুকের পিঠে শুয়ে ছিল, ভালুকটি হঠাৎ তাকে পিঠ ঝেড়ে ফেলে দিতে তার মূর্ছা ভাঙে। মধুরাদের দলের অধিকাংশই মৃত কিংবা আহত। নিমেষ, মধুরা— কেউই সুস্থ নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অপ্রভাবিত আছে কেবল তিনজন। অর্যমা, ভগ ও রঙ্কা।

বিধ্বস্ত শ্মশানে শুধু শুশ্রূষা চলে, ভগ নির্দেশ দেয় অর্যমা, রঙ্কা ওষধি তৈরি করে, শম, অলম্বুষ আদি সেগুলি যথাসাধ্য মাখায়, খাওয়ায়, উন্মুক্ত বনে তুষার বায়ুর তলায় ঠাণ্ডায় জমে যায়, মরে যায় কেউ কেউ, দ্রুত কুটির তৈরি শুরু হয়। মৃত পশুদের ছালগুলি খুলে, পরিষ্কার করে কাঁচা অবস্থাতেই গায়ে দিয়ে হি হি করে কাঁপতে থাকে সব। এবং শুশ্রূষা চলতে থাকে, চলতে থাকে।

গণনা করে অর্যমা— এক পূর্ণ চাঁদ থেকে আর এক পূর্ণ চাঁদ চলে যায় কুটির তৈরি করতে। পশু মেরে খাদ্য তৈরি করে, ছালটি রোদে শুকিয়ে পিটিয়ে পরিধানযোগ্য করে নিতে। কেউ চাঁদ প্রথমবার অদৃশ্য হতে হতেই উঠে বসে, কারও আরও সময় লাগে, উঠে বসে নিমেষ, তার মাথার জটাগুলি ছুরি দিয়ে কেটে দেয় রঙ্কা। উঠে বসে মধুরা, তারও জটাবদ্ধ কেশ কাটা যায়। মাঝে মাঝে চিরে চিরে ওষধি লেপে দেওয়া হয়। আবার বনের ফল, কন্দমূল সংগ্রহ করতে যেতে হয় কাউকে কাউকে। কেউ কেউ শিকারে যায়। ধান্যক্ষেত্রে জল থইথই করে।

অবশেষে একদিন যখন সব মোটামুটি গোছগাছ হয়ে গেছে— নিমেষের বল, মধুরার বল ফিরে এসেছে, তাদের জন্য কন্দমুল পাতায় করে এনে রঙ্কা দু হাত কোমরে রেখে দাঁড়ায়, বলে— হল তো? হল?

তার উজ্জ্বল শানানো চোখে চোখ রাখতে পারে না নিমেষ। মধুরা, অন্য দিকে তাকিয়ে বলে— কী হল?

—মাতঙ্গী সিংহ অদ্রিরা কাতর ছিল। তাদের প্রাপ্য দাওনি, তাই ...

—মৃতরা কি এই ভাবে প্রতিশোধ নেয়, রক্ষা?

অর্যমা মৃদুস্বরে বলে— প্রতিশোধ নয়, বুভুক্ষা। তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে হয়। ভগ মাথা নাড়ে। বলে— সেবার যখন আমাদের গোষ্ঠী নেত্রী সুজলা স্তব্ধ হয়ে গেল, আমরা তাকে জলে দিয়ে স্তব্ধ ভাবে বসে ছিলাম। আমাদের ভাল লাগছিল না, শোক জাগছিল। সুজলা বর্ণার গর্ভধারিণী, মধুরা বর্ণার কন্যা, সুজলার সঙ্গে বর্ণার রেষারেষি ছিল। তবু মধুরাও আর্ত হয়েছিল, কেননা সুজলা কোনও দিন অসম বণ্টন করেনি। তার সংগ্রহ সে কখনও সঞ্চয় করে কোনও প্রিয়পাত্রকে দিত না। সেই যে শোক, সেও আমাদের স্মরণ, দান। কিন্তু এই মাতঙ্গীর দল, এদের আমরা হত্যা করেছি। এদের যা কিছু ছিল, কেড়ে নিয়েছি। যথাযথ সৎকার করিনি।

—সৎকার? —ভগ নিজেই শব্দটি উচ্চারণ করে, নতুন একটি শব্দ। আশ্চর্য হয়ে থাকে। বিনম্র ভাবে বলে— সৎকার। সৎকার চাই।

সুতরাং ভারে ভারে পাতায় করে ফল আসে, মাংস আসে। সিদ্ধ ধান্য আসে। মাটির তালের মধ্যে গর্ত করে রোদে শুকিয়ে পাত্র হয়, তাতে ভরা হয় জল এবং আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে আওয়াজ ওঠে।

হে কুরঙ্গীর পুত্রী মাতঙ্গী, হে সন্নার পুত্র সিংহ, হে মাতঙ্গীকন্যা অদ্রি, হে মাতঙ্গীপুত্র অম্ব, অদ্রিপুত্র শব, রোমাপুত্র সর্ব ... তোমাদের রোচক মাংস দিচ্ছি, ফল দিচ্ছি, জল দিচ্ছি— খাও, পান করো, তারপর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও হে ...

পুরোহিত জলধর ভট্টাচার্য মশাই বললেন— কুশের আংটিটি ঠিক করে নিন, খুলে গেছে ভবানীবাবু। আপনি তো অনেকগুলি শ্রাদ্ধ পার হলেন। হ্যাঁ, এবার জলস্পর্শ করে পিণ্ডের ওপর হাত রাখুন, বলুন— বিষ্ণুরোম তৎসৎ অদ্য চৈত্র মাসি কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথৌ কৌশিক গোত্রস্য মন্মাতুর সর্বমঙ্গলা দাস্যা : ... গত তিন পিতৃপিতামহের নাম করেছেন তো, মাতামহ প্রমাতামহদের নামগুলি করুন ... তিন পুরুষ অবধি ... হ্যাঁ,

এবার বলুন অক্ষয় স্বর্গকাম, এতৎ স্বোপকরণামান্নচর্চিত, শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। ... কুশপত্রের দ্বারা আমাদের ওপর জলের অভ্যুক্ষণ মানে ছিটে দিন।

ঠিক দেড়টার সময়ে বুড়োমার কাজ শেষ হল। অধ্যাপক বিদায় আগেই ছোটপুত্র শিবানীপ্রসাদ করে রেখেছেন। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-ভোজনের পাতা পড়েছে। ওদিকেও সর্বসাধারণের জন্য পাতা পড়ছে। বুড়োমা বা কর্তামার নাতি অভিষেক, নাতবউ পূর্ণা ওদিকটা দেখাশোনা করছে।

"বলো শান্তি বলো শান্তি দেহসাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।"

রঞ্জা-সুবীর

পুরনো যা কিছু, আপন যা কিছু মানুষকে কেমন টানে! এই পৃথিবীর রোদ জল মাটি যতটুকু যে আধারে আমার ভাগে পড়েছে, বাসের জন্য, বিচরণের জন্য সেই অপ্রাণ পৃথিবী-প্রকৃতিরই কী ভীষণ টান! সর্বত্রই তো এই একই আকাশ, চন্দ্র সূর্য তারা বিরাজ করছে। অথচ কিছু দিন বেড়াতে গেলে বা প্রবাসে গেলে একেক সময়ে কি মনে হয় না আমার আকাশ, আমার চন্দ্রসূর্য কোথায় গেল? কিছু দিন ভাবা চলে— হ্যাঁ সেই একই চন্দ্রাতপ বটে! কিন্তু তারপরই মনটা আকুল ব্যাকুল করতে থাকে। ঈশার যেমন করে। 'খুব পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে শহর মা, মাধাপুরের দিকে যে নতুন সাইবার-নগর গড়ে উঠছে, সেখানে আমরা এর পরে থাকব— সেখানে থাকলে আর ভারত বলে জায়গাটা মনে হবে না— কিন্তু আমার কলকাতার আকাশ— টালিগঞ্জের, কসবার আকাশের জন্য মন পোড়ে। মনে মনে বলি— এমন করে মন পুড়িয়ো না আকাশ, শুধু আমার চেনা চেহারাটায় মাঝে মাঝে ধরা দাও, বড্ড যেন বিরহযাতনা মা, লোকে সয় কী করে?'

ফ্রায়েড রাইস, মাটন রেজালা, দমপোক্ত, এসব থেকে থেকে খাচ্ছ,

ভাল লাগছে কিন্তু বাড়ির প্রতিদিনকার ডাল-ভাত-মাছের ঝোল তোমায় থাকতে হবে নইলে অতিরসে অতিরসে বিরস নীরস হয়ে যাবে সব কিছু। কিন্তু আশ্চর্য! রঞ্জার না কোনও কান্না জাগে টালিগঞ্জের বাড়ির জন্য, না মন কেমন করে শ্রীকৃষ্ণ লেনের জন্য। যে বাড়িতে ছোটবেলা কেটেছে সেটার প্রতি আকর্ষণ ঠিক কবে হারিয়ে গেছে সে জানে না। খুব সম্ভব যবে থেকে জায়গাটা ঘিঞ্জি হতে শুরু করল, প্রতিবেশীরা বদলে গেল, নিজের একটা বাহির তৈরি হল, আর বাড়িটা চলে যেতে লাগল দাদা-বউদিদের দখলে ... তখন থেকে। বউদিদের সে খুব ভালবাসত, সেটা কোনও কথা নয়, কিন্তু বড়বউদি এল, মায়ের মানে মা বাবার ঘরটা দম্পতিকে ছেড়ে দেওয়া হল। মা রইলেন তার সঙ্গে এক ঘরে। দিদির আর তার একটা ঘর ছিল। দিদির বিয়ে হয়ে যাবার পর ঘরটা তার হয়ে যায়। খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখত সে ঘরটা। মেজবউদির বিয়ে হল, তার ঘরটাই নবদম্পতিকে দেওয়া হল। রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরটায় তার আর মার জায়গা হল। তৃতীয় দাদার বিয়ে হতে হল খুব মুশকিল। সেজদা আর ছোট একটা ঘরে থাকত। রাঙাদা ছাতের ঘরটায় একা একা থাকতে পছন্দ করত। সে ঘরে আরেকজন থাকতে হয়তো পারে কোনওক্রমে। কিন্তু রাঙাদার ধ্যানধারণা, যোগব্যায়াম এসব ছিল। সে একটা বোম ফাটাল। 'একটা বাড়িতে এতগুলো ইউনিট বাস করতে পারে না। ইউরোপীয়দের নিয়মই ভাল। আগে নিজের ঘরের ব্যবস্থা করো, তারপর বিয়ে।' ব্যস সেজদার মুখ অন্ধকার, মা বিব্রত। ছোটর পাতলা একটা খাট পড়ল মা আর তার সেই রান্নাঘর পার্শ্ববর্তী ঘরে। বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানে সেজদা ও রাঙাদা মুখ গোমড়া করে রইল। তারপর মাস তিনেকের মধ্যে রাঙাদা চাকরি নিয়ে চলে গেল ইংল্যান্ড, তার ধ্যানধারণা, যোগাসন সবসুদ্ধু। সেজদাও মুম্বইয়ে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল। এসব যে-সময়ের কথা তখন ফ্ল্যাটের কালচার তৈরিই হয়নি। কোথাও ভাড়া নিলে হয় গোটা বাড়ি, না হয় একটা তলা। সিঁড়ি এবং মূল ফটক একটাই। ক্বচিৎ কোথাও কোনও কোনও বুদ্ধিমান বাড়িওয়ালা তিনটে তলা বা দুটো তলা আলাদা আলাদা করতেন।

বড়দা-বড়বউদি ও মেজদা-মেজবউদির সঙ্গেই সে কাটিয়েছে বেশিদিন। তারপর তার নিজের বিয়ে হয়ে গেল। বাড়ি বিক্রির কথা উঠল। দৃশ্যটা এখনও মনে পড়ে। মায়ের চোখ ছলছল করছে, উঠে গেলেন। বড়দা পেছন-পেছন যাচ্ছে— মা তোমাকে বুঝতে হবে এত বড়, এত পুরনো বাড়ি আর আমরা মেনটেন করতে পারছি না। সব ছাড়িয়ে করতে গেলে একটা নতুন বাড়ি করার ধাক্কা। স্ট্রাকচার ছাড়া কী আছে, বলো।

মা বললেন— বুঝেছি। যা হয় কর। সুতরাং বাড়ি বিক্রি হল। বোনেরা কিছু দাবি করেনি। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হল। রাঙাদা নেবে না, তার ভাগটা বাকি চারজনের মধ্যে পুনর্বণ্টন হয়ে গেল। সে একবার বলেছিল— ওটা মায়ের জন্য রাখলেই তো হয়, —মেজদা বলল— মায়ের তো নিজেরও ভাগ ছিল, সেটাও তো আমাদেরই দিয়ে দিল।

সেকালের মেয়েরা বড় বিষয়বুদ্ধিহীন, বোকা, অভিমানী টাইপ হত। বেদবতীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আমার স্বামীর শ্বশুরের ভিটে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ভীষণ অভিমান, যা খুশি করো গে যাও তোমরা। আমার বাড়িই রইল না। তার ভাগ। নানান জায়গায় চার ভাইয়ের ফ্ল্যাট হল। মায়ের কোনও নিজস্ব আশ্রয় নেই। সব ফ্ল্যাটে মায়ের নিজস্ব একটা ঘরও নেই। বড়দার ফ্ল্যাট এই বরানগরে বলে একটু কম দামের মধ্যে চার ঘরের ফ্ল্যাট পেয়েছে। মেজর বাড়িতে গেলে রুমকির অর্থাৎ নাতনির সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয়। ছোটর বাড়ি গেলে ভীষণ মুশকিল। সে বালিগঞ্জ গার্ডনস্-এ ফ্ল্যাট কিনেছে। তিন ঘরের ফ্ল্যাট। শোবার ঘর নয়। মোট ঘরই তিনটে। একটি অর্থাৎ বৈঠকখানা। মা গেলে ছেলে টুপুকে বৈঠকখানায় থাকতে হয়। টুপু আর কত দিন বিয়ে না করে থাকবে? বিয়ে হয়ে গেলেই ও বাড়ি থেকে মায়ের পাট উঠল। সেই পৈতৃক বাড়ি শ্রীকৃষ্ণ লেনের, কবেই মন থেকে হারিয়ে গেছে। ওখানে বেশির ভাগই ছিল ভাড়াবাড়ি। যতবার ভাড়াটে বদল হত, আরও খারাপ, আরও খারাপ প্রতিবেশী আসত। ছেলে-ছোকরাদের দল প্রতিবার আরও বেশি বেশি চাঁদা চাইত। রঞ্জার একটা বিতৃষ্ণাই এসে

গেছে বাড়িটার প্রতি। কে জানে মায়ের কত সুখস্মৃতি ওখানে জমা আছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাড়ির প্রসঙ্গ উঠলেই এখনও মায়ের মুখে আলো ফোটে। তারপর চোখ ছলছল করে।

সক্কালবেলা ঘুম ভাঙতেই সুবীর বলল— জানো, বাবাকে স্বপ্ন দেখলুম, আমাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে, চটি ফটফট করে দোতলায় উঠছেন। কী মানে বলো তো এর?

—কী আবার মানে? তোমার কত বয়স পর্যন্ত ও বাড়িতে কেটেছে তোমার বাবা, মনে পড়বে না?

—মনে পড়ুক না, এমনিই মনে পড়ুক। স্বপ্নে কেন?

—তা তো বলতে পারব না। মনে মনে সে বলল— পিতৃপুরুষরা পূর্বমাতারা এমনি করে আমাদের অক্লান্ত অনুসরণ করে যান বোধহয়।

দাদারা কী? মা-ও দিয়ে দিলেন, ওরাও নিয়ে নিল! যদি বা নিল প্রত্যেকের একটা করে ঘর মায়ের জন্য রাখা উচিত ছিল। একটা জমা টাকা, যার সুদ মা একা ভোগ করত! বাড়ি বিক্রির টাকায় তো সবটা কুলোত না, কুলোয়ওনি, প্রত্যেককেই নিজের পকেট থেকে কিছু খরচ করতে হয়েছে। সে কথা ঠিক। তবু ... তবু ... তবু! আসলে মেয়েদের কোনও নিজের জায়গা নেই। না বাপের বাড়ি। না শ্বশুরবাড়ি। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কার বাড়ি। আর স্বামী কিনলে তো সেটা স্বামীরই বাড়ি হয়। বাড়ি যাচ্ছি— বলে বটে, মনে মনেও ভাবে সে। ঠিক। সাজসজ্জা ব্যবস্থাপনা সবই তার। কিন্তু আজ যদি দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়! তাকেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। সুবীরকে নয়। এইটে কঠিন সত্য। যদিও এ বাড়ির প্রত্যেকটি ফার্নিচার তারই কেনা।

যা ব্বাবা, এসব সে কেন ভাবছে! এই বয়সে ছাড়াছাড়ির কথা কেন?

ভাবতে ভাবতে তার মনে হল— কোনও কারণে কোনও ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি হলেই সুবীর কথাটা বলে— আমার বাড়ি। আমার বাড়ি! ভুলেও 'আমাদের বাড়ি' বলে না। ওই। কঠিন সত্য। লক্ষ লক্ষ মেয়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে আছে, কোনটা কার নিজের জায়গা— বুঝতে পারছে না। সেজমামি যে সেজমামি— সাত ভাই চম্পার এক বোন পারুল—

সেই সেজমামির তো বাপের বাড়ি যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেছে, শরিকি ভাগাভাগির ফলে। সেজমামি বলেন— ভাগাড় ভাগাড়, শকুন ঘুরছে, ওখানে কোনও মানুষ যায়! কিন্তু বাগবাজারের বাড়ি যথেষ্ট বড় হলেও নাতিদের বিয়ের পর বিধবাদের এক ঘরে ঠাঁই হয়েছে। সেজমামি আর কনেমামি। একই জিনিস ঘটে চলেছে।

কী সব উলটো-পালটা অর্থহীন কথা ভাবছে সে! মানুষ বেড়ে যাচ্ছে, প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে। নতুন মানুষকে তো জায়গা দিতেই হবে! পুরনো মানুষকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। এই তো সোজা হিসেব। এত দিন বেঁচেও বুড়োমাকে জায়গা ছাড়ার কষ্ট সইতে হয়নি। তিনি বাগবাজারের বাড়িতে অবিসংবাদী মাতৃতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সবাই তো বুড়োমা নন। বুড়োমার মেয়ে বেদবতী জায়গা ছাড়তে ছাড়তে এক কোণে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর মেয়ে রঞ্জা কিছু ভাল ডিগ্রি পেয়েছিল, অনেক খাটাখাটুনি করে, তাই তার হাতে নিজস্ব বেশ কিছু টাকা আছে। সে সংসারের আধাআধি দাত্রী। আধাআধির চেয়ে বেশি তো কম নয়। তবু তার এই ফ্ল্যাটকেও কি সেভাবে নিজের বলে সে ভাবতে পারে? আর তার মেয়ে ঈশা। ঈশ্‌শ্‌ কী করল মেয়েটা! নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে ... কী ভীষণ বিপন্ন তারা সবাই। কিন্তু ঈশাই বা কী করবে? তারুণ্যের ধর্ম। তারুণ্য মানুষকে নানা ভাবে বোঝায়, আশ্রয় আছে। পূর্ণ ভালবাসার আশ্রয়। কোনও দিন কেউ কাড়তে পারবে না। ভুলিয়ে, প্রতারণা করে তার ধর্ম পালন করতে প্ররোচনা দেয়। বলে না— এসব তোমার মধ্যে যে হরমোন দিয়েছি, তারই ক্রিয়া। আনন্দ করো, বিশ্বাস করো, লুটে নাও মজা, তারপর আসতে পারে কঠিন দিন। যা স্বতঃসিদ্ধ ভেবেছিলে, দেখবে তা ভঙ্গুর, পরিবর্তমান। প্রতিমার ভেতরের কাঠামোর মতো নির্লজ্জ কুৎসিত মুখ বেরিয়ে পড়বে, জীবনের।

ডক্টর রায়চৌধুরী বললেন— কী হল রঞ্জাবতী! কী এত ভাবছেন? তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না!

ভাবছিলেন? —আশ্চর্য হয়ে যায় রঞ্জা। সে শুনতে পায়নি!

—আপনার ভাবনার কোনও কারণ নেই। মেহেরগড় থেকে এগজিবিটগুলো এলে আমরা মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেব। কথাবার্তা হয়ে গেছে।

—হয়ে গেছে? বাঃ বাঁচালেন। আমাদের পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া ভীষণ রিস্কি! নিজেদের পুথি, নিজেদের মুদ্রার কালেকশন বাঁচাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। সোজা যাবে?

—হ্যাঁ। একেবারে সোজা।

—তা হলে আমরাও নিশ্চিন্তে চন্দ্রকেতুগড় স্টাডি করার সময় পাব। ফিল্ডে ক'দিন লাগবে? —রায়চৌধুরী রঞ্জার উদ্যম দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

—আগে থেকে কী করে বলব? চন্দ্রকেতুগড়ের জিনিসগুলোর রেপ্লিকা কত দূর? ওই নিবারণ বিশ্বাস, একরাম আলি সব এত উদ্যোগী মানুষ। হেল্প করতে এমন করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিবারণবাবু— তাঁর পুরো একটা লেখা খাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। পড়ছি একটু একটু করে— ডায়েরি, নোটস। নিয়ে রেখেছি জিনিসগুলো।

—আরও দিন পনেরো তো লাগবেই।

—তা হলে হতে থাক। আমরা এগোই। কী বলেন?

সোসাইটির ফেলো রায়চৌধুরীর নেতৃত্বেই নতুন একটা প্রজেক্ট হচ্ছে চন্দ্রকেতুগড় নিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক রঞ্জাবতী দত্ত। এই সব কাজে সে ভাল থাকে। রুটিন কাজ, নিত্য-নৈমিত্তিক, বড় একঘেয়ে। বলতে গেলে সোসাইটির রিসার্চ উইংটার ঘুম এঁরা দুজনেই ভাঙিয়েছেন— রায়চৌধুরী আর রঞ্জাবতী।

চন্দ্রকেতুগড়ের রুইনস কলকাতার খুব কাছে। ডালহৌসি থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটারের মতো। তবু যে ওখানে কেন এক্সক্যাভেশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ভগবান জানেন। আর্কিওলজিক্যাল সেন্টারের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হতে পারেননি রায়চৌধুরী। যথেষ্ট লোক নেই, কাগজপত্র দেখতে হবে, কোনও টেকনিক্যাল কি লিগ্যাল অসুবিধে আছে কি না— সে সময় এখন ... সেই '৫৬ '৫৭ সালে আশুতোষ

মিউজিয়াম তেড়েফুঁড়ে কাজ করেছিল। অনেক কিছু বার হয়েছিল তখন। ব্যস। তারপর আশুতোষ মিউজিয়ামও ঘুমিয়ে গেছে, চন্দ্রকেতুগড়ও চলে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। অন্য দেশ হলে একটা টুরিস্ট স্পট হয়ে যেত।

গৌড়-পাণ্ডুয়ায় ছাত্রছাত্রী নিয়ে এরকম কাজ করেছে রঞ্জা অন্তত বছর পনেরো আগে। তারপর কত দিন গড়িয়ে গেল। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে বিব্রত ছিল, সে হিসেবে এশিয়াটিক-এর কাজটা ছিল আদর্শ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ। কিন্তু তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই ছিল সত্যিকারের কাজের জন্য সন্ধান। স্কলার সঙ্গে আছে তিনজন মাত্র। অরবিন্দ, বর্ষা আর নেহা। কিছু দিনের মতো সংসারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। নভেম্বরের মাঝামাঝি কি ডিসেম্বরের গোড়ায় শেষ করা দরকার। কেননা তখন ঈশা আসবে। ঈশা-শায়রী। নামগুলো মনে করলেই বুকের মধ্যে কেমন একটা টান ধরে। টনটন। আরেকজনও ছিল। আজ থাকলে চাকরি টাকরি করত। রঞ্জা ভেবে নাও সে দূর-বিদেশে তাই-ই করছে। আজকাল তো কারওই ছেলেমেয়ে কাছাকাছি থাকছে না। ভাববার অনেক চেষ্টা করেও যুবক বুবুন নয়নপথে আসে না। সেই মাথা-ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল বুবুন, তখনও গোঁফের রেখাটুকুও দেখা দেয়নি। কী করে তাকে যুবক বলে ভাববে!

কাজের কথা শুনে সুবীর বলল— তোমার কি দিন দিন বয়স কমে যাচ্ছে নাকি? বেশ তো ছিলে। ঘাঁটাতে যাও কেন। যত সব ন্যাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় ততই ভাল। শেষ কথাগুলোর উত্তর হয় না, রঞ্জা বলল— আমি তো আর মাটি খুঁড়তে নামছি না। ইন ফ্যাক্ট এক্সক্যাভেশনের কাজই নয়।

কী কাজটার প্রকৃতি, জানবার জন্য সুবীরের কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। রঞ্জা দু-তিন মাস ব্যস্ত থাকবে, বাড়ির দিকে মন দিতে পারবে না— এটাই তার মাথাব্যথা।

বলল— হ্যাঁ তারপর অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার নাভিশ্বাস। ছোটাছুটি তো খুব! হাসনাবাদের কাছে না জায়গাটা?

—দেগঙ্গা। প্রতিদিন যাওয়া আসা করা যাবে না। মাঝেমধ্যে থাকতে হতে পারে। সেসব ব্যবস্থা ডক্টর রায়চৌধুরী করবেন।

—সর্বনাশ। উনিও থাকবেন নাকি?

—থাকতে পারেন। কিন্তু সর্বনাশ কেন?

—সর্বনাশ মানে সর্বনাশ এই আর কী!

—এই বয়সে এসব ছেঁদো জেলাসি আর মানায় না সুবীর। উনি মানী লোক।

—এই বয়সেও তোমার যা জোশ, মানীগুণী ওসবে কিছু হয় না। আমি মাঝখান থেকে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

—বাজে কথা বোলো না। কোথায় আবার বুড়ো!

—আবার একটা বিয়ে করা যায় বলছ!

রঞ্জা এবার আর্ম-চেয়ারে বসা খবরের কাগজ পাঠরত সুবীরের দিকে অপাঙ্গে তাকাল। দর্শনের অধ্যাপক, অবসর নিয়েছে একটু আগে। এখনও এসব কথা মনে আসে? একবার অনেক কষ্টে ফিরিয়ে এনেছে। আবারও সেসব ভয় আছে নাকি? আগে-আগে অবসর নিল যে বইটা লিখবে বলে সেটা তো কই এগোচ্ছে না! সে আজকাল জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিয়েছে।

সুবীর অবশ্য তার স্খলন-পতনের কথা অম্লানবদনে অস্বীকার করে যায়। সে সাধুসন্ত লোক। রত্না-অধ্যায় তাদের জীবনে বন্ধ অধ্যায়। নামটা উচ্চারণ করলেও খেপে যায় এখন। সবটাই নাকি রঞ্জার ঈর্ষার কল্পনা।

দাদা-দিদি-মা সবাইকার অমতে এই বিয়ে। দাদাদের কাছে ওকে প্লেবয়-প্লেবয় লাগত। এত খামখেয়ালি, রেলওয়েজ-এ কাজ পেয়েছিল, কত উন্নতির আশা, দুম করে ছেড়ে দিয়ে অধ্যাপনায় চলে এল। টাকার তফাত আকাশ-পাতাল। তবু। মানটা যে বেশি! রঞ্জা স্কলার হিসেবে যে সুনাম, কদর পাচ্ছে, তাকেও সেটাই পেতে হবে। সবাই বলত— এর দায়িত্বজ্ঞান বলে কিছু নেই রঞ্জা। কষ্ট পাবি। কথাটা ঠিক রঞ্জা জানত। কিন্তু ভালবাসার আগুন যে দুঃসহ। দায়িত্বজ্ঞান? তার অভাব পুষিয়ে দিতে সে তো রয়েছে। শতকরা শতভাগ দায়বদ্ধতা।

তখন তার মধ্য-ত্রিশ। কয়েকটা হিস্ট্রি-কংগ্রেসে পরপর তার পেপার খুব সুনাম পাওয়ায় পণ্ডিতদের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছে সে। বিদেশে ভাল ভাল অফার পাচ্ছে। সেগুলো নেওয়ার অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না। যদিও সুবীর সে কথা মানতে নারাজ। তার চিরকালের ধারণা রঞ্জা ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সংসার, স্বামী, ছেলে-মেয়ে এসবের চেয়ে কেরিয়ার তার কাছে অনেক বড়। চারদিকে এর উলটো প্রমাণ ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝেই তুমুল কাণ্ড করত।

সুবীর তখন প্রচুর কোচিংও করত। রত্না নামে ছাত্রীটির ওপর তার দুর্বলতা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে ঠিকই বুঝেছিল রঞ্জা। সে ফিরছে। নিঝুম সন্ধ্যায়। ছেলেমেয়ে ওপরে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে সে ঢুকে যাচ্ছে, বাইরের ঘরে পড়াচ্ছে সুবীর, রত্না তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দিনের পর দিন। রত্নাকে তার বিষ লাগতে থাকল। কিন্তু শুধুই রত্নাকে। সুবীর তখনও তার খুব আপনজন। তারপর চোখে পড়ল, সুবীরের যেন কী হয়েছে, উড়ু-উড়ু অস্থির-অস্থির ভাব। কিছুতে যেন মন নেই।

—মায়ের ওষুধটা এনেছ?

—কোনটা?

—ওই যে প্রেশারের!

—নাঃ ভুলে গেছি। তুমি কাল ফেরবার পথে নিয়ে এসো না।

—বাঃ। বাড়িতে ফোন। প্রোফেসর সুবীর দত্ত আছেন?

—না তো। কলেজ গেছেন।

—কলেজ থেকেই ফোন করছি। তিন দিন হল আসছেন না।

কামাই করল, অথচ কোথায় গেল তার হিসেব পাওয়া গেল না। সে নাকি টেক্সট বুক লিখছে, বি.এ-র। তাই লাইব্রেরি গিয়েছিল। ন্যাশনাল।

—তোমার কী হয়েছে সুবীর?

—আমার? কী হবে? কেন?

—না, তোমাকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে কিছু দিন।

—কল্পনা করো। সে ক্ষমতাটা তো তোমার ভালই আছে। হিস্টরিক্যাল ইম্যাজিনেশন। কোথায় যেন যাচ্ছ? কলাম্বিয়া?

—আমি কলাম্বিয়া নামিবিয়া কোথাও যাচ্ছি না, আমার ছেলে-মেয়ে-স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ফেলে। সে গুড়ে বালি।

—মানে?

—আমি গেলে তোমার খুব সুবিধে হয় মনে হচ্ছে! কল্পনা করতেও কিছু কারণ লাগে। ইতিহাসেও লাগে।

—বাজে কথা বোলো না।

—ছাত্রী পড়ানো তুমি ছেড়ে দাও সুবীর, ইটস মাই ডিমান্ড।

—মানে? অতগুলো টাকা!

—ছাত্ররাও সেই একই টাকা দেবে।

—আমি যদি বাইরে পড়াই তুমি টের পাবে? —বিরক্ত হয়ে বলল সুবীর। চোখ কিন্তু অন্য দিকে।

—দেখব না শুনব না। তুমি মিথ্যে বলবে, কিন্তু টের ঠিকই পাব। যেটাকে তুমি কল্পনা বলছ সেটা আসলে ইনটুইশন। অনেক কষ্ট করে, অনেকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছি সুবীর। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে, কিছু ভাঙতে আমি দেব না।

চোখ ভরে আসছে, প্রাণপণে তাকে আটকে লড়ে যাচ্ছে রঞ্জা, ডিগনিটির লড়াই।

—আশ্চর্য! ভাঙা-টাঙা। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

—যেতে পারি, তুমি যদি অন্যায় করো।

তারপরই হল রঞ্জার জীবনের প্রথম ভয়ানক অসুখ। নার্ভাস ব্রেক-ডাউন। সে বেরোতে পারে না, কিছু করতে পারে না, পাগলিনির মতো চোখে চেয়ে থাকে, কিংবা চোখ বুজে এমন ভাবে শুয়ে থাকে যেন বা মৃত মানুষ। কারও দিকে তাকায় না, খায় না, খেলে বমি হয়ে যায়।

কেউ জানে না। একমাত্র ডাক্তার জানেন। অর্ধোন্মাদের মতো প্রলাপ বকেছে সে তাঁরই কাছে। বর্ষার ছাতে গিয়ে শ্যাওলার ওপর শুয়ে থাকে সে। যেন জলের জীব জলের কাছে জলজ উদ্ভিদের কাছে আশ্রয় খুঁজছে। মাটির তলায়, সেখানে বিশ্বাসঘাতকের হাত, হতাশার হাত পৌঁছোয় না।

ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বললেন, কী করছেন মা। আপনি এত হৃদয়হীন! এত নির্বোধ। এত বড় জীবন, স্বামী তার কতটুকু! ছেলেমেয়ে! তাদের দিকে চেয়ে দেখুন। জীবনের ওপর আপনার মুঠি আলগা হলে ওরা যে ভেসে যাবে, ভেসে যাচ্ছে।

শ্বশুর শাশুড়ি, যাঁরা বলতেন রঞ্জা তিনটে ব্যাটাছেলের ক্ষমতা রাখে, তাঁরা অবস্থা দেখে হতভম্ব।

—সবই যে বমি হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার। আলসার, না কী?

—নাঃ। এসব সাইকো-সোম্যাটিক।

—সাইকো ... সো... ম্যাটিক। বিমূঢ় শ্বশুর জিজ্ঞেস করছেন ডাক্তারকে।

—তার মানে মনের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল, কোনও কষ্ট? দুশ্চিন্তা! কেন? কী? ডাক্তার চুপ।

বাবা ডেকে পাঠালেন ছেলেকে— সুবীর! বউমার সাইকো-সোম্যাটিক হয় কেন!

—রোগভোগের কারণ আমি কী করে জানব বাবা! সুবীরের মুখ শুকিয়ে গেছে। কাঠগড়ায় আসামির মতো লাগছে।

—আমি জানি না বউমা কীসে এত কষ্ট পেল যে খেতে পারছে না, শুতে পারছে না। কিন্তু সে তোমার স্ত্রী— তোমার জানা উচিত। যাও, জেনে নাও।

শাশুড়ি বললেন— রঞ্জা অকেজো হয়ে রয়েছে। আমার সংসারও অচল। ছেলেমেয়ে দুটো এলের দড়ি বেলের দড়ি হয়ে ঘুরছে। রঞ্জা, আমরা সবাই তোমার মুখ চেয়ে আছি মা, তুমি ওঠো।

রঞ্জা বলল— আমার দিকে আর চাইবেন না মা— আমি চাইবার অযোগ্য। আমার কিছু নেই। অস্তিত্বই নেই। যেটাকে রঞ্জা বলে ভাবছেন, সেটা একটা শূন্য ফাঁকা জায়গা।

—সে আবার কী!

—ওরকম হয় মা! কোনও কোনও মানুষ আছে যখন আছে, শত-সহস্র হয়ে আছে। যখন নেই, তখন এক কড়াও নেই।

—আমি তোমার কথা একবর্ণও বুঝতে পারছি না মা। আমি খাইয়ে দিচ্ছি, দুধ-ভাত তুমি ভালবাসো। চামচে করে একটুখানি খেয়ে নাও মা!

সেবার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গ, সেবা, ছেলেমেয়ের নিষ্পাপ করুণ মুখ তাকে টেনে তুলেছিল।

সুবীরের ভূমিকা ছিল এত নিস্তেজ যে ভাবলেও করুণা হয়।

—কী হল রঞ্জা! তুমি এরকম করছ কেন?

—কী জানি! রোগী কি জানে তার রোগের মূল কোথায়! শুধু জানি আমি ডুবে যাচ্ছি। জলে খাবি খাচ্ছি এখন, সাঁতার জানি না।

—শোনো, একটা কথা জেনে রাখো আমার জীবনে কোনও, মানে আর কেউ নেই। তুমি সাধারণ হাসি-ঠাট্টা, ভুল বুঝেছ।

—কী জানি সুবীর আমার মনে হচ্ছে আমি কোনও স্ট্যাচুর তলায় বসে আছি, সন্ধে হয়ে আসছে। তুমি আমায় ফেলে চলে গেছ। কেউ আর কোথাও নেই। পেছনে মস্তানি দুয়ো; দুয়ো দিচ্ছে সমস্ত সংসার, পৃথিবী।

তিন চার মাস লেগে গেল সুস্থ হতে। শেষের দিকটা মা এসে ছিলেন কিছু দিন। তাঁকে প্রথমে কিছুই জানানো হয়নি। ছিলেন বড়মেয়ের কাছে। সুবীর যতবার বলেছে— মাকে ডাকি, মা আসুন, ততবার রঞ্জা বলেছে— ডিসিশন নেবার সময়ে মাকে ডাকিনি সুবীর, আজ কর্মফল ভোগার ভাগ একা আমার। মাকে আর কষ্ট পেতে দেব না।

সুবীরের মুখ ক্রমশ ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কোন রঞ্জা? চকচকে চোখ বিষাদে স্তিমিত। আদর করতে গেলে ছিটকে সরে যায়। ভুলেও তার দিকে তাকায় না। সমানে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে। একদিন আচ্ছন্ন চোখ আধখানা খুলে স্বপ্ন দেখল সামনে মা দাঁড়িয়ে। শুকনো জুঁইফুলের মতো মুখটি। চুলগুলো গুছিয়ে বাঁধা, সরু কালো পাড় শাড়ি, হাতে একগাছি করে চুড়ি, গলায় সরু হার। ছোট ছোট কুঁচি গলার চামড়ায়। পৃথিবীর সুন্দরতম মূর্তি। মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল আরও দুটি শুকনো প্রাণহীন মুখ। ঈশা। বুবুন। ছেলেটা ভয়ে দুঃখে দিদির পেছনে লুকিয়ে আছে। আবছা চোখে রঞ্জা সর্বমঙ্গলাকে খুঁজতে লাগল, তাঁর মা, তাঁর মা?

মাতৃমূর্তির পরম্পরা নেই? ঝাঁকি দিয়ে জ্ঞানে ফিরে এল রঞ্জা। স্বপ্ন নয়, সত্যি। সত্যি মা। তারপর সে একখানা কান্না কাঁদল বটে। মাকে আকুল হয়ে ডেকে কান্না, কান্না, কান্না! মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মাথায়, কিছু বলছেন না। মা বুঝতে পেরেছেন— এই কান্নাটা কাঁদা তার বড্ড জরুরি ছিল।

মা কোনও দিন জানতে চায়নি এ কান্না কেন! কীসের কষ্ট, মা অনুভবে জানেন এমন অনেক কষ্ট আছে যা মাকে বলতেও মুখ বুজে যায়। কিন্তু মাতৃস্পর্শ সেই কষ্টকে শমিত করে।

মায়ের পাশটিতে শুয়ে কী শান্তি। মায়ের পাশে শুয়ে জীবন আরম্ভ। আবার মাঝপর্বে আর কাউকে পাশে চাওয়া। রঞ্জা সেই চাওয়ার অবিমৃশ্যকারিতা, তুচ্ছতা বুঝতে পারত রোজ। সে মাঝখানে, এক দিকে মা, অন্য দিকে বুবুন, আর মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে ঈশা। এই তার চারপাশে জাদুগণ্ডি। তার একান্ত নিজস্ব জগৎ। সেখানে সুবীর নেই। সুবীরের প্রতি সেই আঠালো প্রেমের হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে।

কী ভয়ানক সেই রবার দিয়ে জীবন থেকে কাউকে মুছে দেবার শাস্তি। তারপর আরও ভয়ানক বাকি ছিল। প্রেম ফুরিয়েও ফুরোয় না। ডাক্তারকে না দেখলে সে থাকতে পারে না। তার জাদুগণ্ডির বাইরে থেকে জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার। মিলিটারি কর্নেল, শান্ত, সৌম্য, ওঁদের রিটায়ারমেন্ট তাড়াতাড়ি, ফিরে এসে প্র্যাকটিস করছেন। যখনই ডাকো উনি আছেন, চোখে বরাভয়— দেখলেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়। কী প্রিয় যে হয়ে উঠল সে মুখ তার কাছে! তখন যদি তার পঁয়ত্রিশ হয় তো ডাক্তার পঞ্চান্ন। তাঁকেই তার অবজ্ঞাত প্রেম উৎসর্গ করল রঞ্জা।

—ডক্টর রায়, প্লিজ কাল চেম্বারে যাবার আগে একবারটি দেখে যাবেন।

—কোনও প্রবলেম হয়েছে?

—আসুনই না একবার— গলায় করুণ আর্তি।

এসেছেন। ব্লাড প্রেশার চেক করলেন, কী কী খেয়েছে জিজ্ঞেস

করলেন, নাড়ি দেখলেন। স্পর্শে যেন নতুন প্রাণ, দর্শনে জিজীবিষা।

সেই পঁয়ত্রিশ বছরে রঞ্জা জীবনে সবচেয়ে সুন্দর, সুঠাম, লাবণ্যময়ী ছিল। সবচেয়ে। অথচ তখনই তাকে ছেড়ে গেল প্রেম। এতদিনের তুমুল, সযত্নে লালন করা প্রেম। ডক্টর রায় নাড়ি দেখছেন— তার শিরায় শিরায় স্বর্গসুখ ছড়িয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত যে সে প্রেমের স্বরূপ! সব সময়ে ওঁকে চাই না। খালি দিনে একবার এসে বসবেন। বি.পি. মাপবেন। দুটো কথা বলবেন— আজ কেমন আছেন মা— বাস। মা এবং আপনি। কিছুই এসে যায় না তাতে। লোকে বলে প্লেটনিক লাভ বলে কিছু নেই। কিন্তু সে জানে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে, আছে আছে সব আছে। শরীরপ্রধান প্রেম, যা তার আর সুবীরের, শরীর-বুদ্ধির যৌথ কারবার, যা তার আর সুবীরের, শরীরের ভূমিকা যেখানে অতি অতি নগণ্য, হৃদয়ের ভূমিকা বিশাল— সেই প্রেম তার আর ডক্টর রায়ের। ভুল বলা হল। ডক্টর রায় জানতেনই না। তিনি শুধু এক রোগিণীর একান্ত নির্ভর, আকুলতা দেখেছিলেন। মনের রোগীদের এরকমই হয়।

সুবীরও বলছে— ডঃ রায়, আপনার ওপর ইনজাস্টিস হচ্ছে জানি, তবু যদি রোজ একবার ...।

তার মাথায়ও আসেনি প্রৌঢ় ডক্টর রায়ের প্রতি তার স্ত্রীর কী মনোভাব হতে পারে।

—আমি চেষ্টা করব।

আসতেন। কোনও না কোনও সময়ে একবার। এবং সেই ভিজিটগুলো নিতেন না কিছুতেই। মায়ার চোখে, ভরসার চোখে তাকাতেন। সে মনে মনে বলত— এ ভাবে চাইবেন না ডাক্তার। এতখানি জীবন পেরিয়ে এসে তবে আমি বুঝেছি প্রেম কী, আর প্রেম কী নয়। কোনটা প্রকৃতির দান, আর কোনটা প্রকৃতিকে মানুষের ছাড়িয়ে যাওয়া।

একদিন উনি বললেন—আপনার কিন্তু স্বাধীন হবার সময় হয়েছে মা। প্রতিদিন বি.পি. দেখার আর দরকার নেই। ফিক্সেশন ভাল নয়।

উনি কি বুঝে বলেছিলেন? না, না বুঝে!

সেই থেকে সুবীরের ঈর্ষাকাতর হবার পালা। কেন সেটা সে বোঝে। সুবীরের প্রতি তার আর সেই উদ্দামতা নেই যে! বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ। দীর্ঘ তেরো বছর শ্বশুর শাশুড়ির প্রাথমিক অসন্তোষ জয় করবার জন্য, পরপর বাচ্চা হয়েছে, তাদের দেখভাল, এবং কর্মজীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রাণপণ খেটেছে, সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে ছন্নছাড়া এই দত্ত পরিবার। সে যেমন নিজের সেক্রেটারি। তেমন সুবীরেরও। আনন্দ পেয়েছে জয় করতে পেরে, নিজেকে অকাতরে বিলিয়েছে সুবীরের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের। সেই সুবীর অন্যের প্রতি আসক্ত হল? কখন? যখন তার প্রথম যৌবনের শীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা আর নেই, ত্বকে ঔজ্জ্বল্য, চুলে ঢল, কণ্ঠে মধু, খেলোয়াড় রঞ্জার সাহস ও ব্যক্তিত্ব, প্রেমিকা ও মায়ের মাধুর্য, সফল কর্মীর আত্মবিশ্বাস ও স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধের সংযোগে সে যখন সকলের চোখের মণি। তখন!

এখন তার মনে হয় সুবীর কোনও দিনই তাকে সেভাবে ভালবাসেনি। ওটা প্রথম যৌবনের কারিকুরি। সন্দেহ হয় পুরুষরা আদৌ সেভাবে ভালবাসতে পারে কি না! বোধহয় পারে না। সে ডেপ্‌থ্‌ নেই তাদের। লক্ষে একজন দুজন যদি-বা পারে তারা হয়তো আবার উলটোপালটা সঙ্গিনী পায়। কোটিতে একটি দম্পতি যদি সত্যিকার বস্তুটার সন্ধান পায় তো তারা জানে সে শরীর মন বুদ্ধি হৃদয়বৃত্তির কী অপূর্ব রসায়ন! তারই উদ্দেশে সারাজীবন চেয়ে থাকা। সুবীর মত্ত হয়েছিল মাত্র, বিয়ে দিয়ে সেটাকে আমরণ করে ফেলতে সুবীরের দ্বিধা ছিল। কথায় কথায় সে বলত, আমার বাবা-মায়ের কিন্তু আমি শেষ বয়সের সন্তান; দিদি দাদা অনেক বড়। দাদা ল্যভ ম্যারেজ করেছে। সে প্রায় শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। আমি নিজে বিয়ে করতে চাইছি শুনলে আবার কী সব রি-অ্যাকশন হয় কে জানে! ভাবতেও ভয় পাচ্ছি।

রঞ্জা বোঝেনি এগুলো তাকে প্রস্তুত করা নয়। সূক্ষ্ম একটা দ্বিধার কথা জানানো। সে তা বোঝেনি। বুঝলেও কিছু করার ছিল না। সে তো আপাদমস্তক মগ্ন। সবাইকে রাগিয়ে কাঁদিয়ে রেজিস্ট্রি করা, ছ'মাসের

মতো সব চাপাচুপি দিয়ে রাখা, তারপর বিনম্র ঘোষণা, হতভম্বীকরণ, দুজনেরই চাকরি পাকা, দুই পক্ষই গোমড়া, তারপর উপল-ব্যথিত-গতিতে সংসার যাত্রা শুরু হল।

গড়পড়তা পুরুষের নাকি এক নারীতে ক্লান্তি আসে। মেয়েদেরই কি আসে না? সমাজ বহুযুগ ধরে পুরুষকে ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। সেভাবেই শিক্ষিত করেছে। রাজ-রাজড়া থেকে বস্তিবাসী পর্যন্ত। মেয়েদের সংসার ধরে রাখতে হবে। শিশু পালন করতে হবে। তাদের সংস্কার যাতে একমনস্ক হয় তার জন্য সমাজ কম শাস্তর লেখেনি। নিন্দা-মন্দ, কুৎসিত অপবাদ, চারদিকে গণ্ডিটানা, বিধিনিষেধ,—এবং সতীত্বের মহিমা কীর্তন, সতীদাহ, সতীপূজা, সতীমায়ের মেলা এবং সর্বশেষ চালাকি, দেবীপূজা। তুমি দেবীর অংশ, তোমাকে মর্ত্য মানুষের দুর্বলতা মানায় না।

কী উপকরণ বাহুল্য দেবী পূজার! অথচ জীবনে সেই দেবীদের প্রতিনিধিদের উপকরণ শাঁখা-সিঁদুর আর হাজার এটা কোরো না ওটা কোরো না। চরম অপমান, অবজ্ঞা, দুর্গতি। দিদিমা সর্বমঙ্গলা নাকি জীবনে কখনও একটা গোটা মাছের টুকরো খাননি। এত লোক, লোকের পর লোক, যখন খেতে বসলেন তখন হয়তো আরেকজন অসময়ে এসে গেছে। একাদশী, সধবাকে সেদিন অন্তত মাছ খেতেই হয়। তাই আধখানা অতিথির পাতে গেল।

মানুষ তুমি বড্ড বেশি স্ববিরোধিতা করছ। প্রতি মুহূর্তে দুরকম বিধান চালাচ্ছ। এ হয় না। এর ফল ভবিষ্যতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। একদিন মেয়েরা হাতে ক্ষমতা পাবে, সংরক্ষণ দাও না দাও, শুধুমাত্র ক্ষমতা বুদ্ধি ও মোহিনী শক্তির ত্রিগুণে সমস্ত জয় করে নেবে। তুমি আজ যেখানে আছ পুরুষ, সেখানে নারী বসবে, সে সব সময়ে স্নেহময়ী ক্ষমাশীলা মা হবে না, নির্ভরশীল সহনশীল নিরুপায় স্ত্রী হবে না বা আদেশপালনকারী দাসী, তখন একই ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা যদি একইরকম অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়? যাবার পুরো সম্ভাবনা, কেননা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে ক্ষমতায় থাকার কৃৎ-

কৌশল এইরকমই। বেশি কথা কী, পৃথিবীর যেখানে যেখানে নারী শাসকের ভূমিকায় এসেছে— এই স্বেচ্ছাচারিতার ইতিহাসই ফিরে ফিরে এসেছে। নারী বলেই মাতৃশক্তির শাসন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হল? ক্ষমতার মডেল পুরোপুরি পুরুষের মডেল, তাকেই অনুসরণ করে রানি প্রথম এলিজাবেথ, ক্যাথারিন দ্যা গ্রেট, তাকেই অনুসরণ করে— ইন্দিরা গাঁধী, বেনজির ভুট্টো, জয়ললিতা, মায়াবতী, ব্যতিক্রম নেই। বড় কষ্ট হয় ভাবতে, দেওয়ার ক্ষমতা, বদলাবার ক্ষমতা ভেতরে থাকলেও মেয়েরাও তা ব্যবহার করেন না, পুরুষের কুটিলতা, চক্রান্ত ও অফুরান ক্ষমতা লিপ্সার অস্ত্র হাতে তুলে নেন। বিকল্প কিছু কেন নেই? কেন হয় না?

—শোনো এক কাজ করো। চন্দ্রকেতুগড়ের কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং। তুমিও চলো না। যেদিন যেদিন আমায় থাকতে হবে, তুমিও থাকবে। ইচ্ছে হলে সাইটে যাবে, ইচ্ছে হলে ঘরে বসে লিখবে— লেখার কথাটা অনেক দিন পর উচ্চারণ করল রঞ্জা।

—কেন? তোমার ওপর নজর রাখতে?

—যা বলো।

—দুর, ঠাট্টাও বোঝো না! এক পঞ্চাশোত্তরের ওপর আর এক পঞ্চাশোত্তর নজর রাখবে! হাসালে। —সুবীর হাসল।

সুবীর খুব ভাল করে জানে তার ঈর্ষাটা অহৈতুকী। রঞ্জা আপাদমস্তক আন্তরিকভাবে একমুখী। জীবনে কোনও দিন মিথ্যেও বলেনি। অপর পক্ষে সুবীর তার সিগারেটের সংখ্যা, কোচিং-এর ছাত্রসংখ্যা, কোথাও কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এই সব সামান্য ব্যাপারেও মিথ্যে বলে। রঞ্জা বলে— এই বিপজ্জনক অভ্যাস ছেড়ে দাও। এত ছোটখাটো ব্যাপারে মিথ্যে বললে তোমার সত্য মিথ্যে যে আমার কাছে গুলিয়ে যাবে!

ক্রমশই তাদের কুটিরগুলি শক্ত, আরও শক্ত হচ্ছে। চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা, যাতে অতিরিক্ত বৃষ্টি, হাওয়া, গরম, ঠান্ডা আড়াল করতে পারে। মাটি, মাটিকে অবলম্বন করে তৈরি হচ্ছে মানুষের থাকার ঘর। ওপরে আচ্ছাদন, শুকনো ধানগাছ আঁটি বেঁধে বেঁধে তৈরি করা হচ্ছে। নতুন কত কিছু উদ্ভাবন করছে এ ও সে। যখনই দেখো, মাটি চাপড়ে চাপড়ে, তার ওপর আরও মাটি চাপিয়ে ঘর আর তার দেয়াল রোদ পোহাচ্ছে। ঢালু চাল বেয়ে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির কণা। পরম সন্তোষে জলকণাগুলি হাত পেতে ধারণ করে ছন্দ। সে মোটামুটি বীরপুরুষ, মধুরার দলেও সে বীরপুরুষের প্রাপ্যই পায়। কিন্তু বিজিত বলে তার মর্যাদা কিছু কম ছিল। নিমেষও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করতে পারে, সে-ও পারে। কিন্তু নিমেষের স্থান অনেক উঁচুতে। যেই ধানগাছের আঁটি খড়ের দড়ি দিয়ে বেঁধে বেঁধে সে ঘরের দুদিকে ঢালু ছাতের পরিকল্পনা করল অমনি হঠাৎ তার দাম খুব বেড়ে গেছে। শিশুগুলি মুখে আঙুল পুরে হাঁ করে ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচু দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাতে হাত ঘষে খুশি জানায় মধুরা। না একটুও বৃষ্টি পড়ছে না। ভেতরটি বেশ সুরক্ষিত।

বড় একটি ঘর পেয়েছে ভগ ও অর্যমা। ওরা নিজেরাই বেছে নিয়েছে, কেননা ওদের কাজকারবার অন্যরকম। ভগর তো রাশি রাশি গাছগাছড়া, বড় বড় ভাঁড়ে রাখে সে তৈরি ওষুধ। আর অর্যমা নির্নিমেষ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভবিষ্যদ্‌বাণী করে—দেখে রাখো ভগ, কাল চাঁদ পূর্ণ হবে, ধন্যা ফুলে উঠবে। চাঁদ পূর্ণ কিংবা অদৃশ্য হলেই ধন্যার মধ্যে এরকম পরিবর্তন আসে।

দুজনের প্রতীক্ষা শুরু হয়। আর কাউকে বলে না তারা। সত্যি! একদম ঠিক। একটি শিশু যেদিন জল ফুলবে বুঝতে না পেরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছিল এবং জলের তোড়ে ভেসে গেল, সেই দিনই অর্যমা তার আবিষ্কার জানাল।—'চাঁদ গোল হলে কিংবা অদর্শন হলে, ধন্যা ফুলবে। সাবধান!' সবাই সেই থেকে সাবধান হয়ে গেল। সবাই

অবাক। পূর্ণ চাঁদের দিন ধন্যার তীরে সব সারসার দাঁড়িয়ে আছে, দেখবে।

মধুরা বলল— জাদু! জাদু! অর্যমা জাদু করতে পারে, চাঁদকে ও-ই বশ করেছে।

ভগ বিরক্ত হয়ে বলল—বাজে বোকো না। জাদু যদি কেউ করে থাকে সে স্বয়ং চাঁদ। চাঁদের সঙ্গে নদীর খেলা। অর্যমা সেটি লক্ষ করেছে মাত্র। অর্যমার লক্ষ করা, আরও অনেক ঘটনার কথা ক্রমে জানতে পারে সবাই। সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে— এই মানুষটি বিশেষ, শিকারে যায়—পশুপাখির সম্পর্কে নানা তথ্য জেনে আসে, ক্ষেত্রে কাজ করতে যায়, ধান্যর প্রকৃতি সম্পর্কে নানা কথা জেনে আসে। ক্রমে অর্যমা অন্য গাছও তৈরি করে, ঘাসপাতার রকমসকম লক্ষ করে করে। যেগুলো ওষধির জন্য দরকার, ভগকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলিও কিছু কিছু একটি ক্ষেত্রে উৎপাদন করে সে।

সেদিন এইরকম পূর্ণচন্দ্র। আকাশ, বন আলোয় ভেসে যাচ্ছে। নদীর দিক থেকে খলখল আওয়াজ আসছে। তীরে বসে আছে ভগ। হঠাৎ সামনে আলো আড়াল হয়ে গেল। তারপরই আলো সর্বাঙ্গে মেখে হেসে উঠল রক্কা।

—ভগ তুমি একা? তোমার বন্ধু কোথায় গেল? প্যাগলটা?

ভগ হাসল—তা তো জানি না রক্কা, তবে কাল সারারাত কী যেন গণনা করেছে, কাঠি দিয়ে আঁক কাটছিল। আজ দুপুরেও ভাবিত ছিল, এখন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রক্কা বলল—ভগ, এসো আমরা মিলিত হই।—সে বিনা বাক্যব্যয়ে ভগর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার সাদা বুকের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলল—আমার তোমাকেই সবচেয়ে মনোহর লাগে। ভগ, তোমার মতো এরকম উচ্চ পুরুষ আমি দেখিনি। তোমাদের ওপর আমার খুব রাগ ছিল। কিন্তু তুমি আশ্চর্য। চাঁদের দেবতা স্বয়ং তোমাকে গড়েছেন। তুষারের মতো। চাঁদের বুকের মতো সাদা তুমি। তুমি আমার ঘরে থাকবে চলো ভগ।

রক্কার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ভগর এক অপরিচিত অনুভূতি হচ্ছিল। আজ

পর্যন্ত কোনও নারী তাকে চায়নি। সে অস্বাভাবিক, যখন জন্মেছিল তখন তার মা বর্ণা তাকে জলে ভাসিয়ে দিতে গিয়েছিল, অন্যরা বর্ণাকে বারণ করে। সে একা একা বেড়ে উঠেছে। একা একা খেলা করত, অন্য শিশুগুলি নিমেষ, শব্দ, নন্দ, এরা তাকে দেখলে সরে যেত। বলত—ভগ তুমি দুরে যাও। তোমার চোখের পলক সাদা, চোখের মণি লালচে, তোমার সারা দেহে কোথাও কালো নেই। শিশু অথচ সাদা চুল তুমি এক অদ্ভুত। তুমি বৃদ্ধ কি শিশু আমরা জানি না। তুমি দূরে যাও।

ভগ বনভূমিতে নিজের মনে বিচরণ করত। একদিন দেখল একটি আহত হরিণ দৌড়ে এসে এক ধরনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে লাগল, ...আরেক দিন একটি নকুলকে আরেক ধরনের ঘাসে একই ভাবে গড়াগড়ি খেতে দেখল। হরিণটা আহত ছিল, সে তার একটি পায়ে শক্ত করে লতার বাঁধন দিয়ে চিহ্ন করে রেখে দিয়েছিল। নকুল খুব অস্থির জীব, তাকে পারেনি। কিন্তু ঘাসগুলি আলাদা করে রাখে। চিহ্নিত হরিণটির ক্ষত ক'দিনেই শুকিয়ে মিলিয়ে গেল। এই ভাবে শুরু হল ভগর কাজ-কারবার। ক্রমে গোষ্ঠীতে সে একজন সম্মানিত মানুষ বলে গণ্য হতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও নারী তার কাছে কখনও আসেনি।

সে সামান্য জোর করে রঙ্কার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আলাদা করল। হাত দুটি দিয়ে রঙ্কার কাঁধ ধরে সামান্য পিছিয়ে দিল তাকে। নিরীক্ষণ করল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বলল—রঙ্কা, ভাল করে ভেবে দেখেছ? নিশ্চয় জানো আমার মতো অদ্ভুত চেহারা আর কারও নেই। চিরকাল আমি একা একা থেকেছি, কোনও নারী আমাকে ডাকেনি। মধুরা যে মধুরা, দলে হেন পুরুষ নেই যে তার কৃপা না পেয়েছে সে পর্যন্ত আমাকে কোনও দিন মিলনদৃষ্টি দেয়নি। কেন? আমি অস্বাভাবিক... আমার স্পর্শে কারও কিছু ক্ষতি হতে পারে... সবাই তাই-ই ভাবে। কিংবা ঘৃণা জন্মায়, ঘৃণা করে...

রঙ্কা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল—তুমি অস্বাভাবিক নও, অসাধারণ। বললাম না! স্বয়ং চাঁদ তোমায় গড়েছেন! যে দেবতা সে কী করে আর

পাঁচজনের মতো শুধু মানুষ হবে? আর ক্ষতির কথা যদি বলো, ভগ, তোমার মতো মহৎ উপকার তো আর কেউ এ গোষ্ঠীতে করতে পারেনি! তুমি তাদের রোগ সারাও, ক্ষত সারাও, তারপরও যদি তাদের ঘৃণা হয়, তো হোক। সে তারা বুঝবে। মধুরা না চাক, অন্য কোনও নারী না চাক, আমি রঙ্কা, মাতঙ্গীর মেয়ে আমি তোমাকে মিলনদৃষ্টি দিচ্ছি।

ধন্যার তীরে কোথাও কোনও আড়াল নেই। চাঁদ গলে গলে পড়ছে যুগলের ওপর। ভগ যেন শ্বেত হরিণ, আর রঙ্কা যেন বিদ্যুৎ। ধন্যার তীরের ভিজে মাটি মেখে মেখে, ধন্যার ছলচ্ছলের সঙ্গে তীব্র শীৎকার মিলিয়ে প্রায় সারারাত ধরে দুজনের খেলা চলে। এবং অনেক দূরে গাছের আড়াল থেকে ধনুর্বাণধারী একটি মানুষ তাদের লক্ষ করে। সে ব্যাপারটি পছন্দ করছে না। এই মুহূর্তে রঙ্কা ভগকে পছন্দ করেছে, তার কিছু বলবার নেই। নালিশ করা হাস্যকর হবে। মধুরাকে বলা আরও বিপজ্জনক, মধুরা যদিও সবাইকেই মিলনদৃষ্টি দেয়, তবু তার প্রতি একটু বেশি বেশি। সে যদি জানতে পারে রঙ্কাকে অন্যের সঙ্গে মিলিত দেখলে তার রাগ হয়, তখন ঈর্ষায় সে রঙ্কাকে মেরে ফেলতেও পারে। আবার গোষ্ঠীর নারীর সঙ্গী নির্বাচনের মধ্যে নাক গলাচ্ছে বলে তাকে বিতাড়িত করতে পারে। সে একা থাকতে পারে না। বনে-জঙ্গলে একা একা ঘোরা তার পোষাবে না। কত কষ্ট করে তার এই গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও ভরসা সে অর্জন করেছে, আবার কোথায় যাবে! এই ধান্য ছেড়ে? এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে! নিমেষ ভাবতে থাকে, ভাবতে থাকে।

রঙ্কা কুটিরে থাকত একা। সবাই তাকে ভয় পায়। খরচোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে মধুরাদের দেখে, যেন অভিশাপ দিচ্ছে। সে কোনও পুরুষকে চায় না। শম, ছন্দ, অলম্বুষ— এরা সব তার চোখে ব্রাত্য হয়ে গেছে। আপন মনে থাকে রঙ্কা। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করে সব। এবং সে এমন একটা কাজ করে যেটা গোষ্ঠীর সবাইকার প্রশংসা কুড়িয়েছে। ধান্য ছাড়াও আজকাল তারা বন্যফল নানারকম ফলাচ্ছে। বনের ভেতর থেকে মাটি খুঁড়ে ও গাছ ঝাঁকিয়ে সংগ্রহও করে অনেক। রঙ্কা সেগুলি থেকে চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত করে। ধান্যের ভেতরের তণ্ডুল, বড় বড়

কন্দ সিদ্ধ করে, খণ্ড খণ্ড করে তাতে ঝলসানো হরিণ বা বরাহ মাংস মিশিয়ে দেয়, লোনা মাটি মেশায় এবং অপূর্ব স্বাদের খাদ্য তৈরি হয়। অন্ধকার হলে যখন গ্রাম ঘিরে আগুন জ্বালানো হয়, অনেকেই শিকার করে আনা পশু ঝলসায় তাতে। রঙ্কা এক ধারে বসে নীরবে। আপন মনে তার কাজ করে যায়।

—কী করছ রঙ্কা! —শব্দ হয়তো জিজ্ঞেস করল।

—পরিপক্ব করছি।

—কী করছ রঙ্কা?

অর্যমা হয়তো জিজ্ঞেস করল।

—রন্ধন করছি। আগুনের ওপর সোজা ফেলে দিলে তা পোড়ানো হয়। জল দিয়ে বস্তু আগুনে রেখে নরম করার নাম সিদ্ধ করা। উভয় মিললে রন্ধন। আমি রন্ধন করছি। রঙ্কার উদ্ভাবিত এই নতুন খাদ্য মধুরার ভাল লাগে। নিমেষ মুগ্ধ হয়ে যায়। এবং পুরো গোষ্ঠী রঙ্কাকে অসাধারণ বলে স্বীকার করে। তাই যখন সে ভগাকে তার ওষধি ও রসের ভাঁড়সুদ্ধ নিজের কুটিরে নিয়ে এল, সকলেই অবাক হল। এত দিন জেদ করে ছোট কুটিরটি সে তার একার অধিকারে রেখেছিল। এরকম নিয়ম নেই। একমাত্র মধুরা কয়েকটি শিশু নিয়ে একটি বড় কুটিরে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ সেখানে থাকে না। আর প্রত্যেকটি কুটিরে তিনজন, চারজন করে মানুষ থাকে। বস্তুত ঘরের তেমন দরকারই বা কী! সারাদিন হয় ধান্যক্ষেত্রে, নয়তো বনের গভীরে ঘুরতে ঘুরতে কেটে যায়, একমাত্র রাত্রে ঘুমের সময়ে ঘর। মাথার ওপর আচ্ছাদন থাকলে শীত ও বৃষ্টির হাত থেকেও বাঁচা যায়। কিন্তু রঙ্কা যখন নিজের হাতে একটি ছোট কুটির তৈরি করে সেটি দখল করে সোজা তীব্রভাবে দাঁড়িয়ে রইল, মধুরা সবাইকে নিষেধ করে— ওকে কেউ বিরক্ত কোরো না। ও যা চায় তাই করুক। মধুরার চোখ নেত্রীর চোখ, সে রঙ্কার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখে। রঙ্কা একা একাই ধান আছড়ায়। একা একাই শিকার করে আনে, তার ছাল ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে। সবই একা একা। অসহযোগিতা করে না, কিন্তু সে বুঝিয়ে দেয় সে নিজেকে নিয়ে থাকতেই পছন্দ করছে।

নিমেষ তাকে বাগ মানাতে অনেক চেষ্টা করেছে। বনে গুঁড়ি মেরে মেরে নিঃশব্দে রঙ্কা এগোচ্ছে একটি বড় খরগোশকে ধরবে বলে, হঠাৎ পাতায় সড়সড় শব্দ হয়। শশক ছুটে পালায়, রঙ্কা মুখ তুলে দেখে নিমেষ।

রাগে অধীর হয়ে সে চিৎকার করে— আমার শিকারটি নষ্ট করলে কেন? উত্তরে হাসে নিমেষ, চট করে ঘুরে কোথায় চলে যায়, অল্প পরেই তিন-চারটি খরগোশ হাতে ঝুলিয়ে এনে রঙ্কার পায়ের কাছে রেখে দেয়। রঙ্কা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে চায়। তারপর সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

রঙ্কা সাঁতার কাটছে। জলের মধ্যে মাছ ধরছে। তীরের কাছে এসে মাছটি আছড়ে মেরে ফেলে আবার যাচ্ছে। এভাবে কয়েকটি বড় বড় মাছ ধরার পর সে শুধুই সাঁতার কাটে। ডুব দিয়ে চলে যায় গভীরে, তারপর ভুস করে ভেসে ওঠে এবং দেখে ওদিক থেকে সাঁতরে আসছে নিমেষ।

—রঙ্কা, রঙ্কা মনে আছে আমি তোমার সাঁতার-বন্ধু, জলের বন্ধু? মনে আছে?

রঙ্কা উত্তর দেয় না। সে মুখের জল কুলকুচি করে ঊর্ধ্বমুখে ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে দেয়। তারপর আবার ডুব গালে। পিছলে পিছলে চলে যায় দূরে আরও দূরে। আসলে সে নিমেষকে ঘৃণা করে। এই লোকটি মিথ্যা বলেছিল, এ তার পেছন পেছন এসে তাদের ধান্য দেখে গিয়ে তাদের আক্রমণ করেছে। মেরেছে। মাতঙ্গীকে, সিংহকে সে হারিয়েছে এই কূট মানুষটির জন্য। সে কখনওই নিমেষকে বরদাস্ত করবে না।

অর্যমা করুণ চোখে তাকিয়ে বলল— আমার বন্ধু ভগকে নিয়ে যাবে রঙ্কা?

রঙ্কা বলে— অর্যমা, তুমিও ইচ্ছে করলে আসতে পারো। আমি দশার সময়ে তোমাকেও আলিঙ্গন দিতে পারি, কিন্তু একটি শর্ত। অন্য কারও আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে না। রাজি?

—এ আর শক্ত কী! আমাকে কে ডাকতে যাচ্ছে? আমি তো তেমন

বীর নই। আর আমার তেমন দশা হয়ও না। কিন্তু আমাকে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে দিতে হবে— তা বলে দিলাম। অনেক সময়ে রাতে আমি বাইরেই থাকি।

রঙ্কা, ভগ ও অর্যমার একসঙ্গে থাকার এই ইতিহাস। এরকম তো কতই হয়। কে লক্ষ করছে? একটি কুটির একজন পাবে এত কুটির তো এখনও হয়নি। তাই দু'তিনজন ভাগাভাগি করেই থাকে। সেই দলে অদল-বদলও হয়। কিন্তু ভগ খুব আত্মমগ্ন থাকলেও বুঝতে পারে যখন-তখন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। পশু নয়, মানুষ। সে কান খাড়া করে শোনে, শব্দটা সরে যায়, তারপর আবার সে কাজের মধ্যে ডুবে যায়। কাজ বলতে নতুন লতাপাতার সন্ধান, নোনা মাটির সন্ধান। লতাপাতা ছেঁচে রস বার করা— এই সব। সম্প্রতি নদীর ভেতরে থেকে সে একরকম জলজ উদ্ভিদ পেয়েছে। ছেঁচে খেয়ে দেখতে চেয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুম এসে যায়। দিন-দুপুরে যখন পুরো গ্রাম ঘর ছেড়ে শিকারে, শস্যক্ষেত্রে গেছে, বালকগুলি পালিত জন্তুগুলিকে ঘাসপাতা খাইয়ে আনছে, তখন ভগ নদীর ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

দুটি পা এসে তার সামনে থামল। কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর দুটি অমিতবল হাত তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। ভগ পড়ে যাচ্ছিল, একটি শক্ত কাঁধ তাকে ঠেকাল।

—ভগ, ভগ, জাগো, জেগে ওঠো— গম্ভীর স্বরে কেউ বলল। ভগর ঘোর কেটে গেল, সামনেটা ছায়া-ছায়া, সে ঢুলু-ঢুলু চোখে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে নিমেষ।

—কী হয়েছে? ভগ জড়ানো স্বরে বলল— আমি আরও একটি নতুন শক্তিশালী ওষধি খুঁজে পেয়েছি। কাজে লাগবে...। নিমেষ তোমার কিছু হয়েছে?

কড়া গলায় নিমেষ বলল— তুমি আর অর্যমা রঙ্কার কুটির ছেড়ে চলে যাবে।

—কেন? —ভগ অবাক হয়ে বলল— রঙ্কাই তো ডেকে আনল, সে বললেই চলে যাব।

নিমেষ দাঁত কিড়মিড় করে বলল— আমি বলছি চলে যাও। —আমি কথাটার ওপর জোর দিল সে।

ভগ জীবনে কখনও এত অবাক হয়নি। রঙ্কার কুটির থেকে তাকে চলে যেতে বলবার নিমেষ কে? বলতে পারে রঙ্কা নিজে কিংবা মধুরা, দলের নেত্রী। ভগ নিজেও চলে যেতে পারে, তার যদি খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু নিমেষ কেন? নিমেষ তো বলবার কেউ নয়! নিমেষ বলল— চলে যাবে আজই, নইলে বিপদ হবে— আজই যাবে... এই বেলা রঙ্কা শস্য-মাঠে গেছে, যাও নিজের গাছ-গাছড়া সব নিয়ে চলে যাও।

ভগ শান্ত চোখে চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে তার সদ্য সংগৃহীত উদ্ভিদগুলি নিয়ে চলে গেল। তার এখনও খুব মিঠে একটা ঘুমঘোর রয়েছে। সে এখন কুটিরে গিয়ে আরও একটু ঘুমোবে। ওষধির ঘোরটি কাটিয়ে নেওয়া উচিত। কারও গায়ে বর্শা বা তির কিছু লাগলে, উপড়ে তোলার সময়ে এই ওষধিটি কাজে দেবে। বিশেষত বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে। কুটিরে আসতে আসতে কিন্তু ভগর ঘোরটি একেবারে কেটে গেল।

কেন? নিমেষ এরকম কথা বলল কেন? অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবেও সে কূল পেল না। এদিকে না রঙ্কা, না অর্যমা কারও দেখা নেই যে জিজ্ঞেস করবে।

—নিমেষ, তুমি কি এখনও রঙ্কাকে শত্রুপক্ষীয় বলে অবিশ্বাস করো? সে নিজেকেই শুধোয়। এ কথা সত্যি রঙ্কা মধুরার দলের কারও সঙ্গে মেশে না, নিজেদের দলের পুরনো মানুষদের প্রতিও কেমন একটা অবজ্ঞা দেখায়। রঙ্কা কি ভেতরে ভেতরে কোনও গণ্ডগোল পাকাচ্ছে বলে ভাবে নিমেষ? ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, রঙ্কা অভিমানে উগ্র হয়ে আছে, তার দলনেত্রী মাতঙ্গীর পরাজয় ও মৃত্যু সে মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু আর কোনও মতলব তো তার নেই! সে ওষধির ব্যবহার রঙ্কাকে অনেক শিখিয়ে দিয়েছে, অর্যমাও তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত নিয়ে রঙ্কার সঙ্গে আলোচনা করে। রঙ্কা চট করে সব বুঝে নেয়। ...ব্যাপারখানা কী? নিমেষ কি রঙ্কাকে চায়? তো চাক না, কে

বারণ করেছে। রঙ্কার কাছে নিজেকে নিবেদন করুক না, ভগ তো নিষেধ করেনি! এই প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই একদিন ভগ পায়।

শস্য তোলা হয়ে গেছে। রোদে শুকোচ্ছে তারা গোছায় গোছায়। মাটির ওপর শস্য ঘিরে গোল হয়ে বসে রয়েছে সবাই। হাসিখুশি। খেলাচ্ছলে এ ওকে খোলামকুচি ছুড়ে দিচ্ছে, লোফালুফি চলছে। গাছে একরকম বাদাম পেয়েছে তারা। অজস্র। সেগুলি খাচ্ছে অনেকেই। হঠাৎ রঙ্কার কুটিরের দিক থেকে একটা আওয়াজ উঠল। ক্রুদ্ধ বনবিড়ালের ঝগড়ার মতো। কিছুক্ষণ পরেই অবাক হয়ে সবাই দেখল, নিমেষ রঙ্কার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। রঙ্কা প্রাণপণে দু হাতে নিমেষকে প্রহার করবার চেষ্টা করছে কিন্তু নিমেষ তার নাগালের একটু বাইরে। এইভাবে টানতে টানতে সে রঙ্কাকে সবার মাঝখানে ছুড়ে ফেলে দিল, কঠিন গলায় বলল— প্রথম থেকেই বলেছি এ আমার নারী। আমার একার। নিজের রক্ত দিয়ে এর কপাল দেগে দিয়েছি আমি। তা সত্ত্বেও ভগ, অর্যমা, রঙ্কা কেউ আমার কথা শোনেনি। আজ তোমাদের সবার সামনে বলে দিলাম, রঙ্কার কুটিরে আর কেউ থাকবে না, থাকবে খালি নিমেষ। খালি নিমেষ। রঙ্কার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে, সে উঠে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত শরীর থেঁতলে ছড়ে গেছে, কালো লাল নীল দাগ ফুটে উঠেছে যেখানে সেখানে, সে চিৎকার করে বলল—তোমরা সবাই শুনে রাখো, নিমেষ থুঃ থুঃ থুঃ। জোর করে সে আমাকে দখল করতে চায়। আজ অবধি এমন অঘটন মাতঙ্গীর গোষ্ঠীতে হয়নি। মধুরা, মধুরা— যদি সত্য সত্য নেত্রী হও, তো আজ মাতঙ্গীর মেয়ে রঙ্কা তোমার কাছে বিচার চাইছে-এ-এ-এ।

সোজা একটি তির এসে কোথা থেকে বিঁধে গেল নিমেষের ডান হাতে, সে যন্ত্রণায় একটু হেলে গেলে আরেকটি তির এসে বিঁধল তার বাঁ হাতে। নিমেষের দুই হাত খালি। সে মাটিতে পড়ে গেছে। ভগ ছুটে গেল কুটির থেকে তার ওষধি আনতে। অর্যমা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ক্রুদ্ধ গোঙানি নিমেষের মুখে, এক অশ্বারোহিণী এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল—আমার দলের নারীর ওপর হামলা করার দণ্ড দিলাম।

ভগ ততক্ষণে তার ওষধি নিয়ে এসে গেছে। জোর করে সে নিমেষকে কিছু খাইয়ে দিল, তারপরেই মধুরার বল্লম তার ভাঁড়গুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বলল—তোমরা সকলে মিলে একে বনের গভীরে রেখে এসো। নিমেষকে নিয়ম ভাঙার জন্য দল থেকে তাড়িয়ে দিলাম। কেউ তাকে সাহায্য করবে না।

নিমেষ বিতাড়িত, নিমেষ বিতাড়িত—একটা বিস্ময়, ভয়, আক্ষেপের চিৎকার উঠল চারদিকে।—আক্রান্ত হলে কার শর আমাদের রক্ষা করবে?

—কেন মধুরা নেই?

—মধুরা একা, মধুরা একা...

—কেন? তোরা নেই! তোদের বাহুবল নেই? লড়তে পারিস না? –ঘৃণায় কুটিল হয়ে উঠেছে মধুরার মুখ।

...নিমেষ আমাদের চেয়েও বীর ছিল!

—চুপ। একদম চুপ। নিমেষের জায়গায় রঙ্কা তোদের রক্ষা করবে, ছন্দ করবে, শব্দ করবে। ভগ তুমি রঙ্কার ক্ষত ভাল করে দাও।

নিমেষ ততক্ষণে বেহুঁশ। মধুরার কথামতো কয়েকজন তাকে চ্যাং-দোলা করে বনের গহনে দূরে আরও দূরে নিয়ে যেতে থাকল।

নিশীথ

মা,

আমার বড্ড ভয় করছে। নিশীথ আজ একটা অদ্ভুত কথা বলল — ও আমাকে আর ভালবাসে না। আমি নাকি ওর উপযুক্ত নই। আমি কিছু অ্যাচিভ করিনি। আমার কোনও গুণ নেই যে ওর পাশে দাঁড়াতে পারি। ও ক্রমশই উঁচুতে উঠছে মা, আর আমি ওর চোখে ততই ছোট আরও ছোট হয়ে যাচ্ছি। মা, আমি কি চেষ্টা করলেও সোশ্যালাইট টাইপ হতে পারব? আমার যে একদম ভাল লাগে না। তার চেয়ে অনেক ভাল লাগে

শায়রীকে নিয়ে খেলা করতে। ওকে পড়াতে। যে ক'জন বন্ধুবান্ধব আছে তাদের ফোন করতে। তোমাদের ফোন করতে।—আমি কি চলে যাব মা? তোমাদের ফোন খারাপ। এই চিঠি কত দিনে পৌঁছোবে, কে জানে। তত দিনে হয়তো তোমার ঈশা আর নেই।

রঞ্জা তিরের মতো উঠে দাঁড়াল। স্তব্ধ টেলিফোনযন্ত্রের দিকে চেয়ে বলল — বি. এস. এন. এল— তুমি নিপাত যাও।

নিজের মোবাইল থেকে তৎক্ষণাৎ ঈশার নাম্বারে ফোন করল।

—হ্যালো!

—ঈশ্—মা বলছি। তুই আমার মোবাইলে ফোন করতে পারতিস তো।

—নম্বরটা ভুলে গেছি মা, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

—কোথাও লিখে রাখিসনি?

—নাঃ, খুঁজে তো পাচ্ছি না।

—তোর টেলিফোন-বুকটা নে, এক্ষুনি লিখে রাখ— নাইন এইট ওয়ান...

—আমার টেলিফোন বই নেই যে।

—সে কী?

—কোথাও ছিল। এখন কোথাও নেই। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। সেই যে তুমি ডায়েরিটা দিয়েছিলে, সফ্‌ট, ব্লু রঙের— সেটাও না, কুক-বুকগুলোও নেই। কে আমার সব দরকারি জিনিস ওলটপালট করে দিচ্ছে মা। ওলটপালট ধুলট পুরাণ জীবন ওড়ে, ইন্দ্রপতন হচ্ছে মাগো আকাশঘরে, কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না আর ধুলোর ঝড়ে, ভূ-হৃৎকম্পে জীবন ভাঙে জীবন গড়ে। কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না মা.... কিছুই খুঁজে কিছুই খুঁজে... মাগো একটা একানড়ে ভয় দেখাচ্ছে। ভীষণ ভয় মা, ভীষণ ভয় মা। সব জানলা সব দরজার কপাট ধরে...

—ঈশা— আ। ভয় নেই। ভয় কোরো না। এরকম কোরো না। আমি আছি— আমরা তো আছি।

ওদিকে ফোন নীরব হয়ে গেল। হাজার চেষ্টা করেও আর লাইন পেল

না রঞ্জা। কিছু খুঁজে পাচ্ছে না! ভীষণ উথালপাথাল হয়ে রয়েছে। কীরকম যেন করছে। কী সব বলছিল—মনে করতে গিয়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল—ঈশা যা বলছিল সেটা একটা কবিতা, তার ছন্দ আছে, মিল আছে। ও কি কবিতা লিখছে? লিখতেই পারে। কিন্তু কেমন যেন প্রলাপের মতো কবিতা। ও লেখেনি। বলেছে মাত্র। ভূ-হৃৎকম্প। নিজের মানসিক অবস্থা বোঝাতে ঈশা এই অদ্ভুত শব্দটা বার করেছে। সে মনে করে করে পুরোটা লিখে ফেলল নিজের ডায়েরিতে। ইন্দ্রপতন, ভূ-হৃৎকম্প... একানড়ে..... লেখেনি, বলেছে। উক্ত কবিতা। সে শুনেছে—শ্রুতি। শ্রুতিই তো ছিল, ছিল ওর‍্যাল ট্র্যাডিশন... সব ভুলে গেছে শুধু ডায়েরির সফ্‌ট ব্লুটা ওর মনে আছে? হালকা নীল— ওটাই বোধহয় ঈশার মনের রং। নীলের রহস্য, মিস্টিক একটা দূরত্ব, গভীর, খুব নরম, খুব ভঙ্গুর, খুব দুর্বল। নিশীথ বুঝতে পারল না। মর্যাদা দিতে পারল না! আর সেটা প্রকাশ করছে এই এখন ন' বছর পরে, যখন মেয়ের বয়স সাত পেরিয়ে গেছে! একটা অন্ধ রাগ, ভয়ানক আক্রোশ ঝড়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে উঠল ভেতরে। ভেবেছে কী নিজেকে ছেলেটা? এত অহংকার? কীসের অহংকার এত? টাকা রোজগার করছিস এত এত? তাই? যখন প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলি ঈশাকে চেয়ে! কিছুতে দিতে চায়নি তারা। অত তাড়াতাড়ি! অত আদরের ছেলেমানুষ মেয়ে! —কেন চাও বিয়ে করতে— নিশীথ! —নিশীথ অপ্রস্তুত মুখে চুপ। সুবীর ধরিয়ে দিচ্ছে কথাটা! —ডু ইউ লাভ্ হার?

—হ্যাঁ, আর কী জন্যে মানুষ..... নিশীথ কথা শেষ করে না।

—তুমি কি নিশ্চিত, বাইরের রূপটা দেখে মোহগ্রস্ত হওনি?

—আ অ্যাম ম্যাচুঅর এনাফ টু-আন্ডারস্ট্যান্ড দি হোয়াই অব মাই ফিলিংস।

ভালবাসা কিন্তু কোনও বাইরের চাহিদার ওপর নির্ভর করে না। —দাঁতে দাঁত চেপে বলল রঞ্জা।—ভালবাসা...জানো তোমরা শব্দটার পুরো মানে? কেন ব্যবহার করো? কেন করেছিলে? কতকগুলো

ব্যবহারিক কাজ-কর্ম, রান্না-ঘর সাজানো—ঠিকঠাকমতো সেবা। বাইরের অতিথিদের আপ্যায়ন, নিজেরা পার্টিতে শামিল হওয়া। ছেলেমেয়ের জন্ম, ও তাদের মানুষ করার পুরো দায়িত্ব সামলানো একা-একা—এই সব হল—কারণ—বিয়ের পেছনে। ভালোবাসা-টাসা আবার কী? যে মানুষটা অন্তর্মুখী স্বভাবের, মিশুকে নয়—তাকে দিয়েও সামাজিকতা হয়। হয় বই কী! তার তরিকা আছে কতকগুলো। রঞ্জার সেজদাদা মিলিবউদিকে কীভাবে গাইড করেছে। এত ভিতু, মুখচোরা ছিল মিলিবউদি! তাকে ভালবেসে, সম্মান দিয়ে, সবাইকে বুঝতে দিয়ে যে হতে পারে এ তত ওস্তাদ সামাজিক নয়। কিন্তু একে আমি ভালবাসি। এখন সে কী করবে? কী করবে? মা হয়ে সে সাহস দিতে পারে। আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু স্বামীর থেকে প্রাপ্য যে ভালবাসা, সম্মান—তা কি দিতে পারে? এত সহজ! বলে দিল—আর তোমাকে ভালবাসি না! কী ভীষণ কঠোর কথা! কেউ কাউকে বলে? জীবন এগোতে এগোতে কতজনের জীবনসঙ্গীর ওপর ভালবাসা ক্ষয়ে যায়। আর সেই মাদকতা, সেই মাধুর্য থাকে না। মায়া থাকে, বিশ্বাস থাকে। মুখে বলে ওঠা— আর আমি তোমাকে ভালবাসি না.... এত নিষ্ঠুরতা? মেয়েটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছে! এখন যদি একটা নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়! চন্দ্রকেতুগড়ের কাজ জোর চলছে, এখন এই বিপদ! সে কী করে সামলাবে?

—সুবীর! সুবীর! —সে আর্ত আকুল হয়ে ডাকল।

—কী হল আবার? অন্য দিকের ঘর থেকে আওয়াজ এল।

—শুনে যাও একবার, শোনো না!

জামাকাপড় পরতে পরতে এসে দাঁড়াল সুবীর...

—ঈশা বোধহয় খুব বিপদে পড়েছে।

—মানে?

—ওদের মধ্যে কোনও মন কষাকষি....

—সে তো দম্পতির মধ্যে নিত্য হচ্ছে— বিপদটা কী?

—ওকে একেবারে উদ্ভ্রান্ত শোনাল ফোনে। একটা চিঠি আজই এল। দেখো!

—ইডিয়ট! —চিঠিটা পড়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল সুবীর।

—নিশীথের মোবাইলটার নম্বর দাও দেখি।

—না, না। ভেবেচিন্তে কাজ করো। আগে মেয়েকে সাহস দাও, সান্ত্বনা দাও। ফট করে নিশীথকে কিছু বলতে যেয়ো না। কে জানে কী হয়েছে। সেন্টিমেন্টাল মেয়ে।

হ্যাঁ, সে কথা একশোবার সত্যি। ছিঁচ-কাঁদুনি মেয়ে তৈরি করেছ একটি। নিজে এমন সবলা হয়ে যে অমন অবলা একটি মেয়ে কেমন করে।

—সেক্ষেত্রে বলতে হয়—ও গুণটি ও বাবার থেকে পেয়েছে।

—বাঃ, অমনি আমার দোষ হয়ে গেল?

—না দোষ না। তুমি বললে, তাই আমিও বললাম। ওসব ছাড়ো। এখন তুমি মেয়েকে একটা ফোন করো তো!

সুবীরের ফোনটা কী ভাগ্য, লাগল।

—ঈশা, বাবা বলছি। কী হয়েছে তোর?

—কিছু না বাবা। আমি এখন দরকারে বেরোচ্ছি, সেই আবিদের দিকে। আজ আবার শায়রী তাড়াতাড়ি আসবে। টেস্ট হয়ে ছুটি হয়ে যাবে তো! রাখি বাবা। হ্যাঁ! ভেবো না।

—ঠিক আছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা, মাথাটা পরিষ্কার রাখাই আসল। জীবনে অনেক সময়ে অনেক জটিল পরিস্থিতি হয়। বি কুল। র‍্যাশ কিছু ভাববে না, বলবে না, করবে না।

—কী বলল? —ফোন রাখতে রঞ্জা জিজ্ঞেস করল।

—কিছু তেমন না। আমি যা বলার তা তো বললুম, শুনলে। বলল— ভেবো না। ইমপালসিভ স্বভাব তো! সকালে বোধহয় কোনও কথা-কাটাকাটি হয়ে থাকবে। তাইতেই অশ্রু ঝরে, তাতেই দীর্ঘশ্বাস।

সুবীর বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে পেছন ফিরে বলে গেল— অ্যাগ্রেসিভ, ইগোয়িস্ট টাইপের। আমি কোনও দিনই স্বস্তি পাইনি। তোমার ওই জামাই...

—ইগোয়িস্ট তো সবাই— এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ— রঞ্জার মুখে এসেছিল, সামলে নিল।

তার শাড়ির প্লিট ভাল হল না। কোল-আঁচল বেরিয়ে রইল, সে টের পেল না, খানিকটা চুল মাথায় ঠিকঠাক বসেনি। রঞ্জা চন্দ্রকেতুগড়ে চলল। যেতেই হবে।

মা মেয়ে....

রায়চৌধুরী বলছিলেন—দেগঙ্গা নামটা কোথা থেকে এসেছে বিচার করতে গেলেই একটা ইতিহাস বেরিয়ে আসবে রঞ্জাবতী। গঙ্গার দুটি ধারা ভাগীরথী ও গঙ্গা দুদিক দিয়ে বইত—তাই দ্বিগঙ্গা। দীর্ঘতার জন্য দীর্ঘগঙ্গা, দেবরূপের জন্য দেবগঙ্গা, এতগুলো নামের মধ্যে কমন কী পেলেন বলুন তো?

—গঙ্গা, আর কী!

—অনেকে আবার বলে গঙ্গা নিমন্ত্রিত হয়ে আসছিলেন রাজার ছেলের অন্নপ্রাশনে, রাজার শত্রু পিরসাহেব তাঁর কানে তুলে দিলেন সেখানে তাঁর জন্য রাঁধা হচ্ছে নিষিদ্ধ মাংস। শুনে গঙ্গা ফিরে গেলেন।

—দেবদেবীরা খুব কানপাতলা হতেন, তাই না? রাজা কর্ণেন পশ্যতি বলে একটা কথা আছে ঠিকই। কিন্তু রাজার কানে যে কোনও কথা তুলে দিলেই তার সত্যাসত্য বিচার না করে তিনি যদি তার ওপর অ্যাকশন নেন তা হলে তো সর্বনাশ! তা এত যে গঙ্গা গঙ্গা করছেন এদিকে গঙ্গা কোথায়!

—ওপারে শ্মশান আছে দেগঙ্গার, তার পাশে একটা সরু সোঁতামতো আছে, ওইটেই গঙ্গার পদচিহ্ন। আপনাকে দেখাব এখন। কিন্তু তার চেয়েও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল ওই গঙ্গা বা গঙ্গে। এটাই কি সেই আদি গঙ্গারিডি, পেরিপ্লাস যার বর্ণনা করেছিলেন? বিনয় ঘোষ বলছেন দেবগঙ্গা, দেগঙ্গা, দেবালয় ও অন্যান্য স্থানীয় স্মৃতি থেকে মনে হয়

গ্রিকদের বর্ণিত প্রাচীন গঙ্গারিডি জাতি ও রাজ্যের সঙ্গে দেগঙ্গা আর চন্দ্রকেতুগড়ের সম্পর্ক আছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পেরিপ্লাস একেই প্রাচীন বাণিজ্য নগরী গঙ্গা বলছেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি বলছেন গঙ্গারিডাই। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মশাইয়েরও এই মত।

—নিজের দ্যাশ তো তাই খুব গুণ গাইছেন।

রায়চৌধুরী হাসলেন। —আরে পুরো চত্বরটাই ধরুন দেগঙ্গা দেউলিয়া, চন্দ্রকেতুগড়, খনামিহিরের ঢিপি মিলিয়ে একটা প্রত্নভূমি। রাশি রাশি গল্প, কাহিনি লোকের মুখে মুখে ফেরে। শোনাব এখন আপনাকে। ইন ফ্যাক্ট লিখে ফেলতে হবে, কো-অর্ডিনেট করতে হবে।

প্রত্নভূমি কোনটা নয়। সারা ভারতবর্ষই এক অতি প্রাচীন ভূমি। তার মাটির স্তরে স্তরে সাজানো আছে সভ্যতার পরতের পর পরত। একবার বুডাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে নিয়ে পাণ্ডুয়া দেখাতে গিয়েছিল। এক জায়গায় ভদ্রলোক খুব একটা ঠোক্কর খেলেন, আধলামতন ইটের টুকরো, খুঁড়ে সেটাকে তোলা হল, —একটা চিত্রিত পোড়ামাটির ট্যাবলেট। দেখে ভদ্রলোক কী মুগ্ধ, কী উত্তেজিত। —তোমাদের দেশ থেকে যখন তখন যেখান সেখান থেকে এইরকম সব আশ্চর্য জিনিস বেরোয়। আমাদের কোনও সভ্যতা নেই। যদি বা আছে তার কোনও প্রাচীনতা নেই। রহস্য ছাড়া স্বপ্ন ছাড়া অতীত ছাড়া একটা গদ্যময় দেশ।

রঞ্জা হেসে বলে— তোমরা আমাদের অতীত নিয়ে মুগ্ধ। আমরা তোমাদের বর্তমান দেখে লুব্ধ, ভবিষ্যতের কথা ভেবে উত্তেজিত বোধ করি। কারও অতীত থাকাটা কেন এত গর্বের আমি বুঝি না। লক্ষ বছর পরের মানুষ মাটি খুঁড়ে তোমাদেরই সভ্যতার চিহ্নগুলো পাবে। উত্তেজিত, প্রদীপ্ত হবে। আমাদের এই সব অতীত তখন ধুলো হয়ে গেছে। সবটাই আপেক্ষিক, সময়ের ব্যাপার। মহাকালের বিচারে সবই প্রায় সমকালীন, নয়?

যতই বলুক, আমরা তো মহাকালীন নই। আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতা নিয়ে আমরা গর্বিত হতেই পারি। রঞ্জা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সেই প্রাচীন, কী বলছে? যক্ষীমূর্তি। বিপুলস্তনী, নিবিড়নিতম্বিনী, অলংকৃতা, গোলমুখ, চোখে স্নেহদৃষ্টি,— চন্দ্রকেতুগড় বা গঙ্গারিডির লোকেরা কি এই যক্ষিণী পূজা করত? মাটির পাত্র নানা আকারের, ঘট, তার নলটি ভেঙে গেছে। একটু অন্যরকম দেখতে বদনা। এই নল দিয়ে দেবদেবীর মাথায় জল ঢালা হত। দেবদেবীদের মাথা বোধহয় খুব গরম, ব্লাড-প্রেশার সব সময়ে চড়ে থাকে, তাই-ই কি জল বা তরল ঢালার ব্যবস্থা? নাকি তাঁদের জগতে স্নানঘর, হামাম নেই? সে জন্য মর্ত্য মানুষদের হাতের ভক্তিধারা জলধারার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়!

দেবদেবী কারা! আমাদের বিশ্বাস, আমাদের নিজহাতে গড়া স্বপ্নপ্রতিমা, নিজেদের বিশ্বাসকেই আমরা স্নান করাই। আরতি করি, ভোগ নিবেদন করি। অনাদি অতীত থেকে মানুষ এই করে আসছে। আমার এ ঘর বহু যতন করে / ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে...। কী জানি সে আসবে কবে! কবে তার মনে পড়বে আমায়! নিজের ভরসা, নিজের মহত্ত্ব, নিজের ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের এই বিরহ কতকালের।

রায়চৌধুরী বললেন— আসুন রঞ্জা। ইনি নিবারণ বিশ্বাস। ইনি একরাম আলিসাহেব, সব এসে গেছেন।

নমস্কার করল রঞ্জা— এঁরা সত্যিই নমস্য। নিবারণ বিশ্বাস স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, একরাম আলি মাদ্রাসার। দেগঙ্গা, দেউলিয়া ও কাছাকাছি গ্রামগুলিতে প্রচুর মুসলমান থাকেন। এঁদের দুজনের বিশেষত্ব হল— এঁদের বাপ-পিতামহ যে সংগ্রহ করে গেছেন এঁরা সাবধানে সেগুলোর সংরক্ষণ করছেন। কেউই টেকনিক্যাল লোক নন। ইতিহাসের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই। খালি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে এক ধরনের ইতিহাসবোধ গড়ে উঠেছে। নিবারণ নিজের একটি লেখা পুরো খাতা রঞ্জাবতী দত্তকে পড়তে দিয়েছেন। রঞ্জা পড়ছে। সে খুবই কৌতূহলের সঙ্গে নিবারণের দিকে তাকাল। খেলনাগুলো দেখুন— নিবারণ সসম্ভ্রমে বললেন।

ছোট ছোট জন্তুজানোয়ার। ভেড়ার মুন্ডু, খোকাপুতুল, মাটির গাড়ি, মৃচ্ছকটিক। সেই মাটির গাড়ি যা নিয়ে শূদ্রকের নাটক। খেলনাটা আজও

স্মরণ করিয়ে দেয়। গাড়ি ছোটদের ভীষণ প্রিয়। বাচ্চাদের গাড়ি চাই। কত রকমের মোটর, এরোপ্লেন, জাহাজ, জিপ যে বাচ্চাদের উপহার দেওয়া হয় আজকাল। তাদের গাড়ি-প্রীতি কি আদি মানবের প্রথম চাকা-আবিষ্কারের সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত! কতরকম ভাবে গাড়িগুলোকে নিয়ে খেলে ওরা। তার নাতনি শায়রী মামার বাড়ি এলেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার গোটা বারো গাড়ি আসবেই। চাকাগুলো মাটিতে ঘষে ঘষে শব্দ করে ছেড়ে দাও— হুস করে ছুটে যাবে, টেবিলের পায়ায় লেগে গেল। সবটাতেই আনন্দ। চাকারই যত কায়দা, যত জাদু! গাড়িটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। গাড়িটাতে আর শায়রীতে অভেদ হয়ে যাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে— আড়াই তিন থেকে পাঁচ ছ' বছরের শায়রীকে, মাথায় অল্প কোঁকড়া চুল। অনাবিল চোখ— সুন্দর নরম ছোট ছোট হাত। কবজির কাছে একটি মোহন ভাঁজ। হাতের থাবায় ধরা একটা নীল মার্সেডিজ। নিষ্পাপ শিশু এখনও যে জানে না, বোঝে না তার জনক তার জননীকে বলে দিয়েছে সে তাকে আর ভালবাসে না। কথাটা কি কথার কথা? সাময়িক বিরক্তি প্রকাশ করতে চেয়েছে নিশীথ? অসম্ভব ক্রোধী, উত্তপ্ত ধরনের মানুষ, আজকাল কথা বললে, টেলিফোনের মধ্য দিয়েও একটা আঁচ টের পাওয়া যায়! চাকরিতে ফটাফট উন্নতি করছে। পরিশ্রমও করছে তার জন্যে। কিন্তু এই হঠাৎ পরিবর্তন নিশীথের কি উচ্চপদের, টাকার গরম? নিজের জামাইকে এত অপরিশীলিত ভাবতে খারাপ লাগল বড্ড। এত সাধারণ ও? হঠাৎ তার মনে হল —বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু এইরকমই! কোনও আর্থিক উন্নতি হলে মাথার ঠিক রাখতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই খুব কৃত্রিম, সংস্কারবদ্ধ, কতকগুলো পূর্ব ধারণার মধ্যে ভীষণ ভাবে সীমাবদ্ধ। এই নিশীথ, নিশীথের বাবা জজসাহেব, আরও এই জাতীয় অনেক আত্মীয়-স্বজন এইরকম। ছকে-বাঁধা মানুষ। কাঠ-কাঠ কথাবার্তা। ভেতরে কিছু নেই। কনভার্সেশন করছে। কিংবা সোশ্যালাইজ করছে। আসল মানুষ কিন্তু চারপাশে অনেক দেখা যায়। এই নিবারণ বিশ্বাস, এই একরাম আলি— জজসাহেবের বৈঠকখানায়

হয়তো বেমানান। কিন্তু এদের জ্ঞান, নিষ্ঠা, শিক্ষা— অনেক জজ-ব্যারিস্টারের থেকে এদের বেশি মানবিক এবং গুণী করে তুলেছে। মূল্যবোধগুলো যেন কেমন গুলিয়ে যায় তার। কে জানে এরা আবার বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে। সুবীর বা নিশীথও তো তাদের চাকরিস্থলে সুভদ্র বলেই খ্যাত।

কীরকম খাপছাড়া ভাবে সে জিজ্ঞেস করল— নিবারণবাবু আপনার ফ্যামিলি কী? একটু অবাক হয়ে তাকাল নিবারণ। লাজুক হেসে বলল বিয়ে-থা হয়ে ওঠেনি এখনও। মা আছেন, এই সব নিয়ে ভালই আছি।

একরাম আলি বললেন— আমার বিবি আমায় খুব হেল্প্ করেন দিদি। আমি তো চাকরি বাদে এই সব নিয়েই আছি। এতে কারও কোনও নালিশ নেই। সংসার তিনিই সামলান। আমি কিছু দেখি না। বোঝলেন না?

একরামের থেকে নিবারণের বয়স কম। কিন্তু চল্লিশ নিশ্চিত ভাবে পার হয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে নিবারণ হেসে বললেন— যদি এসব দেখাশোনার লোক তৈরি করতে না পারি, জাদুঘরের কিউরেটরকে ভার নিতে বলব। আপনার ভয় নেই দিদি।

রঞ্জা হাসল। যেন সে এই জন্যেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিল। ভেতরের কোন আলোড়ন থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছে তা এরা ধরতে পারেনি। পারার কথাও নয়।

বিয়ের সময়ে যা যা দিয়েছিল খুব পছন্দ করে, যত্ন করে, ভালবেসে দিয়েছিল। নিশীথের বাবা-মা বললেন— যা দিয়েছেন সব অতি সুন্দর, তবে সবচেয়ে সুন্দর আপনার মেয়েটি। দেখলে চোখ, মন জুড়িয়ে যায়।

উচ্ছ্বাসটা শ্বশুরেরই বেশি ছিল। জজগিন্নি সায় দিয়েছিলেন হেসে। অত সুন্দর করে, গোলমাল, ত্রুটিহীন বিবাহ— তার পরিণতি এই?

মেয়েটা ছেলেমানুষ ছিল, ব্যাবহারিক জীবনের সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। সে কিন্তু বলেছিল কথাটা। আমাদের এখন এই একটিই সন্তান দাদা, খুব আদরের। আমরা কখনও বকা-ঝকাও করি না। একটু আতুপুতু করেই মানুষ বলা চলে। একটি সন্তান তো....

বুকটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। বিষাণ চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত দুর্বোধ্য অসুখ। গ্যালপিং হেপাটাইটিস। কিচ্ছু করা গেল না। ছোট্ট শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। চোখে অসহায় আর্তি। সে হাত ধরে বসে ছিল, নার্সিং হোমে বেডের পাশে। বাবা পায়চারি করছে। মেয়ে মামার বাড়ি রয়েছে। রোজ ভাইকে দেখতে এসে মুখ শুকনো আমসি হয়ে যায়। আমি আছি, আমরা আছি বারবার বলছিল সে, চোখে স্নেহ মেখে। আশ্বাস মেখে তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ। মায়ের চোখের আশীর্বাদ ভালবাসা ব্যাকুলতার যদি কোনও সাইকিক প্রভাব থাকে তা হলে বিষাণ ভাল হয়ে যেত। বোধহয় নেই। মায়ের সর্বস্ব দিয়েও বোধহয় সন্তানকে রক্ষা করা যায় না। বিষাণ চলে যাবার পর বাড়িটা অভিশপ্ত লাগত। ঈশা গুমরে গুমরে বেড়াত। কাঁদত কখনও লুকিয়ে, কখনও প্রকাশ্যে। বাবা-মা যে তাকে জড়িয়ে ধরবে, তাকে আশ্রয় দেবে, আশ্বাস হয়ে আশীর্বাদ হয়ে সঙ্গে থাকবে, ঘিরে থাকবে —এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? —অনন্তকাল থাকত বুকের ভেতর। না-ই করত বিয়ে। তাতেও তার কিছু মনে হত না। কিন্তু বিয়ে করলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজে পরিণত হয়ে, সচেতনে বিয়ে করো। তা না, দু-চারটে মিষ্টি কথায় ভুলে— মেয়েটা মা-বাবার নিশ্চিত নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে গেল? একটা মাটির পুতুলের মতো, কাদামাটির পুতুল। তাকে ওঁরা ভালবেসে যা গড়তেন তাই-ই হত। ভালবাসার অত অভাব ঘটে কেন পরিণত বয়স্ক মানুষের? কী করেছিল ওরা তিনজনে মিলে মেয়েটাকে যে দিনে দিনে মেয়েটার চোখের দৃষ্টি বদলে যেতে থাকল! ওইটুকু মেয়ে। বিষাদে মগ্ন। মাঝে মাঝে আবার সামান্য কারণে ঝেঁঝে উঠছে। কোথাও কিছু একটা বেসুর বলছে। বুঝতে পারছিলেন কিন্তু উত্তর পাচ্ছিলেন না। জিজ্ঞেস করলে ওই ঝাঁজ। 'এত দিন তো প্রোটেকশন দিয়ে দিয়ে বড় করেছ, এখন আমাকে নিজেকে বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে দাও না!' শাশুড়ি-শ্বশুর যত চোখ গরম করছেন ও তত মুষড়ে পড়ছে। অসহযোগ চালাচ্ছে। এ ভাবে হয় না ঈশা, এখনও কোনও কোনও ফ্যামিলি উনিশ শতকের প্রথমাংশে বাস করছে, বিশ শতকের শেষ দিকে মাথা, মগজ, কিন্তু উনিশে পা।

তার ফলে এসব মানুষকে বোঝা যায় না। এদিকে যন্ত্রপাতি, কম্প্যুটার গুলে খেয়েছে। কাঁটা-চামচে খায়, বাড়ি পশ্চিমি কায়দায় সুসজ্জিত, কুঁচিয়ে পরিপাটি শাড়ি পরা মহিলা, প্যান্টশার্ট পরা বয়স্ক পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে চশমা পরা বুদ্ধিমান বসে আছেন, লোকের হাত দিয়ে ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এল, মহিলা চা তৈরি করে দিলেন। সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু সেই সব মানুষই বউয়ের খাওয়ার দিকে শ্যেনদৃষ্টি ফেলে রাখেন! ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলে কথা বন্ধ করে দেন! বরের সঙ্গে বেরিয়ে খেয়ে এলে বা দেরি করলে, খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাজার কথা শুনিয়ে দেন, ছেলেকে নয়, বউকে। এ কবেকার মনোবৃত্তি! বাড়িতে অন্য বাড়ি অন্য সংসার থেকে একটা সোঁদা মেয়ে এসেছে, নিজের মা-বাবা-পরিবেশ ছেড়ে, তার প্রতি মমতা, সৌজন্য, এগুলো তো থাকবেই। তোমরা সকলে একসঙ্গে, সে একা। তার অভ্যাস, তার ভিন্নতার সঙ্গে মানাবে তোমরা, মানাবার কাজটা শুরু করার দায়িত্ব তোমাদের হে জজসাহেব, একটা উনিশ-কুড়ি বছরের অনভিজ্ঞ কিশোরীপ্রায় মেয়ের নয়! নয়! কখনওই নয়! তোমরা যা করেছ তা শুধু কাণ্ড-জ্ঞানহীনতার পর্যায়ে পড়ে না। চূড়ান্ত হৃদয়হীনতা, অমানবিকতার স্তরে চলে গেছে সেটা। আমার কল্পনায় কিছুতেই আসছে না।

এ ভাবে হয় না ঈশা! যে উনিশ শতকের মানুষ, তার বাড়িতে উনিশ শতকীর মতোই তোমাকে থাকতে হবে। সেখানে অভিমান দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। স্নেহ ভালবাসা প্রত্যাশা করে কোনও লাভ নেই। যা বলছে নীরবে করে যাও, প্রশ্ন কোরো না। তারপরও হাসিমুখে থাকো—কেন বলনি মা? ওই আপাত-আধুনিক বাড়িতে প্রাচীনতা বাসা বেঁধে আছে! বললে শিখিয়ে দিতে পারতাম প্রশ্নহীন বাধ্যতা দিয়ে প্রাথমিক বাধাগুলো জয় করে অবশেষে কী ভাবে এসব মানুষকে খানিকটাও অন্তত মানবিকতার দিকে আনতে হয়! সবচেয়ে মজার কথা হল—নিজেদের বউমার কাছ থেকে এঁদের দাবি, প্রত্যাশা এত বেশি, তাকে এত নিচু চোখে দেখেন সে মাংসের কিমা-কারিটা ভাল রাঁধতে পারেনি বলে! কিন্তু ওঁদেরই আত্মীয়-বাড়িতে বউয়ের সাত মাসের দামাল

ছেলেকে শাশুড়ি একলা সামলান। সামান্য কিছু চাকরি করে মেয়েটি। তার কত আদর! গায়ে আঁচটি লাগতে দেন না। রবিবার যদি কিছু রাঁধে সে শাশুড়ি দেখিয়ে তো দেনই, খেতে বসে সবাই তাকে উৎসাহ দেয়— দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে বলে। ছেলেকে রেখে ছেলে-বউ সিনেমা-থিয়েটার যাচ্ছে, তাঁদের তো কোনও নালিশ নেই! আজকাল বেশির ভাগ ভদ্র, শিক্ষিত বাড়িতেই এইরকম। স্বাভাবিক। তার ভাগ্যে, ঈশার ভাগ্যে সেই একটিমাত্র অস্বাভাবিক বাড়িতেই বিয়ে হতে হল?

রাত্রি ন'টায় দরজায় বেল শুনে খুলে দিলেন সঞ্জয়। রঞ্জা দাঁড়িয়ে।

—কীরে? এত রাতে?

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে রঞ্জা বলল চন্দ্রকেতুগড় মানে দেগঙ্গার ওদিকটায় কাজে গিয়েছিলুম। তোমাদের বাড়িটাই আগে পড়ল দাদা, খুব ক্লান্ত, বুঝলে? মা কোথায়? বউদি কোথায়?

—আয় আয়!

—বাড়িতে একটা ফোন করে দিই আগে— রঞ্জা ভেতরে ঢুকেই মোবাইল বার করল— হ্যাঁ, শোনো, আমি আজ মায়ের কাছে থেকে যাচ্ছি। না অসুখ-বিসুখ কিছু না। জাস্ট খুব ক্লান্ত। সব ঠিক আছে। ফ্রিজে। হ্যাঁ, প্লিজ, সেটাই বলছিলুম। যদি বাই চান্স ল্যান্ড লাইনে ফোন করে কেউ আমার মোবাইলটা দিয়ে দেবে। ঠিক আছে?

...বউদি বলল— কী যে করিস! হঠাৎ! সুবীর যদি কিছু মনে করে?

—কী আবার মনে করবে বউদি! সে-ও তো যাচ্ছে! লেকচার, সেমিনার, সেবার বাঁকুড়া গিয়ে ফিরতে পারল না, রাত দশটায় ফোন। আমি কি কিছু মনে করেছি!

—ওর কথা আলাদা!

—বা! বা! ওর কথা আলাদা কেন? ও সেমিনার করতে গেছে! আমিও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে সভ্যতার খোঁজে গেছি।

আমারটা আরও কষ্টকর। এখানে থেকে আবার কসবায় ফিরতে হলে... আজ ভীষণ জ্যাম।

মায়ের ঘর থেকে ভেসে আসছে...

> ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহা বিদ্যতে।
> তৎ স্বয়ম্ যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
> শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি॥

চতুর্থ অধ্যায় কি? মা জ্ঞান ও শ্রদ্ধার মধ্যে বিহ্বল দাঁড়িয়ে আছেন। জ্ঞান নয়, শ্রদ্ধাও সহজ নয়, নিষ্প্রশ্ন শ্রদ্ধা! মা কি পারবেন?

—এই রাত ন'টায় এখনও মায়ের পুজো শেষ হয়নি বউদি?

বউদি একটা মুখভঙ্গি করল— আজকাল সারা দিন রাতই তো পুজোর মধ্যে আছেন। কী যে হয়েছে!

দাদা বলল— বুড়ো মানুষ, পুজো-টুজো নিয়ে থাকাই তো ভাল!

—শাড়ি-টাড়ি বার করে দিই? —বউদি জিজ্ঞেস করল।

—উঁহু। এই যে আমার ব্যাগ দেখছ, এতে সবসময়ে অন্তত দুটো চেঞ্জ রাখছি, ধুলো মাখামাখি... যা অবস্থা হয় না ওখানে।

চানঘরে যাবার আগে মায়ের ঘরে উঁকি মারল রঞ্জা। —মা, আমি এসেছি।

মা যদি আগের মতো বলতেন— এসেছ, বেশ করেছ। এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাও— তা হলে কিছু মনে হত না। কিন্তু মা বললেন—

> হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
> ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং সংসার দুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ।
> হে পার্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ
> হে বামদেব ভব রুদ্র পিণাকপাণে সংসারদুঃখাৎ জদগীশ রক্ষ ॥

রঞ্জা দাঁড়িয়েই রইল, দাঁড়িয়েই রইল। মায়ের স্তব শেষ হল। বইটিকে মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করে ধীরে-সুস্থে তাকে তুলে রাখলেন বেদবতী, তারপর বললেন— পুজোর সময়ে আমি কথা বলি না রে! আয় এবার!

—আমি আজ থাকব মা, তোমার কাছে। দাঁড়াও চান করে আসি।

—থাকবি? তুই? আমার কাছে! মা যেন তিন সপ্তকে বললেন। খাদ থেকে চড়ায় উঠছে বিস্ময়। থাকাটা প্রথম বিস্ময়, 'তার' থাকাটা দ্বিতীয় বিস্ময়, 'তাঁর' কাছে থাকাটা তৃতীয় বিস্ময়। পুরোটা পরিষ্কার বুঝতে পারল রঞ্জা। রঞ্জা যে কবে শেষ থেকেছে এখানে তাকে ভেবে বার করতে হবে, তারপর নোটিশ ছাড়া, আর মায়ের কাছে থাকা! মা স্কলার মেয়ের কাছে নিজেকে আজকাল বড় অযোগ্য মনে করছেন। শুধু মেয়ে নয়, মেয়ে ছেলে সব্বাই। কী বিষয়ে যে ওরা কথা কয়! সেভেন হানড্রেড বি.সি. চর্যাপদ, ত্রিপিটক। মাদার বোর্ড, মাউস, গ্লোব্যালাইজেশন, গ্রিন হাউজ এফেক্ট। সেনসেক্স বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়া... অজস্র শব্দ, অজস্র শব্দবন্ধ নাতি নাতনিরা পর্যন্ত, তাঁর কেমন দিশেহারা লাগে। তাই একদা দুর্বোধ্য গীতা-উপনিষদ-চণ্ডীও তাঁর কাছে সহজ মনে হচ্ছে। প্রাণপণে কোনও একটা চেনাজানার সূত্র আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন। নয়তো পুরো পৃথিবী ও জীবন, সংসার কাজকর্ম সব কেমন অনর্থক হয়ে যায়।

মায়ের দিকে পূর্ণ চোখে তাকিয়ে সে বলল— বাথরুম থেকে আসছি মা।

ধারাযন্ত্র থেকে জল পড়ে অজস্র ধারায় আর সে বলতে থাকে, জপ করতে থাকে— ঈশা, ঈশা, ঈশা। মা চণ্ডী, মা কমলা, মাতঙ্গী, মা মহিষাসুরমর্দিনী, বগলা, কালী, পৃথিবীর, পৃথিবীর ওপরের স্তরের যত মাতৃশক্তি আছ তোমরা তোমাদের ঈশাকে রক্ষা করো। ঈশা মাত্র অংশত আমার, কিন্তু তোমাদের অংশে যেমন বেদবতীর জন্ম, রঞ্জাবতীর জন্ম, তেমন ঈশারও জন্ম। তোমরা কী করে অপমান, অনাদর সহ্য করবে? ঈশার অপমান কি তোমাদেরও অপমান নয়? তোমরা যদি সাহায্য না করো, আমার একার কী সাধ্য! বলতে বলতে বলতে বলতে রঞ্জা ক্রমশ বাড়তে লাগল, লম্বায়, চওড়ায়। ভেতরের আত্মবিশ্বাসে। তার মুখ বদলে যেতে লাগল। শ্যামলা রং, কখনও ঘোর কালো, কখনও হলুদ বর্ণ ঘামতেল মাখা। কখনও হিমাদ্রিশুভ্র। কখনও বারিধিনীল। দেবতারা যেন

তার দশ হাতে দশ প্রহরণ সরবরাহ করতে থাকলেন। চতুর্দিকে ধূপের গন্ধ, ধুনো-গুগ্‌গুলের গন্ধ। পুজোর নানা উপচারের, নৈবেদ্যের আতপ চাল ও ফলফুলুরির গন্ধ। রঞ্জা নিজেকেই নমস্কার করতে থাকে শেষ পর্যন্ত— নমো রঞ্জে, নমো রঞ্জে। রঞ্জাবত্যৈ, সর্বার্থসাধিকে। যা দেবী সর্বভূতেষু রঞ্জাবতী রূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমহ্‌।

দরজায় টোকা পড়ছে।

—রঞ্জু তোমার হল? কতক্ষণ চান করবে?

—যাই বউদি।

ছোট চুল সম্পূর্ণ ভিজিয়ে মাথায় তার নিজস্ব হলুদ তোয়ালে স্বর্ণমুকুটের মতো জড়িয়ে, লাল চোখ, সিক্ত, স্নাত রঞ্জা বেরিয়ে আসে।

—কী কাণ্ড! তোমার যে চোখ টকটকে লাল হয়ে গেছে।

—বড় গরম, বড় নোংরা, ধুলো, ময়লা বউদি...

বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা। বড় বিবমিষা, বড় কাদা, নিষ্ঠুরতা... এগুলোকে পালটে নিয়ে বলল সে। কিন্তু এমন একটা করুণ ব্যাকুল অথচ ওজোময় ভঙ্গিতে বলল যে বউদি অবাক হয়ে রইল।

খাটো গলায় জিজ্ঞেস করল— সুবীরের সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছ?

—সুবীর? কেন? তুমি কি পাগল হলে?

বউদির দোষ নেই। সুবীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বড়ই কথা কাটাকাটির। যত দিন যাচ্ছে সুবীরের ইগো এবং তাকে সব ব্যাপারে দায়ী করার প্রবণতা বাড়ছে। বুবুনের চলে যাওয়া তাদের উভয়ের জীবনে একটা প্রলয়ংকরী ঘটনা। কোনও দিন তারা ভুলতে পারবে না। কোনও দিন যন্ত্রণা থামবে না। কিন্তু কষ্টের প্রকাশ দুরকম।

—তোমারই জন্যে। সুদ্ধু তোমার জন্যে। —স্কুলে আলুকাবলি, চাট, ফুচকা খাওয়ার পয়সা না দিলেই চলছিল না? —সুবীর বলে। যেন যন্ত্রণার সমস্ত ভার, ছেলের মৃত্যুর পুরো দায় রঞ্জার ওপর চাপিয়ে দিলে তার শোক কমবে। এসব সময়ে সে ভাবে না রঞ্জা মা। ছেলেটার জন্ম দিয়েছিল বড় কষ্ট করে।

কেউ জানে না কোথা থেকে এই মারাত্মক সংক্রমণ হয়েছিল। রাশি রাশি বাচ্চা খাচ্ছে, তাদের কারও কিছু হল না, হল একমাত্র ওরই? ডাক্তার একবার বলেছিলেন— স্পট করবেন কী করে, বাচ্চারা তো কত কুপথ্যই খায়। ধুলোমাটিও খায়, নোংরা হাত না ধুয়েও খায়, এসব ভেবে লাভ নেই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি, ফেলিওর।

রঞ্জা কার ওপর তার রাগ ঝাল ঝাড়বে? সে শুধু কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। কাজ কাজ আর কাজ। মাঝে খুব সামান্য অবকাশ। ইতিহাসের ধারা, সভ্যতার মহাধারা খুঁটিয়ে লক্ষ করার কাজ। এই হাজার হাজার বছরের তুলনায় আমি, আমার জীবনই বা কতটুকু আর আমার শোকেরই বা সেখানে বুদ্‌বুদের চেয়ে বেশি কী অস্তিত্ব আছে! বুবুন ভয় নেই বাবা, আমি আসছি। আর কত দিন? দশ বছর, বড়জোর কুড়ি... কিছুই নয়। তারপর আমি ইতিহাসবেত্তা স্কলার নয়, শুধু গৃহিণী নয়, প্রিয়া নয়। শুধু মা, শুধু জননী হয়ে তোর কাছে যাব। দু হাত বাড়িয়ে কাছে আসিস। শুনেছি তো আমাদের কুড়ি বছর সেখানে সামান্য কয় পল! এই কটা দিন অপেক্ষা করে থাক, তারপর আমরা শুধু মজা শুধু হাসি শুধু খেলায় কাল কাটাব। এটাই তার সান্ত্বনা, যন্ত্রণার প্রলেপ। তারও তো পঞ্চাশ হয়ে গেছে, দুর্ভাগ্য হলে দীর্ঘতর জীবন, না হলে টুক।

জীবনকে ভালবাসার মন্ত্র জপ করে সবাই। জীবন কত সুন্দর, পৃথিবী কত সুন্দর। জীবন এতই মোহময় যে শত কষ্ট সত্ত্বেও মানুষ তাকে আঁকড়ে থাকে। রঞ্জার তেমন মনে হয় না। হ্যাঁ পৃথিবী খুব সুন্দর, জীবনকে ভাল না বেসেই বা মানুষ যাবে কোথায়। তার জন্য এত আয়োজন! ভুলে যাও সব, যা কিছু দুঃখ, দুর্দশা, অপমান জীবনে ঘটেছে কালের প্রলেপে সব বিস্মরণ হয়ে যাবে। সে ওই ধ্বংস আর বিস্মরণের সাক্ষ্য প্রতিদিনকার কাজে-কর্মে পায়, বারবার পায়। কোথায় গেল সেই দিন যখন বৃদ্ধ আর্কিমিডিস সিরাকুজের রাজার দরাজ দান-বাসনার উত্তরে বলেছিলেন— দিতে হলে শুধু সরে দাঁড়াও। সূর্য আড়াল কোরো না। আমার চিত্রগুলো ভাল দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেলেন সক্রেটিস, বুদ্ধ, রৈক্ক, খ্রিস্ট, কোথায় গেলেন এই সাম্প্রতিক সূর্যপ্রতিম

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। কোথায় গেল সেই সব বিশাল বিশাল সভ্যতা! সুমেরু, গ্রিক, রোম্যান, বাইজানটাইন, সিন্ধু সভ্যতা। ঝুলন্ত উদ্যান আর পিরামিডের গরিমা অস্তাচলে। হাম্মুরাব্বি, তৈমুর লং, এই সব বর্বর বীর যারা সভ্যতা কাঁপিয়ে দিয়েছিল— তারা কোথায়?

প্রায় তিন হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা মায়াসভ্যতা শেষ হয়ে গেল ঠিক দু বছরের মধ্যে, ১৫১৯-এ কর্টিজ পা রাখলেন অ্যাজটেক রাজধানী নগরে। প্রতিনিয়ত নরবলি, আর আনুষ্ঠানিক বানানো যুদ্ধের ভয়ংকর রক্তপাতে সিক্ত মায়াসভ্যতা স্প্যানিশদের হাতে আরও রক্তস্নান করে শেষনিশ্বাস ফেলল। ইজিপ্টের গর্ব ধুলোয় মিশে গেল অ্যাসিরীয় অসুর বানিপালের আক্রমণে। লুটের সোনাদানা মণিমুক্তোয় ইন্দ্রপুরীর মতো সাজপরা নিনেভ, নিমরুদের প্রাসাদ? তারাই বা আজ কোথায়? সব শক্তি, রণহুংকার, এবং এবং সব মহাবলী, মহাপুরুষ স্মৃতির অতলে চলে যাচ্ছেন। সেই সব ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন নতুন রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার মুখ— হিটলার, চার্চিল, সাদ্দাম, বুশ, ওসামা-বিন-লাদেন...।

আর আমরা সাধারণ মানুষ? সংখ্যায় বেঁচে থাকি, সংখ্যায় মরে যাই। জীবনমৃত্যুর মাঝখানটুকুতে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ঘটে না। কিছু যা অন্যরকম, যা বিশেষ। চলমান এই জীবনধারার শেষ পর্যন্ত কি কোনও মানে আছে? সুতরাং মরজীবনের অতীত কোনও মায়াময় ছায়া-জীবনের প্রতি বিশ্বাস রেখে যাই, সেখানে হরিপদ কেরানির সঙ্গে অসুর বানিপালের কোনও ঝগড়াও নেই, তফাতও নেই, সেখানে সেই লোকে মায়েরা ফিরে পায় তাদের শিশুসন্তানদের। শিশুরা ফিরে পায় মায়েদের। কেননা সাদ্দাম, হাম্মুরাব্বি না থাকলেও জীবন চমৎকার চলে যায়, কিন্তু মা আর সন্তান একটা অচ্ছেদ্য যুগ্ম। দুয়ে মিলে এক। না হলে জীবন স্তব্ধ।

বেদবতী বললেন—কতক্ষণ ধরে চান করলি রঞ্জা। এত তোর গরম?

—গরম নয় মা। দাহ।

—এখনও দাহ আছে? থাকবে কত দিন? তোর কত দিন বন্ধ হল?

—তা বছর পাঁচ ছয় তো হবেই।

—কারও কারও অমন হয়। গরম যেতে চায় না। আমার মনে হত মাথার ওপর কে আগুনের কড়া বসিয়ে দিয়েছে। আমাদের সময়ে কেউ গ্রাহ্য করত না। আজকাল তো অনেক ওষুধ-বিষুধ বেরিয়েছে। খেলেই তো হয়!

খাটে বসা মায়ের কোলে রঞ্জা মাথাটা গুঁজে দিল, বলল—এই আমার ওষুধ মা।

ভিজে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন—অত চুল, এমন করে কেটে ফেললি? একটু মায়া হল না রে?

—কলজে দু টুকরো হয়ে গেল, কিছু করতে পারলুম না মা। তায় সামান্য চুল!

মা চুপ করে গেলেন।

ছেলে গেছে এক, মা গেলেন সেদিন, নাতি যে পরের জেনারেশন—সেও গেছে। তবে বেদবতী কেন বেঁচে আছেন? বিষাণ খোকাকে নিজের আয়ুটা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করেছিলেন, বাবর যেমন হুমায়ুনকে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর তেমন পুণ্যফল নেই। তাই পারেননি। এখন তিনি নিবিড় গভীর এক ছায়ার মধ্যে একাকী বাস করছেন। গহন, জনহীন প্রান্তর এক, বৃক্ষশূন্য। তবু ছায়াময়। কিছু থাকার ছায়া নয়, না থাকার, নাস্তির ছায়া। সেই ছায়ার গভীর থেকে তিনি একটি বর্ণহীন শীতল হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেয়ের মাথার ওপর, হাতের ওপর, পিঠের ওপর। কেন তিনি এই সব ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন? প্রথম পুত্র সঞ্জয় ও প্রথম কন্যা মঞ্জুলিকা ছাড়া প্রত্যেকটি অবাঞ্ছিত সন্তান। তিনি দুঃখের সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করেন। প্রথম সন্তান সঞ্জয় এল, নতুন মাতৃত্বের স্বাদে তখন তিনি গর্বে আনন্দে একরকম হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক কথা। জননী? তিনি জননী? ষোলো বছরের সদ্য প্রস্ফুটিতা তরুণী, নিজেকে অপূর্ণ ভাবতে শিখেছিল। আশপাশে সকলেই বলত কিনা, তি-ন বছর বিয়ে হয়ে গেল? এখনও পোয়াতি হল না, বাঁজা নাকি? সঞ্জয় সেই স্বস্তি। সেই প্রথম নিজের 'নারীত্ব' জিনিসটার স্বীকৃতি। তারপর একটা শিশুর দেওয়া কুটি-কুটি আনন্দের

খনি তো আছেই। পরের বছর অন্তঃসত্ত্বা হলে, প্রথমবারের কষ্টের কথা মনে করে একটু ভয়, আবার একটু লজ্জা লজ্জা করেছিল, হল আবার ছেলে—রঞ্জিত, দুই পুত্রের জননী, এয়োতি পুত্রবতী বলে তখন খুব খাতির। তৃতীয়বার গর্ভ হল দুবছর পর। রক্তশূন্যতায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে। মরি-বাঁচি করে জন্ম দিলেন মঞ্জুলিকার। ফুটফুটে কন্যা। আরেক রকমের আনন্দ, আদর, খাতির। কিন্তু তারপর আর চাননি। শরীর ভেঙে যাচ্ছে তবু স্বামী শুনছেন না, প্রবৃত্তির হাতে তিনি অসহায়, ক্রুদ্ধ। রঞ্জা হয়ে রঞ্জনকে দিয়ে ফুল স্টপ। এদের তিনি চূড়ান্ত অনিচ্ছায় সংসারে এনেছেন। আসার পরে কি আর খারাপ বেসেছেন? রঞ্জা তো ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে কথা নয়। তাঁর যেটা বিবেকে লাগে, এদের তিনি অনিচ্ছায় জন্ম দিয়েছেন। আর পিতা-মাতার সেই প্রবৃত্তিমূলক অসহায়তার কুক্ষণে জন্ম এদের। এদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব যেন তাই আরও বেশি। কই, কাউকে সুখী করতে পারলেন না তো! ওদের অসুখ, ওদের দুঃখ তাঁকে মর্মাহত করে। তিনি দায়ী। আর যিনি দায়ী ছিলেন, তিনি তো সুতো ছিঁড়ে পালিয়েছেন। দুঃখ, দুঃখ, অ-সুখ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে ॥

পড়া আছে। অর্থও জানেন। কিন্তু জীবনে তো সে উপলব্ধি হল না। যা হল তা হচ্ছে :

দুঃখ হেথা দুঃখ হোথা, দুঃখ থেকে দুঃখই গজায়।
দুঃখ থেকে দুঃখ নিলে তলানিতে দুঃখই থেকে যায় ॥

উপনিষদের বাণীর ঠিক বিপরীত। এসব তাঁর ডায়েরিতে আজকাল লিখে রাখেন তিনি। পছন্দসই বা ভাববার জায়গাগুলোর অনুবাদও করেন। কেউ জানে না তাঁর এই গুপ্ত খাতার কথা।

তিনি বুঝলেন রঞ্জা ফুলে ফুলে কাঁদছে। এ কি বারো বছর আগে মৃত সন্তানের শোকে? নাকি কোনও নতুন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে!

বেদবতী বললেন—কী হয়েছে রঞ্জা, আমায় বল। বলবি বলেই তো এসেছিস!

রঞ্জা মুখ তুলল, বলল—না মা, কিছু বলতে আসিনি। শুধু তোমার কাছে থাকতে এসেছি। হঠাৎ কেমন ভীষণ মন-কেমন করে উঠল। তুমি তো জানো, এরকম করলে আমি থাকতে পারি না।

—হঠাৎ!

—হঠাৎই! একদম হঠাৎ।

বেদবতী সে কথা বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু আর চাপাচাপিও করলেন না। ওদের সমস্যার সমাধান তিনি কি আর করতে পারবেন? খুব জটিল জীবন, সমস্যাও তাই জটিলতর। তিনি শান্ত মানুষ বলেই সবাই জানে। সর্বংসহা। মা সর্বমঙ্গলার মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী নয়। তাই-ই হয়তো রঞ্জা কিছু বলতে চাইছে না। নিজের সমস্যার সমাধান সে নিজেই করবে, শুধু মায়ের কাছ থেকে নীরবে সান্ত্বনা, সহায়তা, শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছে।

ছোটবেলায়, কিশোরবেলায় হঠাৎ কোনও শীতের সন্ধেয় স্কুল বা কলেজ থেকে কেমন আনমনে ফিরত মেয়ে। একদিন গেল, দু দিন গেল, তারপর তৃতীয় দিন মায়ের কোলে মুখ গুঁজে এমনি কান্না। কী হয়েছে রঞ্জা? কাঁদছিস কেন? কেউ কিছু বলেছে?

বলে তো অনেকেই। ছেলেমানুষের হৃদয়ের কথা তো কেউ ভাবে না। বলে দিল—ওমা, সঞ্জয় নাগের বোন তুমি? ও তো দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছিল! কিংবা বলল মঞ্জুলিকা নাগের বোন? ও তো খুব সুন্দর ছিল! কিংবা তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এগুলো তো সাধারণ। ধরতে ছুঁতে পারা যায় না। কত দৃষ্টির ভর্ৎসনা, ঔদাসীন্য, কত আচরণের স্থূলতা আছে মানুষের! জিজ্ঞেস করলে রুদ্ধ গলায় রঞ্জা বলত—জানি না মা, মনটা কেমন কেমন করছে। কাঁদি একটু, হ্যাঁ?

তিনি সস্নেহে বলতেন—সেই ভাল। প্রাণভরে কাঁদ, কেঁদে নে। 'কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ!... এবার তুই একলা বসে পরাণভরে কাঁদ! পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।' গানটা তাঁর বড় প্রিয়, তাঁর

অকালমৃত বড়দি লীলাবতী অপরূপ গাইতে পারতেন। কী যে ভরে দিতেন তিনি গানটাতে। তাঁর সদ্যবিবাহিত জীবনের যাবতীয় বেদনা, যাবতীয় আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা সংগীতে রূপ পেত। কেঁদে আকুল হয়ে যেত লোকে সে গান শুনলে। শুধু জামাইবাবু আর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মন গলত না। 'আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার/ একাকী বাহিতে তারে পারি না গো আর।' এসব গানের তীব্র গভীর আকুতি তাঁদের কাছে বিপজ্জনক ঠেকল। গানটাও তাঁর কেড়ে নেওয়া হল। লীলাবতী বাপের বাড়িতে হয়তো বছরে দুবার কি তিনবার আসবার অনুমতি পেতেন—তখন গাইতেন। তাঁর দু চোখ দিয়ে ধারা নামত।

চলে গেলেন। মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে লীলাবতী এই বদরসিক পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।

বেদবতীর গলায়ও সুর ছিল। দিদির মতো নয়। কিন্তু ছিল। কিন্তু দিদির দুর্দশার উদাহরণ সামনে নিয়ে তাঁর মা-বাবা তাঁকে গানে উৎসাহ দিতে আর সাহস করেননি। যদিও কলের গানের রেকর্ড থেকে তিনি অনেক গানই গলায় তুলে নিয়েছিলেন। একা ঘরে, একা ছাতে, একা কলঘরে গাইতেন।

হঠাৎ রঞ্জা মুখ তুলল—মা, তুমি আজকাল আর গাও না?

মজা হচ্ছে, বেদবতী শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখলেন সেখানে গানের বেশ কদর। বিশেষ করে শ্যামাসংগীত। শ্বশুর গাইতেন, স্বামী গাইতেন। তখন তিনিও ধরলেন—আর কতকাল রইব বসে, দুয়ার খুলে বঁধু আমার...। কেউ বেরসিকের মতো জিজ্ঞেস করল না বঁধুটি কে, যার জন্য তুমি বসে আছ?

রঞ্জা বলল—একটা গান গাও না মা, সেই যে তুমি একটা অতুলপ্রসাদ গাইতে! ভৈরবীতে বোধহয়!

বেদবতী সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন কোন গানের কথা রঞ্জা বলছে। গান তিনি রঞ্জাকেও শেখাতে কত চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মেয়ে কাবাডি আর ব্যাডমিন্টন নিয়ে মত্ত। অল্প বয়সটা খেলে কাটাল, তারপর মেডেল,

কাপ, শিল্ড-টিল্ড জিতে পড়াশোনায় মন দিল। গান যে অভিনিবেশ, ভালবাসা দাবি করে, রঞ্জা গানকে তা কখনওই দিল না। গানও মুখ ফিরিয়ে রইল অভিমানে। তাই সূক্ষ্ম কাজ, মোচড়, প্রাণ— এসব এল না তার হঠাৎ-গাওয়া গানে। মুড, খেয়াল শুধু। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো! —কিংবা জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয় জয় হোক। এগুলো স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে কোরাসে গাইতে হত বোধহয়।

তিনি বললেন—আমার কি আর গলায় সুর আছে রঞ্জা, ভাঙা গলা।

—তোমার ওই ভাঙা গলার গানই শুনব মা। গাও না!

ফিসফিস করে তিনি গাইলেন—'একাকী বাহিতে তারে পারি না গো আর/ আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার।' কতবার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। দম ছুটে গেল, সুর ফসকে গেল, কথা ভুল হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের শান্তির জন্য এসব তিনি অগ্রাহ্য করলেন। মেয়ের জন্য মা কী না করতে পারে! এ তো কিছুই নয়। তা ছাড়া গান তো শুধু সুর নয়। শুধু কথাও নয়। সে শুনছে তার অল্প বয়সে শোনা মায়ের সেই সংগীত। নির্ভুল শুনতে পাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আজকের এই ভাঙা গলার সুর ফসকানো গান, যেন সারাজীবনের স্বরলিপি এতে লেখা। সেই সমস্তটা—মায়ের জীবনের সমস্ত, তার জীবনের সমস্ত, ঈশার জীবনের সমস্ত সুর-বেসুরের হিসেবনিকেশ যেন এই ভাঙা গলায় পেশ করছেন সুরের হিসেবি কোনও তবিলদার।

গান শেষ করে সামান্য হাঁপাতে লাগলেন বেদবতী। রঞ্জা মায়ের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আশি, সামান্য বয়স! নিদারুণ পরিশ্রমের, বিরাম বিশ্রামহীন, বৈচিত্র্যহীন। রুটিনে বাঁধা আশি বছরের ভার। —তোমায় কষ্ট দিলুম মা!

—না কষ্ট কিছু না। একটু দমের অসুবিধে হয়। তা ছাড়া আমি তো চণ্ডী সুর করেই পড়ি রোজ।

বউদি এসে বলল—এবার মা-মেয়ে দুজনেই খেয়ে নাও। রঞ্জা, মা বিকেলবেলা আজকাল চা পর্যন্ত খাচ্ছেন না।

—সে কী? মা!

—কী জানি, মুখে ভাল লাগে না রে। একটু শরবত করে দেয় সীমা, বেশ তো লাগে!

—পৌনে দশটা বাজল মা আজ। —বউদি বলল।

তিনজনে খেতে বসল। দাদার হয়ে গেছে। ছেলে ইন্টারভিউ দিতে বাঙ্গালোর গেছে। বারান্দা থেকে দাদার সিগারেটের গন্ধ আসছে। বউদি উঠে গিয়ে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল।

খাবার নিয়ে মা শুধুই নাড়াচাড়া করছেন। কপালে সামান্য বিরক্তির কোঁচ।

—মা তোমার খিদে নেই? ভাল লাগছে না?

বউদি বলল—মায়ের আজকাল আমার রান্না মুখে রোচে না। তুমি যদি কাল থাকো তো কিছুমিছু রেঁধে দিয়ো তো! কতরকম করে দিচ্ছি, সবই ওইরকম। বউদির গলার স্বরে নালিশ, ঝাঁজ। সামান্য কিন্তু নির্ভুল।

মা বললেন—আমি তোমায় কতবার বলছি বউমা, দোষ তোমার রান্নার নয়, আমার জিভের। কী যে মুখপোড়া জিভ হয়েছে!

—তা হলে ডাক্তার দেখালেই তো হয়! একটু দেখে—

—থাম রঞ্জা, এই বয়সে আর খাওয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে ধরনা দিতে হবে না।

—এইগুলো তোমার অ্যাটিটিউডের ভুল মা। অরুচি ইজ অরুচি। বয়স যা-ই হোক, অরুচি যখন হয়েছে তখন ডাক্তার দেখাতে হবে, ওষুধও খেতে হবে...

রাত অনেক। বারোটা তো বেজে গেছেই। বেদবতী এপাশ-ওপাশ করছেন।

—ঘুম আসছে না, মা?

—নারে। এমনিই তো হয় আজকাল, তবু তো আজ তুই এসেছিস। কাছে রয়েছিস। কত শান্তি! ঘুম আসে না, হয়তো একবার একটু এল... তারই মধ্যে শিরদাঁড়া দিয়ে সড়সড় করে একটা ভয় ওঠানামা করে সাপের মতো। কীসের ভয়? জানি না। মরণকে তো তুঁহু মম শ্যামসমান বলে ডাকছি। এ মৃত্যুভয় নয় রঞ্জা, কী ভয়, কেন জানি না। খালি মনে

হয় এই পৃথিবী একটা বিশাল আদি অন্তহীন মাঠ। তার মাঝখানে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। প্রাণপণে ডাকছি—কোথাও কোনও সাড়া নেই। বড্ড ভয় করে। মনে হয় কেউ কাছে থাক। যে হোক কেউ। আজ বড্ড ভয় করছিল তাই আর আমার গীতা শেষ হচ্ছিল না। তুই এলি। গীতার দেবতা আমার প্রার্থনা শুনলেন। আজকে যে আমার কী স্বস্তি। ঘুম না-ই হল। তোর একটা হাত গায়ের ওপর রাখ, সেই ছোটবেলাকার মতো।

রঞ্জা পাশ ফিরে আলতো করে মাকে জড়িয়ে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল যুবতী মাকে। এখনকার চোখ দিয়ে যুবতী মাকে দেখতে পেল সে। এমন আপাদমস্তক মাতৃত্বময় মানুষ কমই দেখেছে সে। সুন্দরী নয়। কিন্তু ভীষণ লাবণ্যময়ী। আর স্পর্শটা কী শান্তির। গরমকালে ঠান্ডা, শীতকালে উষ্ণ। পদ্মিনী নারীদের নাকি এটা একটা লক্ষণ। কত বড় বয়স পর্যন্ত এই মায়ের স্পর্শ, গন্ধ, মায়ের রূপ, গলার স্বর জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি ছিল। কবে থেকে হৃদয় অন্য স্পর্শ খুঁজল, মায়ের রূপ, স্বর-এর স্বর্গীয় পৃথিবী থেকে সে স্বেচ্ছানির্বাসন নিল! মোটের ওপর সব মানুষেরই এমনটা হয়। কিন্তু সবার স্মৃতিতে এ ভাবে সেই সব ইন্দ্রিয়সুখ টাটকা থাকে না। তার আছে। সে সারারাত ধরে মার বার্ধক্যকুঞ্চিত ফ্যাকাশে দেহটি জড়িয়েও মসৃণ যুবতী মাতৃ স্নেহশরীরের স্পর্শ পেতে লাগল। চোখের সামনে ভাসছে শান্তিপুরি শাড়ির আঁচলের চাবির গোছা মা সশব্দে পিঠে ফেললেন। মা ডাকছেন—মঞ্জু, রঞ্জা, দাদাদের ডাক। খাওয়ার সময় হয়েছে—এ-এ। কে জানে কীসের সময়! খাওয়ারই, না অন্য অজ্ঞাত কিছুর! ঘুমের মধ্যে, ভোরের ঘুমের প্রশান্ত অতলে রঞ্জা অনুভব করল সে মাতৃনাম জপ করছে। মা মা মা মা...।

নিমেষ

অন্ধকারের রহস্য যবনিকা এইমাত্র পৃথিবীর ওপরে নেমে আসা সাঙ্গ হল। কঠিন রজনী। অমানিশা। ক্যালো আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বেরিয়ে আসছে। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে এককেটা।

অর্যমা বলল—দেখো রঙ্কা সবগুলি তারা মিটমিট করে না। কয়েকটি নিষ্পলক থাকে। ওই দেখো লালচে তারাটি, ওর দীপ্তি আছে। অস্থিরতা নেই। দেখো রঙ্কা চাঁদ উঠলে এত তারা দেখা যায় না। কেন বলো তো! চাঁদের আলো তীব্রতর, তাই তারাদের অল্প আলো হারিয়ে যায়, যেমন রঙ্কার আলোয় আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে নিমেষ... মধুরা...।

চট করে ফিরে চাইল রঙ্কা—এ কথার মানে? রঙ্কা কোথাও চন্দ্র হতে চায় না। কাউকে ঢাকার ইচ্ছে তার নেই। এমন কথা আর বোলো না অর্যমা। মধুরার হাতে প্রাণনাশের ইচ্ছেও আমার নেই।

অর্যমা শব্দ করে হাসল—কথাটা তুমি বুঝতে পারো তা হলে! আমি ভেবেছিলাম তুমি কিছুই বোঝো না।

রঙ্কা কথা বলল না। দুজনে চুপচাপ বসেই থাকে, বসেই থাকে, তারাদল মৃদু আলো বর্ষণ করতেই থাকে, করতেই থাকে। ধন্যা ছলচ্ছল বলতেই থাকে, বলতেই থাকে।

রঙ্কা আসলে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত মনে করতে পারে। ভাবতে পারে। নিমেষের ওপর তার প্রকাণ্ড একটা রাগ হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক, আত্মগর্বী, আক্রমণাত্মক মানুষদের সে পছন্দ করে না। আবার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে, একটু কৃপার জন্য কেন্নোর মতো করতে থাকবে—এরকমও তার পছন্দ নয়। তার পছন্দ ভগর মতো মানুষ। আলোর মতো। যেখানে যাবে নিয়ে যাবে শুশ্রূষা, আরোগ্য, আশ্বাস। গভীর চোখ, কেমন উদাসীন। ভাবুক-ভাবুক। যখন রঙ্কার কাছে আসে, আসে দেবতার মতো, দেবতা যেন প্রসাদ দিচ্ছেন ও অর্ঘ্য নিচ্ছেন। অর্যমা থাকলে সে কখনও আসে না, তার জন্য রঙ্কা কৃতজ্ঞ। তারা তো আর বনের পশু নয় যে সবার সামনে মিলিত হতে বাধবে না। সে অন্তত নয়। অর্যমাকেও সে আলিঙ্গন

দেয়। কিন্তু তাতে ততটা সুখ থাকে না, আবেগ থাকে না, যতটা থাকে প্রীতি। সে যাই হোক, নিমেষকে ওই ভাবে অস্ত্র প্রহার ও আহত অবস্থায় বনের গভীরে ফেলে আসা তার পছন্দ হয়নি। হিংসা, বলপ্রয়োগ— এসব তাকে পীড়িত করে। তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রকে মধুরা এমন শাস্তি দিল কেন? মধুরার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মুখভাব কুটিল। সে দলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। ঠিক আছে। কোনও একজন দল-সদস্যের অযথা অপমানের বিচারও করতে চাইছিল। ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু একটা ছিল, সেটাই সে মনে করবার চেষ্টা করছে। কী? কী? কী? তার কথার উত্তর দিল অর্যমা—প্রতিধ্বনির মতো।

—মধুরা তোমার গুণ বোঝে, কিন্তু হিংসাও করে।

—হিংসা? তুমি ঠিক জানো? অর্যমা, আমি মাতঙ্গীর মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তো মধুরার নেত্রীত্ব মেনে নিয়েছি।

—মানা না মানার কথা নয়। কথা হল ক্ষমতার। রঙ্কা তুমি যখন চলো ফেরো, যখন কোনও আশ্চর্য কাজ করো—লক্ষ্যভেদ, কি রন্ধন, ভগর কথামতো সেবা, বা আমার কথামতো চন্দ্রসূর্য গণনা, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে, মুগ্ধ হয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। দলের পুরুষগুলি সব তোমাকে চায়।

রঙ্কা আশ্চর্য হয়ে বলল—তুমি তো সর্বদা আকাশমুখো হয়ে থাকো, এত কখন দেখলে? বুঝলে?

—অর্যমার চোখ আকাশে থাকে বটে, কিন্তু সারা পৃথিবী, সমস্ত মানুষ তাদের কর্ম, উদ্দেশ্য তার কাছে সহজে প্রতিভাত হয়। রঙ্কা, চন্দ্রমা উদিত হয়েছে। তার আলোয় হারিয়ে যাচ্ছে মধুরা। অনেক চন্দ্রসূর্য তো পার করল। আমি যখন জন্মেছি তখন মধুরা নিশ্চয় বাকল পরা শুরু করে দিয়েছে।

পেছনে শব্দ হল, দুজনে চমকে তাকায়। ভগ দাঁড়িয়ে। বলল—নিমেষ গভীর বনে পরিত্যক্ত, বিক্ষত। আমি সেবক, যাচ্ছি, আহত মানুষকে পশু ছিঁড়ে খাবে, ভগ তা সইতে পারবে না। অর্যমা তুমি তির-ধনু নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

রক্ষা বলল—আমিও যাব। আমি জল, কিছু খাদ্য নিয়ে যাই।

ভগ বলল—রক্ষা আমি সুখী। তোমার মধ্যে আস্তে আস্তে মহত্ত্বের সঞ্চার হচ্ছে।

যারা মধুরার কথা মেনে নিমেষকে নির্বাসনে রেখে এসেছে, তারা দয়া করে তাকে উন্মুক্ত স্থানে রাখেনি। রেখেছে একটি ঘন বৃক্ষ ও লতা দিয়ে আচ্ছাদিত স্থানে। প্রথমটা নিমেষের সংজ্ঞা ছিল না। কিন্তু সে অমিতবল পুরুষ। শিগগিরই তার জ্ঞান ফিরে আসে। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল তার দুই বাহুতে। তার মনে পড়ছিল আবছা আবছা সেই দৃশ্য। অনিচ্ছুক রক্ষাকে সে চুল ধরে বাইরে টেনে আনছে। প্রহার করছে যথেচ্ছ। একবার তার ক্রোধ হয়, আরেকবার করুণা। মধুরা? শেষ পর্যন্ত যে মধুরা তাকে অশেষ প্রশ্রয় দিয়েছে, তার অন্তত ৬/৭টি সন্তান তারই, এ কথা স্বীকার করেছে, সেই মধুরা তাকে নির্বাসন দিল? সে যেন কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। হাত দুটি অসাড়। তার পাশ দিয়ে সাপ চলে গেল একটা। ওপরে বানরের কিচিমিচি। এই ভাবেই আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। লতাজালের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে তারায় ভরা আকাশ। নিমেষের শিশুকালের কথা মনে পড়ে। সে ও মধুরা কাড়াকাড়ি করে বর্ণার দুধ খাচ্ছে, মধুরা বড়, তার বল বেশি। সে এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিল। বর্ণা বলছে—বীর্য কোথায় তোর, ছেলে? যার বীর্য বেশি সে পাবে, কেড়ে খাবে। গাছের ওপর এক ডাল থেকে আরেক ডাল, এক গাছ থেকে আরেক গাছ অনায়াসে ছুটে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে পার হত মধুরা, তাকে ডাকত, আয়। আয়রে নিমেষ, আমাকে অনুসরণ কর। এই ভাবেই সে বানরের মতো বৃক্ষচারী হতে শিখেছিল। ফোঁস করে উঠেছে সাপ। ফণা ধরেছে। টুক করে তার গলা বজ্রমুঠিতে ধরে ফেলল মধুরা। সাপটা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। এবার ছুরি দিয়ে সাপের মুন্ডুটা সে কেটে-ফেলে দিল, তারপর গাছের তলায় আগুন করে সাপটি পুড়িয়ে খেল। সাপ-পোড়া মধুরার বিশেষ প্রিয় ছিল। একটি বিরাট বানরের চড় খেয়েছিল সে একদিন, মুন্ডু ঘুরে গিয়েছিল। মধুরা দু গালে চড় মেরে মেরে মুন্ডুটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে

আসে। কুট করে একটা শব্দ। যন্ত্রণার অবসান। সেই বানরটাকে তির দিয়ে মেরে ফেলেছিল মধুরা। অশ্ব আবিষ্কার কিন্তু নিমেষই প্রথম করে। বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা মাঠে চরছে! আরে! বড় বড় গাধার মতো—এগুলি কী? সে গাছের ওপর থেকে লাফ দিয়ে একটার ওপর চড়ল। সজোরে আঁকড়ে ধরেছে চুল! ছুটছে ছুটছে। লতাপাতা মাড়িয়ে, মাঠ পার হয়ে অবশেষে ঘন বনের ধারে এসে থমকে গেছে। নাক দিয়ে ঝড়ের মতো নিশ্বাস বেরোচ্ছে।

নিমেষ, নিমে-ষ, তুমি কোথায়? নিমে-ষ, তুমি কি বেঁচে আছ? সাড়া দাও নিমে-ষ! —কে ডাকে? ভরাট গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ। নিমেষ! নিমেষ...

প্রাণপণে বল সঞ্চয় করে সাড়া দেয় নিমেষ।

—আমি এখানে—এ-এ-এ। আমি এখানে-এ-এ।

ক্রমশ পাতা মাড়ানোর খড়মড় মচমচ শব্দ কাছে, আরও কাছে আসতে থাকে। সে দেখে একটি আলোর মতো মুখ। মুখটি নিচু হয়ে তাকে বলে —ওষধি দিচ্ছি, নির্ভয়ে খাও নিমেষ, যন্ত্রণা চলে যাবে।

নিমেষ হাঁ করে। আস্তে আস্তে আবছা হতে হতে হারিয়ে যায় স্মৃতি। বর্তমান, বনভূমি, রাত, আলো, অন্ধকার সব।

তির দুটি একটানে তুলে ফেলে ভগ। তিনফালা হাঁ করা গর্ত। তার মধ্যে পুঁটলি করে ওষুধ পোরে অর্যমা, রঙ্কা পরিষ্কার জল ফোঁটা ফোঁটা ফেলে ঈষৎ হাঁ করা জ্ঞানহীন মুখে। দেহটি পরিষ্কার করে। তারপর তিনজন মিলে খাটুলি বানায়। সাবধানে তোলে।

—কোথায় নিয়ে যাব?

—আমাদের কুটিরে।

—সে কী? ওর যে নির্বাসন!

—তা-ও বটে। এক কাজ করো, —অর্যমা বলে—আমি একটি গুহা জানি, তার দুদিকই খোলা। লতাপাতা দিয়ে খোলা জায়গাটা বন্ধ করে...।

অর্ধেক রাত কেটে যায় নিমেষের জন্য আশ্রয় তৈরি করতে। ভেতরে মাটির পাত্রে জল রাখে, পাতার ওপর মাংস রাখে, খুব নরম করে

ঝলসানো খরগোশের মাংস। ভোরের দিকে তিনজনে চুপচাপ চলে আসে। এমনই চলে দিনের পর দিন। যত দিন না নিমেষের ক্ষত শুকোয়। যত দিন না সে বল পায়। উঠে দাঁড়াতে পারে।

নিমেষ সম্পূর্ণ সেরে গেলে ভগ বলে—এ ভূমি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যাও নিমেষ। তোমার নির্বাসন। জীবন ফিরিয়ে দিয়েছি। এরপর সে জীবনের দায় তোমার। ঘোর কুটিল দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল নিমেষ। তারপরে বলল—তোমার করুণা চাই না ভগ। আমার ইচ্ছার ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ো না। চলে যাও, নিমেষ যা মন চায় করবে।

সূর্য ঢলে, চাঁদ ওঠে। চাঁদের পর চাঁদ চলে যায়। মধুরা গোষ্ঠীর দিনকাল ক্রমশ আরও, আরও ঋদ্ধ হয়। ধান্য ফলে, কন্দমূল হয়, গাছে গাছে ফল ধরে। রঙ্কার গর্ভকাল শেষ হয়ে সুপ্রসব হয়। একটি চাঁদের কণার মতো কন্যা জন্ম নেয়। চারিদিকে হর্ষধ্বনি ওঠে। 'কন্যা এসেছে, কন্যা এসেছে। এ পৃথিবীতে আরও শিশু আনবে, বক্ষে অমৃতধারা, বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে প্রেম, মস্তিষ্কে বুদ্ধি।' মধুরার কাছে দীর্ঘদিন অস্ত্রশিক্ষা চলেছে রঙ্কার। সে এখন তির, বর্শা, কুঠার— তিনটিতেই পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে। তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ দেখে চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছে সবাই। সেই সঙ্গে সে রপ্ত করেছে ভগর বিদ্যা, অর্যমার অঙ্ক। কন্যার জননী, পূর্ণযৌবনা রঙ্কার দিকে আশা ও মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে সবাই।

সেদিন সূর্য উঠে গেছে, পাড়া খালি। রঙ্কা ওষধি মেলানোর কাজ করছে আপন মনে, দরজায় আড়াল পড়ল। রঙ্কা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে মধুরা। মধুরা অতি দীর্ঘকায়া, ক্ষিপ্রগতি, তন্বী শরীর ইদানীং একটু ভারী হয়েছে। মধুরার মুখশ্রী দৃঢ়তাব্যঞ্জক, ওষ্ঠাধর কঠিন, কপাল ছোট, দীর্ঘ চোখ দুটি।

—মধুরা—

রঙ্কা উঠে দাঁড়াল।

—বোসো রঙ্কা, ওষধি প্রস্তুতির কাজটি ভাল করে করো। এই প্রথম আমরা এমন একজনকে পেলাম যে একই সঙ্গে যুদ্ধ ও সেবা, শিকার ও

চন্দ্র সূর্য, জল, হাওয়ার রহস্য ভেদ করতে শিখেছে। রঙ্কা তুমি ধন্য।

রঙ্কা আস্তে বলল— আমার মা মাতঙ্গী পারত। মাতঙ্গী ছিল অসাধারণ।

মধুরা বলল— এখনও মাতঙ্গীকে ভোলোনি, মেয়ে?

—না, মধুরা তুমি কি বর্ণাকে ভুলে গেছ। যে মেয়ে মাকে ভুলে যায় তার কোনও বিদ্যা কাজে লাগে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মধুরা নিশ্বাস ফেলে বলল— আমরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী যদি মিলতে পারতাম! কত বীরপুরুষ, বীরনারী, গুণীজনকে গোষ্ঠীর স্বার্থে আমরা ...

নীরবে নিজের কাজ করতে লাগল রঙ্কা। একটু পরে মৃদু গলায় বলল— তুমি কি নিমেষের কথা বলছ?

মধুরা মাথা নাড়ল।

—নিমেষ বেঁচে আছে।

চমকে উঠল মধুরা। —তুমি কী করে জানলে? সে কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে? বাঁচল কী করে?

—শূন্য যদি মানুষকে না নেয়, মানুষটি যেমন করে হোক থেকে যায়। না, নিমেষের সঙ্গে কোনও যোগ আমার নেই। আমি নিমেষকে ইচ্ছা করি না। আমি ভগ ও অর্যমাকে ইচ্ছে করি। ভগ মহান, অর্যমা বুদ্ধিমান।

—আর আমি? আমাকে কি তুমি এখনও ঘৃণা করো, রঙ্কা?

—না তো! তুমি আমাকে শিখিয়েছ, রক্ষা করেছ, তুমি নেত্রী, আমি তোমাকে মান্য করি। —একটু ইতস্তত করে রঙ্কা বলল— কিন্তু তুমি আর মাতঙ্গী এক নও। আমার কাছে মাতঙ্গীর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তারপর ... তার ... পর ভগ।

—রঙ্কা তোমাকে বলতে এলাম আগামী গোল চাঁদের দিনে আমি তোমাকে নেত্রী করব।

—অ্যাঁ? রঙ্কা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁ, কিছু দিন পাশে পাশে থাকব। তারপর তুমি নেত্রী। আমি তোমায় মান্য করতে বাধ্য থাকব।

—কিন্তু কেন, মধুরা!

মধুরা হাসল। বলল— এমন দিন আসতে পারে, যেদিন তুমিই আমাকে পরাজিত করে নেত্রী হয়ে বসবে। তেমন হবার আগেই আমি সরে যেতে চাই। আমি আর বৎস ধারণ করতে পারি না।

—নাই পারলে! সে তো মাতঙ্গীও পারত না। তার শেষ বৎসটি তো তরক্ষুর পেটে গেল। আমি নেত্রী হতে চাই না মধুরা।

—তুমি না চাইলেও, অন্যরা চায়। নেতৃত্ব আপনিই তোমার ওপর বর্তাবে। ভয় কোরো না রক্ষা, আমি আছি, আর ... আর ... একটা কথা ... যখন শূন্যও নেবে না, মাটি জল বনও নিতে চাইবে না, তখন আমাকে আশ্রয় দিয়ো, রক্ষা কোরো। —বলে মধুরা বসে পড়ল। কলকল শব্দ করে তার গলা থেকে কান্না বেরোতে লাগল।

গোল চাঁদের দিন। আকাশ থেকে ঝরঝর করে আলো ঝরছে। বাতাসে সুন্দর গন্ধ। সহস্র ফুল ফুটেছে বনে। মাতাল করে দিচ্ছে সব। গাছগুলি আলোয় চান করে যেন হাসছে। ধন্যাকে নদী বলে মনে হচ্ছে না, সে যেন গোল চাঁদের ছবি বুকে নিয়ে এক বহতা আলো। মানুষগুলি সেজেছে, গলায় ফুল গেঁথে পরেছে, কানে ফুল গুঁজেছে। কোমরেও ফুলের মালা। আগুন জ্বালানো হচ্ছে মহাসমারোহে। আজকের শিকার শুধু রক্ষা ও মধুরার। তিনটি বরাহ, চারটি বিশাল হরিণ। কাটাকুটি চলছে। আজ বিশেষ ভোজ। ভারে ভারে ধান্য সিদ্ধ হচ্ছে।

চাঁদ মধ্য গগনে উঠলে, একটি টিলার ওপর উঠে মধুরা ঘোষণা করল— আজ থেকে রক্ষা তোমাদের নেত্রী, সে তোমাদের রক্ষা করবে, তোমরা তাকে মান্য করবে। সকলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। মধুরা তার নিজের বল্লম রক্ষার হাতে দিল। রক্ষা সেটি হাত পেতে নিল, তারপর সে চন্দ্রালোকিত একটি গাছ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল তার বল্লম। নির্ভুল লক্ষ্যে গাছে গেঁথে গেল বর্শা।

আবার হর্ষধ্বনি।

ভোজ শেষ হল। বেড়া আগুনের ধারে তিনজন প্রহরায় রইল, বাকি নরনারীরা পরস্পরের মধ্যে মিলনের আনন্দে মাতোয়ালা হয়ে উঠল।

শুধু কুটিরে স্তব্ধ বসে রইল মধুরা। তার আর আজকে কাউকে পেতে ইচ্ছে করছে না। জীবনভর বহু স্মৃতি। স্মৃতিতে মথিত হচ্ছে সে। বুকে কেমন অচেনা কষ্ট। তার ভাই, তার দোসর নিমেষকে সে নিজের হাতে বিদ্ধ করেছিল। নির্বাসন দিয়েছিল। সে বেঁচে আছে শুনে পর্যন্ত এক অদ্ভুত স্তব্ধতা অভিভূত করছে তাকে। আগেও ছিল এক বিস্বাদ বিষাদ, নিমেষ গিয়ে পর্যন্ত। এখন সে বেঁচে আছে শুনেও সে স্বস্তি পাচ্ছে না। কেন কে জানে! হর্ষ, তুমি এই গোষ্ঠীর সবাইকে আজ মথিত করছ, আমাকে ফেলে গেলে কেন? শূন্যকে প্রশ্ন করে সে। এই শূন্য থেকেই প্রাণ আসে। এখানেই প্রাণ লয় পায়, এই শূন্য থেকে মানুষের বুকে নামে আনন্দ, দুঃখ। মধুরা ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে— বিশাল বনভূমির গাছ থেকে গাছে ডাল ধরে ধরে ছুটে চলেছে মধুরা। ছুটে চলেছে নিমেষ। নিমেষের পা ফসকাল। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল মধুরা। মধুরার পায়ে কাঁটা ফুটেছে। সে বসে পড়েছে। নিমেষ আর একটি তীক্ষ্ণ শক্ত কাঁটা দিয়ে কাঁটাটিকে তুলে ফেলল। স্বপ্ন আরও দূরে চলে যায়। হরিণছানা নিয়ে খেলছে দুজনে। এক পাত্র থেকে খাচ্ছে। দুর্বার মিলনের রাত। তীব্র হর্ষে চিৎকার করছে দুজনে। মধুরা স্বপ্ন বলে জানে না। শুধু স্মৃতিতে ডুবে থাকে, ভুলে যায় সে এখন অবসৃত নেত্রী। সে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বাঁচে, ডুবে থাকে।

ভস্মবর্ণ ভোর। আগুন নিবে গেছে। প্রহরীগুলিও ঘুমিয়ে পড়েছে, চতুর্দিকে গভীর শান্তি ও ক্ষান্তি বিরাজ করছে। কোথাও কি কোনও শব্দ হল? কোনও বন্যপশু? না তো! সারারাত অক্লান্ত চারণ। শিকারের পেছনে ধাওয়ার পর পশুগুলিও ঘুমে ঢলেই তো পড়েছে। কোথায় কে যেন নিশ্বাস ফেলল? এতগুলি মানুষ তো নিশ্বাস ফেলছে! আবার কী? আবার কে? কুটির ভেদ করে তীক্ষ্ণ একটি বল্লম বিঁধে গেল মধুরার বুকে। নিঃশব্দে শূন্যে চলে গেল মধুরা। একবার আর্তনাদ করার সময়ও পেল না। ঠিক যখন স্বপ্ন তাকে নিমেষের সঙ্গে বর্ণার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছে তখন।

বনের ভেতর থেকে হাতে লতাতন্তু নিয়ে কাঁধে ধনুর্বাণ রাশি রাশি

মানুষ নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। ঘুমন্ত নারীগুলিকে বাঁধে, হত্যা করে পুরুষগুলিকে। এবং উত্থিত আর্তনাদ কানে ঘুম ভেঙে রক্ষা দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিমেষ— এক হাতে অর্যমার, অন্য হাতে ভগর কাটা মুন্ডু থেকে ধারাবর্ষণ হচ্ছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে রক্ষার সর্বাঙ্গ। তিন-চারজন লাফিয়ে পড়ে। নিমেষ তাকে লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় পাড়ার মাঝখানে। মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে— সবাই দেখে রাখো এ আমার নারী। একমাত্র আমার। শুধু আমার বৎস ধারণ করবে এ। আর তোমরা, আমার দলে বীররা, যে যে নারী চাও, তাকে নিয়ে কুটিরে ঢোকো। সেই সব নারী হবে সেই সেই পুরুষের। তারা আর কারও সন্তান ধারণ করতে পারবে না। আমরা জানব কে আমাদের সন্তান, কে আমার ধারা রক্ষা করবে। এই আমার অনুশাসন। সাবধান, যে না মানবে— কেটে ফেলব। আর রক্ষা তুমি ইচ্ছে করো বা না করো— বলে সজোরে রক্তমাখা রক্ষার মধ্যে প্রবেশ করে নিমেষ। তখনই। সেখানেই। দুধারে অর্যমা ও ভগর মুণ্ডে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে যায়। ধড়গুলি সব গুলিয়ে গেছে। খালি ভগর সর্বশ্বেত দেহটি পরিষ্কার চেনা যায়। সকালের আলোয় মুন্ডুহীন পড়ে আছে।

মেয়ে-মা-স্বামী

দিনগুলো শেষ হতে চায় না। সাতটার সময়েও ফটফটে বিকেল। মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে নীচে খেলতে পাঠায় সে। ঠিক তার মতো লাজুক, অমিশুক, গোঁয়ার হয়েছে মেয়ে। কিছুতে যাবে না। —'ওরা আমাকে বুলি করে, বিগ বয়েজ'— এক বুলি তার।

—করুক, তুমি তার জবাব দেবে। ডোন্ট লেট দেম। শো সাম অব ইয়োর টেম্পার শাই।

সে চায় শায়রী যেন পুতুল খেলে, মেয়েদের সঙ্গে দঙ্গল বেঁধে বড় না হয়। ছেলেদের মতো হোক তা-ও চায় না। কিন্তু এখন এই আট বছর

বয়সে সন্তানের কোনও লিঙ্গ থাকার কথা নয়। ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে শায়রী এখন ভলিবল খেলছে, ব্যাডমিন্টন খেলছে অপটু হাতে। অনিচ্ছায় খেলতে খেলতে ইচ্ছে আসবে, মেলামেশা বাড়বে, কেউ বলবে না— 'মূর্খ বড়, সামাজিক নয়।'

নিজের ছোটবেলার কথা মনে করলে এখন তার অনুশোচনা হয়। স্কুলে খেলা হত ক্রিকেট, ফুটবল— সেগুলো তো ছেলেরাই অধিকার করে রাখত। ভলিবল, বাস্কেট বল থাকত। কিন্তু দুপুরের রোদকে সে ভয় পেত, ঘেন্না করত। তার নরম মাখনের মতো ত্বকের ওপর হলকাটা আসত যেন দৈত্যের নিশ্বাসের মতো, সে ঘেমে একেক্কার হয়ে ঢলে পড়ত। এমনকী পি.টি-র সময়েও। শীতকালে ঠিক আছে। কিন্তু গরমকালে? ওরে ব্বাবা। যেখানে ছায়া সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। সারকে বলার সাহস নেই, এই ছায়া-ছায়া জায়গাটাতে করুন সার! নিজে ছায়া দেখে দেখে দাঁড়াত, বন্ধুরা মুখ টিপে হাসত। ফুলটুসি, ফুলটুসকি! এই দুর্বলতাটাও তার একটা গর্বের জায়গা ছিল যেন। সবাই বলছে— ঈশা, ও অত পারবে না। রোদ সয় না ওর। আদুরি। রং কালো হয়ে যাবে না? —ক্ষীণ একটা গর্ব। কোনও কিছু না পারলে, কোনও দুর্বলতা থাকলে অনেক মেয়েই গর্ববোধ করে। সে-ও তো তেমনই ছিল। ... টেবল-টেনিসটাও তো খেললে পারিস — বাবা বলল।

—বাপ রে, যা ছোটাছুটি. দম বেরিয়ে যায় আমার।

কত্থকটা চলছিল সুন্দর। কিন্তু প্রথম পিরিয়ড হতেই সে এমন ফ্যাকাশে যন্ত্রণাকাতর দুবলা হয়ে পড়ল, যে ডাক্তার দেখিয়ে, ব্লাড টেস্ট করে হিমোগ্লোবিন কাউন্ট করাতে হল। —কম, যথেষ্ট কম। বিট গাজর খাও, ভাল লাগে না, মেটে খাও পাঁঠার। ম্যাগো! ঘেন্না করে। তা হলে ওষুধ। ট্যাবলেট। দুধে গুলে যেগুলো দেওয়া হত সেগুলো খেলে তার বমি পেত, বিশ্রী গা গুলোত। নাচটা বন্ধ হতে সে বাঁচল যেন। বড্ড ভাল নেচে ফেলছিল। ঝর্নাদি বলছিলেন লাবু সবচেয়ে ভাল, কিন্তু তার পরেই ঈশা। স্কুল ফাংশন পাড়ার ফাংশনে নেচে বড্ড নাম হয়ে যাচ্ছিল। ঝর্নাদি বলতে শুরু করেছিলেন, চেহারাটাও সুন্দর তো! অ্যাডিশনাল বেনিফিট।

ঈশ্যা কণ্ঠকে ঝড় তুলছে আমি দেখতে পাচ্ছি। যখন ছেড়ে দিল, বাড়িতে এসেছিলেন— রঞ্জা, ঈশা নাচবে না?

মা ম্লান মুখে বলেছিল— সাত মন তেলও পুড়বে না, ঈশাও নাচবে না ঝর্নাদি। এত অ্যানিমিক! এত ব্লিডিং হচ্ছে। চিকিৎসা হচ্ছে, দেখা যাক। মুখ কালো করে চলে গেলেন ঝর্নাদি। তারপর রাস্তায় দেখা হলে দু-একটা কথা বলে এড়িয়ে যেতেন। ভাল শিক্ষক, আশ্চর্য নাচতেন, কিন্তু নিজের চেহারা একেবারেই ভাল নয় বলে কোনও দিন নাচিয়ে হিসেবে তেমন নাম করতে পারেননি। শিক্ষক হিসেবে খুব মর্যাদা ছিল। ঈশাকে নিয়ে বোধহয় অনেক আশা ছিল। আশাভঙ্গটা সহ্য করতে পারেননি।

প্রকৃতি তুমি আমাকে অক্ষম শরীর দিলে কেন? এখন তো মেদ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু তা স্বাস্থ্য নয়। এখনও ৫/৬ দিন ভীষণ ব্লিডিং হয়। পেটে যন্ত্রণা। ডাক্তার বলেছিলেন সেই প্রথম দিনগুলোতে— বাচ্চা হলে আপনি সেরে যাবে, বুঝলেন?

মা দুঃখের হাসি হেসেছিল— তেরো বছর বয়স, এখন থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবার জন্য বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে? হায় ভগবান! আপনারা চিকিৎসার এদিকটাতে একেবারেই গুরুত্ব দেন না, না ডাক্তারবাবু! আমিও কাটা ছাগলের মতো ছটফট করেছি যন্ত্রণায়, খেলাধুলো চালিয়েছি কিছু দিন। তারপর বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আমার মেয়েও তাই, তার মেয়েরও তাই-ই হবে? পরম্পরা নাকি? এত ওষুধ-বিষুধ বার করছেন, এই ব্যথা আর অতিরিক্ত ব্লিডিং-এর ওষুধ বার করতে পারেন না! না, দরকার মনে করেন না!

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন— আমার ওপর রাগ করে লাভ কী! আপনারা আজকালকার মেয়েরা এই ভাবে ভোগেন। আপনার মা, তাঁর মা এঁদেরও কি এরকম হত?

না হত না — মা বলেছিল— তাঁদের অন্যরকম হত। দু বছর তিন বছর অন্তর অন্তর প্রসব করতে হত। দশ মাস গর্ভে ভার ধারণ করবার যন্ত্রণা সয়ে, তারপর প্রসব-যন্ত্রণা। প্রত্যেকটা তাঁদের মৃত্যুর কাছাকাছি

নিয়ে যেত। আপনি বলছেন দুটোর একটা মেয়েদের বেছে নিতেই হবে! টিউব বেবি তৈরি করে ফেললেন ডাক্তারবাবু, ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলেছে। সামান্য এই বাধকের ব্যথা আর প্রতিমাসে অন্তহীন ব্লিডিং-এর সমাধান বেরোল না? আশ্চর্য!

শায়রী তাই হাজার কেঁদেও দুধের হাত থেকে মুক্তি পায় না। শোবার আগে দুধ তাকে খেতেই হবে। চকোলেট দিয়ে হোক, ভ্যানিলা-গন্ধ দিয়ে হোক। মাস্ট। এসব জায়গায় সে অনড়। ফল খাও বেশি করে। প্রতিদিন চিকেন বরাদ্দ আছে। মাছ নিয়ে রোজ কান্নাকাটি। কখনও স্টু, কখনও বেক, কখনও সুইট-সাওয়ার, কতরকম করে দিচ্ছে। দেব, কিন্তু খেতে হবে।

মেয়ের বাবা চোখ গরম করে— ও খেতে চায় না। জোর করো কেন? ইটস রং। লেট হার অ্যালোন।

মেয়ে কৃতজ্ঞ চোখে বাবার দিকে তাকায়। সে ঘর ছেড়ে চলে যায়। পরে মায়ের রাগ বুঝে মেয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরে রাত্রে। শোবার সময়ে। মা— রাগ কোরো না, আমি আর অমন করব না।

মা চুপ।

—মা আমি মাছ খাব, খালি কাঁটা বেছে দিয়ো, কাঁটা মাছ খেতে পারি না। মা চুপ।

—মা আমি দুধ খাব, কিন্তু একবার।

মা চুপ।

—মা আমি জুস নয়, গোটা ফলই খাব।

এবার মা পাশ ফেরে, আলতো করে চুমু দেয় মেয়ের কপালে, নরম গলায় বলে— মনে থাকবে তো? কথা দিলে কিন্তু।

গল্পের বই। ঈশার সর্বক্ষণের সঙ্গী গল্পের বই। আড্ডা আর গল্পের বই। বাঁধাধরা পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না। সেগুলো কোনওমতে শেষ করে সে গল্পের বই নিয়ে বসে। লালবাই, শুন বরনারী, তিলাঞ্জলি, সাহেব-বিবি-গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, বিভূতিভূষণ শেষ, শরৎচন্দ্র শেষ, তারাশঙ্কর কিছু কিছু। ওদিকে উদারিং হাইটস, জেন এয়ার, টেস

অব দা ডারবারভিলস, রেবেকা, মাই কাজিন র‍্যাচেল, গন উইথ দা উইন্ড ...। যে নিজেকে অযোগ্য ভাবছে সেই মেয়ের বা ছেলের প্রার্থিত ভালবাসা পাওয়ার গল্প তার ভাল লাগে খুব। জেন এয়ার, রেবেকা, শুন বরনারী এইরকম গল্প। প্রতিভা বসুর গল্প খুব ভাল লাগে। সেখানেও এমন। স্বয়ং নবাব মেয়েটিকে এত ভালবাসলেন যে বাড়িতে তাঁতি-তাঁত বসিয়ে মহামূল্য অনন্য শাড়ি তৈরি করালেন, তবু সে মেয়ে নবাবের ভালবাসা গ্রহণ করে না। শেষে ঢাকার ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে সেই মেয়েটিকে নিজের বেগম সাজিয়ে কোনওমতে ঢাকা থেকে বার করলেন নবাব, এবং কলকাতায় প্রাণটা দিলেন। পড়ে সে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল, ভাবত ওই ডার্সি বা নবাব, বা রচেস্টার, বা 'রেবেকা'র নায়ক এরকমই কেউ হবে তার বর। তাকে সে প্রাণপণে ভালবাসবে, অভিমান করবে, আদর পাবে। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে বইয়ের পাতা উলটোত।

কিন্তু বইগুলো এমন মিথ্যে কথা বলে! ডার্সির পুরুষালি সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নয় অহংকার, নবাবের প্রাণপণ ভালবাসা না শিক্ষাদীক্ষার ভিন্নতা, হিদক্লিফের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম নয়, শুধু চেহারা নিয়ে নিশীথ এল তার জীবনে। প্রায় প্রথম থেকেই রেড সিগন্যাল পেতে শুরু করল সে। স্ত্রী কাঁদলে, অভিমান করলে এ বিরক্ত হয়, ওটা নেহাতই বালিকাসুলভ ন্যাকাপনা তার কাছে। বেশি কথা কী, অসুখ করলে রেগে যায়। মাথায় আধকপালে? ধুত্তোর! বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। পিরিয়ডের ব্যথা। এক দঙ্গল লোকের মাঝখানে দোকানে চিৎকার করে উঠল। সারাদিনের পর বাড়ি এল— চান করে চা খেয়ে এবার হালকা গান চালিয়ে একটু গল্প করবে নিশ্চয়, বারান্দার নির্জনতায়, সবার চোখ লুকিয়ে হাতে হাত রাখবে! কোথায় কী! টি.ভি. খুলে বসে গেল। ডিসকভারি, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, হিসট্রি, এইচ.বি.ও ... তারপর ঘুরে ঘুরে হিন্দি নাচা-গানা। খেতে বসতে রাত বারোটা বাজিয়ে দেবে। সেখানে শাশুড়ি ছিলেন, অবশেষে বলতেন— তুমি খেয়ে নাও ঈশা, আমরা তো খেয়েই নিই, ও বোধহয় অফিস-ক্যান্টিনে খুব খায়। যখন হোক খাবে ...। তো এখানে তো একটাও বেজে যাচ্ছে। এত করার পরেও ভুরু কুঁচকে থাকে, বলে

'কিচ্ছু তো করো না।' কিছু করা নয়, এই সংসার গুছিয়ে টিপ-টপ রাখা, অর্ধেক সময়ে লোক থাকে না— তখন কত ভালবেসে যে যা পছন্দ করে তাই রান্না, মেয়ের সমস্ত ভার তার একার, একদম একার, নিজের ও মেয়ের অসুখ-বিসুখ করলে তাকেই সব করতে হয়, ইলেকট্রিসিটি গেল, ফোন খারাপ, মেয়ের পেট খারাপ জ্বর, নিজের জ্বর— তার জন্য ডাক্তার— এভরিথিং। দেখার, ভাবার, শেয়ার করার কেউ নেই। কেরিয়ার করছেন, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠবেন, তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হয়ে যাবে স্ত্রী-পুত্র-সংসার। আছে— এইটুকুই সমাজের কাছে দেখানো, এবং নিরাপত্তা— অবশ্যই নিজেরও নিরাপত্তা। নিজের একটা প্রকাণ্ড স্বাবলম্বী ভাবমূর্তি তৈরি করেছে নিশীথ। এত স্বাবলম্বী যে স্ত্রী না থাকলে ক্যানটিন-রেস্তোরাঁ-টেক-অ্যাওয়ে নির্ভর, এবং স্ত্রী-থাকা, সন্তান-থাকা অবস্থাতেও আত্মীয় বন্ধু-নির্ভর। তাদের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা না হলে মেজাজ খারাপ হবে তার। কোনও মেলামেশাটারই কিন্তু কোনও জাত নেই। সেটাও চাকরিনির্ভর। খালি কর্মজগতের কথা, কোন শেয়ার উঠল, কোথায় নামল। ইউ.এস.এর সরকারি পলিসি— আউটসোর্সি-ফ্রেন্ডলি হতে যাচ্ছে কি না। ইন্ডিয়া কত সুদ কমাল। ফিনান্সিং সেক্টর স্টেট পলিসির জন্যে কীরকম ফ্লারিশ করছে। এবং শৈবালের বউ যা দেখতে, শৈবাল কী করে বিয়ে করল! অলি হংকং-এ জমিয়ে বসেছে। হংকং-এ বসে ডলারে আর্ন করবে। হাঃ হাঃ হাঃ, ওর বর এখনও সামবাজারের সসিবাবু— হাঃ হাঃ হা, রুবি-সুন্দরের মোঙ্গল বেবি হয়েছে। রাজা-অর্নার ডিভোর্স হয়ে গেল। হবারই ছিল, হুঁঃ! সত্যজিৎ বড় না মণি রত্নম।

সারাক্ষণই সে একঘরে হয়ে ছিল। এমন কোনও আলোচনা হচ্ছিল না যে ও অংশ নিতে পারে। এবার বলল— দুজনেরই কতকগুলো প্লাস-পয়েন্ট আছে। ব্যসস্। খ্যাঁক করে উঠল নিশীথ। —তুমি এ বিষয়ে কী জানো? সত্যজিতের ক্লাস আলাদা। ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সাচ থিংস।

নিশীথের দিদি-জামাইবাবু চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুচকি হাসি

হাসল। নিশীথ-ঈশার সম্পর্ক ওদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। এবং ঈশার অপমান ওরা উপভোগ করেছে। জামাইবাবু যদি এখনও পিঠ চাপড়ানো ভঙ্গিতে বলেনও— 'আহ্, ঈশাকে বলতে দাও না নিশীথ।' দিদির চমৎকার লাগে ব্যাপারটা। ননদিনি না! যতই বড় হোন বয়সে। তার ওপর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট-এ আছেন। ব্যাপারই আলাদা। সেখানে একটা গ্র্যাজুয়েট বউ, ভিতু, লাজুক, নরম দেখলেই বোঝা যায় একে বেশ করে ছেঁচা চলে। তা ছেঁচবেন না! অত আহ্লাদ আর কীসে? অত উপার্জন, অত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাইরের জগতে অবাধ বিচরণ কিছুই এঁকে এঁর মৌলিক ননদিনি-স্বভাব থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

মার কাছে এ কথাগুলো সে বলেছিল। মা বিষণ্ণ গলায় বলেছিল— ঈশা, যত মানুষ বাড়ছে, প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তত মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে। টাকা এবং পদ এগুলোই এখন মানুষের মনুষ্যত্ব ভব্যতা সহবতের পরিবর্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখেছি অতি উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, রিজার্ভ ব্যাংকের সম্ভবত অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর, আমাদের সম্পর্কে মামাতো দাদা হতেন, কোনও হ্যাঁকো ভ্যাঁকো ছিল না, আর কী স্নেহময় ছিলেন, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেরানি থেকে প্রোফেসর শিক্ষক, বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সরকারি অফিসার, কর্পোরেট এগজিকিউটিভ সবাই ছিল, ছিলেন লেখক শিল্পী। সবাইকার সঙ্গে তুই-তুই আর হা হা হাসি। নিজের পদ, অভিজ্ঞতা, টাকা, সম্মান কোনওটাকেই তিনি সোশ্যাল লাইফে টেনে আনতেন না। একটা রাস্তার কুকুর পুষেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন কালাচাঁদ। তাকে নিয়ে ভোরবেলা প্রাতঃভ্রমণ, তারপর আধ ঘণ্টা তার ট্রেনিং— কালাচাঁদ উঠে দাঁড়া, কালাচাঁদ বসে পড়। সে এক মজার ব্যাপার। এই সব মানুষ চলে যেতে সব দর্জির দোকানের মানুষের দল এসেছে। পৃথিবী, জীবন, মেলামেশা সবই আনইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে রে! উদাসীন ভাবে চল, কারও দেওয়া আঘাত গায়ে মাখবি না, কুকুর ঘেউ-ঘেউ করলে কি গায়ে মাখিস। বড়জোর একটা হ্যাট করিস, এ-ও তাই। সুযোগ পেলে হ্যাট করিস, ছোট্ট করে একটা ঢিল, ব্যস বেলুন চুপসে যাবে, কিন্তু যতক্ষণ কাজটা করার মতো ব্যক্তিত্ব আর ডিট্যাচমেন্ট তৈরি না হচ্ছে,

ততক্ষণ কিন্তু 'হ্যাট'টাও করবি না, ঢিল ছোড়া তো দূরের কথা। কত করে বলেছিলুম ঈশা কিছু একটা কর, কিছু একটা, এম.এ যদি করতে ইচ্ছে না করে, অন্য কিছু শেখ, এখন তো প্রচুর সুযোগ!

ব্যস, ঈশা চুপ। কাজের জগৎকে তার ভীষণ ভয়। একটা ছোট্ট পরিবার, সেখানেই কত কমপ্লিকেশন! তার ওপর কর্মক্ষেত্র! ওরে ব্বাপ! অত জটিলতা সামলানো তার কর্ম নয়। এই সব কথা সে নিশীথকেও প্রথম প্রথম বলত। ওরে বাবা, চাকরি সামলানো তার কর্ম নয়, ওরে বাবা অমুক ভয়ানক কমপ্লিকেটেড, তাঁকে সামলানো তার কর্ম নয়। নিশীথের আমেরিকা-ফেরত আধা সাহেব বন্ধু-বান্ধবীর দল। ওরে বাবা, ওদের অ্যাকসেন্ট বুঝতেই আমার কম্ম কাবার, তারপর ওদের কোনটা রসিকতা, কোনটা ঠোকা, কিচ্ছু বুঝতে পারি না। প্লিজ নিশীথ, তুমি একা যাও।

—একা যাওয়াটা সহবত নয়।

—যা হোক একটা কিছু বলে দিয়ো।

—দে আর নট ফুলস্!

গেল ঠিকই। একজন মন্তব্য করল— আই হ্যাভ নেভার সিন আ পার্সন সো সাইলেন্ট। ডাজ শি টক! এভার! ডু ইউ, ঈশা?

উত্তরে শুধু অপ্রতিভ হাসি ছাড়া তার কিছু দেবার নেই। ওদিক থেকে নিশীথ যমের মতো তাকিয়ে আছে।

বাড়ি এসে ফেটে পড়ল। —দে থিংক য়ু আর আ ডাম ডল, নাথিং মোর। দে আর ওয়ান্ডারিং হোয়াই আই হ্যাভ ম্যারেড য়ু।

একটা প্রচণ্ড ধাক্কা।

নিশীথ তুমি কি তোমার বন্ধুদের পার্টিতে নিয়ে যাবার জন্য একজন স্ত্রী খুঁজেছিলে? তো তাই করলে না কেন? যে মেয়ে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ বোধ করবে! এরকম মেয়ে আজকাল খুব উঠেছে। আমাকে চাইলে কেন? আমাকে তো বলেছিলে ভালবেসেছ তাই বিয়ে করতে চাইছ। তুমি না এলে আমার কোনও ক্ষতি হত না নিশীথ। এসে গেছ বলে এতগুলো বছর আমার ভয়ে, খারাপ লাগায়, আশাভঙ্গে, হতাশায়, ব্যক্তিত্বহীনতায়, আত্মবিশ্বাসের অভাবে বরবাদ হয়ে গেল। সেই ভয়, ডিফিডেন্স, সেই

মোহভঙ্গ তোমরা আমার মধ্যে লালন করেছ। প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়েছ আমি কত তুচ্ছ, নগণ্য, অর্থহীন। তার ওপরে খারাপও। কেননা তোমার প্রিয়জনরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আর তাদের সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। আরও অর্থহীন হয়ে যাই।

অর্থের পেছনে ছুটি, অর্থ দাও, কোনও অর্থ দাও মনস্কাম
হাত পেতে আছি
ফিরিয়ে নিও না যা যা আছে বলে জানি।
মুষ্টিবদ্ধ হাত
দেব না দেব না, তবু দৈত্যচাপে মুঠি খুলে যায়,
ঝরে পড়ে হাসি গান, ঝরে যায় আশা অনির্দেশ
শুকনো ফুল, ভাঁট ফুল, সে-ও তো তেমন কিছু নয়
মূল্যহীন, অর্থহীন। আছি কিনা তা-ও জানি না এখন।

সর্বমঙ্গলা থেকে পূর্ণা, মাঝে সেজবউ

বাগবাজারের বাড়ি নাকি ভাগ হবে। শুনে অবধি বেদবতীর বুকের মধ্যেটা কেমন করছে। এই ভাগাভাগি, ভাইয়ে ভাইয়ে আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি জিনিসটাতে কেমন ব্যাখ্যাতীত একটা ভয় হয় তাঁর। একটা চালু কাঠামো আছে সেটাই যেন স্বস্তিদায়ক। অন্য কিছু, অন্যরকম হলে যেন মনে হয় নিরালম্ব শূন্যে ঝুলছেন তিনি। কে জানে সবাইকারই এমন হয় কি না। সত্যিই তো যৌথ পরিবার অনেক দিনই ভেঙে পড়েছে। যবে থেকে লোকের জমি-জিরেত যৌথ ব্যাবসা ইত্যাদির দিন গেছে তবে থেকেই এ ভাঙন। গাঁয়ের লোক উচ্চশিক্ষা উচ্চপদে চাকরির জন্য বরাবর মহানগরে নগরে সংসার পেতেছে আলাদা। কিন্তু সেটাতে তত ভয় নেই। কারণ আসল ভিতটা ভিটেমাটিটা তো আছেই। সেখানে কাকা অথবা জ্যাঠা ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করেন, বাবা ধরো ডাক্তারি করেন। আছে বাস্তু। আর একটা যৌথ এস্টেট থেকে সবাইকার মোটা

ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে উপকৃত হয় বৃদ্ধ পঙ্গু অসহায়রা। কেউ না কেউ একটু দেখাশোনা করে দেয়। বেদবতী বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর দাদা-বউদিরাও বৃদ্ধ। ন'দার একটি ছেলে জড়বুদ্ধি, সব মিলে তাই তিনি এদিকটাই দেখতে পাচ্ছেন।

তাঁদের বাড়িতে, অর্থাৎ শ্বশুরবাড়িতে এ সমস্যাই ছিল না। কিরণময়ের কোনও ভাই ছিল না, সব দিদি। একটি বোনের বিয়ে বেদবতীর বিয়ের পরে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ। পরের প্রজন্ম অর্থাৎ তাঁর নিজের সন্তানদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, ততটা মানসিক নয়— এই যা রক্ষা। বাড়ি-বিক্রির ব্যাপারে তারা সব এককাট্টা ছিল, বেদবতীর বিপক্ষে। পরিস্থিতি দেখে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এটাই তাঁর স্বভাব। প্রতিকূল কিছু বা নিজের অপছন্দের কিছু দেখলে তিনি গুটিয়ে যান। এক ধরনের শম্বুকবৃত্তি এটা। কর্তা যখন রাগারাগি করতেন কোনও কারণে, তিনি আস্তে আস্তে স্থানত্যাগ করতেন। কর্তা যখন গা-জোয়ারি কোনও ব্যবস্থা করতেন তাঁর অপছন্দ হত। তিনি একবার, মাত্র একবার বোঝাবার চেষ্টা করতেন, তারপর চুপ হয়ে যেতেন। সঞ্জয়ের ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে, উনি বললেন এত খেটেখুটে এত মাথা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কুলি?

তিনি বুঝিয়েছিলেন— এটা ওর ইচ্ছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে, তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের উপার্জন বেশি। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। এসব খানিকটা সঞ্জয়ই অবশ্য বুঝিয়েছিল তাঁকে। উনি নড়লেন না। কেমিস্ট্রিতে লেটার মার্কস পাচ্ছে সমানে, ওই রসায়নই ওর বিষয়। ছেলেমানুষ বুঝছে না। মুখ গোঁজ করে রসায়ন নিয়ে ভরতি হল সঞ্জয়, বরাবর খুব ভাল রেজাল্ট। কর্তা বললেন— দেখলে? বলেছিলুম না? সঞ্জয় উন্নতি ভালই করেছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই বলে থাকে, সে সময়টা ছিল ইঞ্জিনিয়ারদের স্বর্ণযুগ। তখন যারা বি. ই. থেকে বেরিয়েছে, এখন সব দেশের ইন্ডাস্ট্রির মাথা।

ওই একই কর্তা আবার মেজছেলে সঞ্জীবের বেলায় তাকে টেকনিক্যাল স্কুলে পাঠালেন। তার নাকি মেকানিক্যাল ব্রেন, ছেলেটার সাহিত্যে ঝোঁক ছিল। তিনি কিছু করতে পারেননি। তার জন্য এখনও মেজছেলের কাছে তাঁকে কথা শুনতে হয়।

অথচ, তাঁর যে বুদ্ধি-বিবেচনা নেই, তিনি যে কিছুর বন্দোবস্ত বা মোকাবিলা করতে পারেন না, তা তো নয়। মঞ্জু ভুল করতে যাচ্ছিল। তিনি সামলালেন বুদ্ধি করে, ডিপ্লোম্যাসি চালিয়ে, মঞ্জু আজ কত সুখী। রঞ্জার বেলায় কিন্তু পারলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল সুবীর যেন ঠিক দায়িত্বশীল নয় বা রঞ্জার প্রতি তার আগ্রহেও যেন কিছু খাদ আছে। এইটুকু আরও বুঝেছিলেন জীবনের ঝড়ঝাপটা সামলে নেবার মতো শক্তি এই মেয়ের সম্ভবত আছে। এ তাঁর মেয়ে নয়। সর্বমঙ্গলা ঠাকরুনের নাতনি। তবে কুটুমবাড়ির তত্ত্ব ফেরত দেওয়া সর্বমঙ্গলা নন। ঠাকুর মারা যাওয়ার পর অতগুলি সন্তানের শিক্ষা শেষ করা, তাদের বিয়ে, ছেলেপুলে সামলানো, কাজের লোকেদের অসুখে সেবা-শুশ্রূষা করা সর্বমঙ্গলা ঠাকরুন।

কোনও মানুষই সর্বগুণান্বিত হতে পারে না, দোষত্রুটিহীন হতে পারে না, তবু তিনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন— সর্বমঙ্গলার কর্ম ও পরিচালন ক্ষমতা, তাঁর বুদ্ধি যেন রঞ্জার মধ্যে প্রকাশ পায়। সেইসঙ্গে ছোট্ট করে খুব বিনয়ের সঙ্গে যোগ করে দেন— তাঁর অপরিসীম সহ্যশক্তিরও একটু যেন রঞ্জা পায়। তাঁর সহনশীলতার দাম দেয় না, বোঝে না তাঁর মেয়েরা। মঞ্জু যখন দিল্লি থেকে আসে! —বাবা! বাবা! কোন বাড়িতে উঠব তা-ও জানি না। আমার কোনও বাপের বাড়ি মায়ের বাড়ি নেই। সব দাদা, ভাইদের বাড়ি। কেন মা, তোমার স্বামীর তো একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল। একটা আস্তানা তোমার আলাদা করা যেত না। যেটাকে আমরা আমাদের বাপের বাড়ি বলে ভাবতে পারতুম! দিস ইজ ভেরি ভেরি আনফেয়ার। একবারও তো বলতে পারতে মা!

বেদবতী বলেন— আলাদা আস্তানা হলে তো আলাদা দেখাশোনার লোকও চাই মঞ্জু। একটা আলাদা খরচ, আলাদা সংসার। সে কি আর আমার দ্বারা...

—কেন, ওরা সবাই কিছু-কিছু দিত, আমরাও দিতুম, তাতেই চমৎকার চলে যেত।

—শুনতে চমৎকার। তিনি বললেন— থাকতে, বাঁচতে চমৎকার নয়

রে। সে তো এক উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। তোদের ওই বৃদ্ধাশ্রমই। একলা বৃদ্ধার বৃদ্ধাশ্রম! তফাতের মধ্যে দায়-দায়িত্ব সব বৃদ্ধার ঘাড়ে। ঘরে মরে পড়ে থাকল...

—আচ্ছা আচ্ছা। অনেক হয়েছে, এসব অলক্ষুনে কথা একদম বলবে না।

রঞ্জা এই সময়ে বলে থাকে— মা নিজেকে বৃদ্ধা বোলো না। আমার বড্ড কষ্ট হয়। তার চোখ ছলছল করে।

বেদবতী হাসেন— দেখ, আমি যে সময়কার মানুষ তখনও মেয়েদের কুড়িতেই বুড়ি প্রবাদটা চালু ছিল। তারপর সন্তানধারণ ক্ষমতা চলে গেলেই সে-মেয়ে আর মেয়ে থাকত না। বুড়ি তো বটেই! তখন সংসারে প্রাণপণে খেটে নিজের দাম ঠিক রাখতে হত।

—আহা তোমারও যেন তাই। শাশুড়ি নেই, দেওর-ভাশুর নেই।

বেদবতীর হাসিতে কী ম্লান ছায়া! কেন? কে জানে! বললেন— বড্ড বেশি দিন বাঁচা হয়ে গেল রে! এতটা দরকার ছিল না।

—হ্যাঁ, তোমার ওপর দিয়ে যা গেছে, আর যেভাবে মুখ বুজে সয়েছ, তাতে বুকটা ফেটে যাওয়ার কথা ছিল।

রঞ্জা বলে— আচ্ছা মা এই যে তোমার সর্বংসহা ধরিত্রী মূর্তি এটা শক্তি; না দুর্বলতা?

—কী জানি!

—তোমার কী মনে হয়?

—তোদের কী মনে হয়?

দুই বোন সমস্বরে বলে ওঠে— দুর্বলতা মা। স্বীকার করো না করো—এর নাম বেতসীবৃত্তি। ঝড়ের সময়ে বড় বড় গাছ পড়ে যায়, বেত নুয়ে পড়ে তাই বেঁচে যায়।

—তা তোরা কি আমায় লড়াই করতে করতে অনেক আগেই মরে যেতে বলছিস!

—না, না, তা নয়। মানুষ তো গাছ নয়! মানুষই তো ঝড়-ঝাপটার মধ্যে সোজা দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি রাখে। বেশ তুমি কী ভাবো, বলো!

—রঞ্জা বলে। বেদবতীকে বেশি ভাবতে হয় না। আশি হল। জীবন কেটে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। তিনি যা করেছেন, তার মধ্যে যেমন তাঁর স্বভাব ছিল, তেমনি চেষ্টাও ছিল। হেসে বললেন— দুটোই। শক্তিও বটে, দুর্বলতাও।

—সেটা কেমন? —মঞ্জু যেন ঝড়।

—এই যে কারও ওপর বেশি জোর ফলাতে আমার কোনও দিনও ভাল লাগত না মঞ্জু। একবার বললুম— সে যদি তাতে আমার কথার মান দিল তো ঠিক আছে। ঘ্যানঘ্যান করতে আমার মানে লাগে। আজও।

—এটা তো আমাদের সেই বহু পরিচিত ইগো মা— রঞ্জা বলল, তোমার মান যাচ্ছে বলে তুমি একটা অন্যায় মুখ বুজে সয়ে নেবে?

—কী কী সত্যিকারের অন্যায় সয়েছি। বল?

—এই ধরো মামার বাড়িতে দিদিমার বড্ড ফেভারিটিজম ছিল, তুমি কখনও কিছু বলেছ? —মঞ্জু বলল।

রঞ্জা বলল— দিদি তুই আসল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছিস। ওটা প্রতিবাদ। আমরা সওয়ার কথা বলছি, নিজের বা নিজের খুব আপন কারও ওপর অন্যায়টা মুখ বুজে মেনে নেওয়ার কথা।

বেদবতী হেসে ফেললেন— রঞ্জা তোরা নিজেরাই জানিস না, আমার কাছে কী জানতে এসেছিস। তবু দুটোরই জবাব খুঁজি। দেখ তেরো বছরে বিয়ে হয়ে যে সংসার থেকে চলে এসেছি, সেখানে আমার জোর কতটা? এসো, খাও, মাখো, চলে যাও।

—কেন দিদিমা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন না?

—করতেন বই কী! কিন্তু সেটা সায় পাবার জন্য। কীরে খুকি নমস্কারিগুলো সরেস হওয়া চাই, বলে দিই? আমি বললাম— তাদের যা সাধ্য তাই দেবে মা। মা বললেন— নারে না, ফাঁকি দিতে সব মেয়ের বাপ একপায়ে খাড়া। বজ্জাতের ঝাড় তুই জানিস না।

আচ্ছা মা, যে তোমার আত্মীয় হতে যাচ্ছে তাকে গালাগাল দেওয়াটা কি ঠিক?

মা বললেন— আত্মীয় আবার কী! কুটুম! আমি রাগ করে বললুম— তা হলে আমার শ্বশুরমশাই, তোমার জামাই— এরা সব তোমার তো আপন নয়? মা কী বললেন, জানিস? —ওমা, দেখেশুনেই তো তোকে পাঁচ-বোনের কোলে এক ছেলেতে বিয়ে দিয়েছি, শাউড়ি নেই, সংসার তোর। বউ-কাঁটকি। জটিলে-কুটিলে থাকবে না। দিদিগুলো দূরে দূরে পড়েছে। শ্বশুর তোর হাতের সেদ্ধ-ভাত পেলেও বর্তে যাবে। আর জামাই? কেমন ভালমানুষ মুখখানা? আঁচলে বাঁধা থাকবে তোর। তা ছাড়া যম, জামাই, ভাগনা তিন না হয় আপনা। জামাই-ষষ্ঠীর দিন জামাইকে দেখব, ছেলে মেনে উপোস করব, কিন্তু তার ওপর ভরসা? সে আমার কন্না করবে? ধুর, তুইও যেমন!

দুই বোনে হেসে কুটিপাটি হয়ে গেল।

হাসি-টাসি শেষ হলে, রঞ্জা বলল— বাবা কতটা ভালমানুষ ছিলেন, তুমিই ভাল বলতে পারবে মা। আমরা দেখেছি বাবার কথাই সংসারে শেষ কথা। সব সময়ে সেটা খুব ভাল ব্যবস্থা হত না। বাবা অসময়ে একগাদা বন্ধু নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। তোমার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। তুমি তাড়াতাড়ি রাঁধতে বসলে। রাঁধলে, পরিবেশন করলে, সবাই আহ বলে ঢেকুর তুলে উঠে গেল আড্ডা দিতে, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়লে। খিদে পড়ে গেছে, শরীর বইছে না।

—কী জানিস— বেদবতী বললেন— তখনকার মেয়েরা নিজেদের খিদে খাওয়া এসবের কথা বলতে লজ্জা পেত, কোনও দিন তো খোঁজ নেননি। কী করে বলি বল।

—চলে না মা চলে না। তোমার যে আলসার হয়ে যায়নি সেটা আমার আর রঞ্জুর দৌলতে। —মঞ্জু ঝেঁঝে উঠল।

বেদবতী হেসে বললেন— একশোবার। মেয়েরাই মাকে দেখে। ব্যাটাছেলেদের ওসব দিকে চোখ থাকে না। চোখ থাকাটাও ওদের পক্ষে লজ্জার, লোকে বলবে স্ত্রৈণ।

মঞ্জু সগর্বে বলল, ভাগ্যিস সেসব দিন আর নেই। তোমার জামাইয়ের নজর খুব। আমার ভাল না খেয়ে উপায় নেই। যেন পাহারা দিয়ে আছে।

লোকজন যখন খেতে বলি একেবারে প্ল্যান করে মা। দু দিন ধরে রান্না করি আর ফ্রিজে তুলি। গেস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে খাই, গল্প করি, খাটুনিটা আড়ালে থাকে।

তাই তো বলি। বেদবতী বললেন— তোরা আজকালকার মেয়েরা দশভুজা! আমরা কিছুই জানতুম না। খেটে মরতুম খালি। বোকা!

—আহা, তাই যেন বলেছি— মঞ্জু অপ্রতিভ হয়ে বলল— তোমার মতো রাঁধতে আমি পারব? সাতজন্ম ঘুরে আসতে হবে। তা ছাড়া মা, আমরা আর আজকালকার মেয়ে নই, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন আজকালকার।

রঞ্জার মনে হচ্ছিল অনেক কথা। সে কিছু বলল না। সে-ই কি কূটনীতি চালায় না? দাদা-বউদিরা যবে থেকে নিজের-নিজের আস্তানা হয়েছে— দুম করে বদলে যায়নি। মা গৃহিণী ছিলেন, কিন্তু কর্ত্রী ছিলেন না কখনও। পিসিমারা রিমোট কনট্রোলে কি কিছুই চালাতেন না! বাবার কথায় কথায় ছিল— বড়দি এই লিখে পাঠিয়েছে, মেজদি এটা পছন্দ করবে না। ছোটপিসিমা-ই খালি গজগজ করত, —মজঃফরপুর থেকে ফরমান এসেছে, উঃ বউদি পারোও! যাই হোক, যবে থেকে শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাড়ি বিক্রি হয়েছে, মায়ের আরও ডিমোশন হয়েছে, এখন কর্ত্রী তো নয়ই, গৃহিণীও নয়। এখন আশ্রিতা। মোটামুটি সম্মানিত আশ্রিতা। সীমাবদ্ধ। প্রাইভেট লিমিটেড। সে তো কিছু বলতে পারে না! যদি মায়ের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়? যদি দাদা-বউদিদের সঙ্গে তার সম্পর্কে চিড় ধরে! সে নিজেও কি কম সুবিধাবাদী নাকি?

বাগবাজার সর্বমঙ্গলার সর্বময় কর্তৃত্বে বহু দিন তার একত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। তার রেশ চলেছে তাঁর মৃত্যুর পরও। বছর দুই কেন, তিন তো হয়েই এল। যত মেজাজি, একচোখো, দাপুটে হোন না কেন, তাঁর আমলে কোনও অনৈক্য হতে পারেনি। এইরকম ঠাকরুনের যে কী প্রয়োজন একটা পরিবারে, তা দীর্ঘদিন রোগগ্রস্ত, স্মৃতিভ্রষ্ট সর্বমঙ্গলা মারা যাওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে। সেজবউদির মতো প্রতাপশালিনী, কিছুটা বিত্তশালিনীও বটে, কাজটা করে উঠতে পারলেন না। পরবর্তী

প্রজন্ম হেলায় বলল, ওসব হিসেব-নিকেশ আপনারা পারবেন না, তার পরের প্রজন্ম অর্থাৎ তাঁর নাতনি ঈশাদের জেনারেশন আবার বলল— দিস ইজ আনথিংকেবল। এখনও আমরা এতগুলো লোক দুটো বাথরুমে চান করি। বাড়ি ফেরার কড়াক্কড়ি। ননসেন্স। তার পরের জেনারেশন আবার টিভি-তে সেঁটে গেছে, একেবারে আঠা দিয়ে। দেখছে কার্টুন, দেখতে দেখতে টুক করে এদিক ওদিক টিপে একেবারে একটা শয্যা-দৃশ্যর সামনে। প্রত্যেকটি সিরিয়াল কেউ না কেউ দেখছে। তাদের সঙ্গে ছোটরাও বসে যাচ্ছে। সেখানে সব শাশুড়ি ক্রিমিন্যাল, ঘরের বউয়ের কথা বিশ্বাস না করে বাইরের অতিথির কথা বিশ্বাস করছে সবাই, সব জায়গায় মারামারি, কুটিলতা।

একদিন তিনি ছোটবউদির ঘরে বসে ছিলেন। ছোটবউদির নাতবউ নীনা হাঁ করে দেখছিল, তিনিও কীরকম জমে গেলেন। কিছুক্ষণ দেখে বললেন, হ্যাঁরে নীনা— এত কষ্ট করে আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ হল। এসব হিন্দি সিরিয়াল যে তা-ই ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রে! এ তো আইনবিরুদ্ধ! একজনের বউ কোমায় আছে, সে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলল, কোমা ভেঙে গেল, এখন আইনত দ্বিতীয় বিয়েটা তো অসিদ্ধ রে! বড়বোনের স্বামী দুর্ঘটনায় বেঁচে গেছে, প্লাস্টিক সার্জারি করে কাঠামো, গলা সব বদলে এসেছে, তা কেন এল, কী করে হল তা অবশ্য জানি না, ছোটবোনটা শয়তানি করে ফাঁসিয়ে তাকে বিয়ে করল, তা লোকটা যে আসলে সেই বড়বোনের স্বামীই, সেটা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে স্থির হয়ে যাবার পর তো দ্বিতীয় বিয়েটা আপনিই কেঁচে যায় রে! বাড়িসুদ্ধু লোক ওই দ্বিতীয় বিয়েটাকেই সিদ্ধ বলে ধরে নিচ্ছে কেন? প্রথম বউটা না হয় বোনের জন্যে আত্মত্যাগ করছে।

নীনা হেসে বলল— দিদান তুমি ওই টেলিফিল্‌মকে একটা উকিলের চিঠি ছেড়ে দাও।

নীনার বর বলল— এর আবার কেস আছে নাকি দিদান। বাড়াতে হবে, চার বছর, পাঁচ বছর। তখনও যদি পাবলিক খায় তো আরও এক বছর!

তিনি বলেছিলেন— তোদের পাবলিক কি অমনি বোকা? মুখ্যু?

নীনা আর তার বর সমস্বরে বলে ওঠে— এরে কয় জ্ঞান বোকা জ্ঞান মুর্খ, যেমন জ্ঞানপাপী, তেমন। জানে সবই, খেয়ে যাচ্ছে, চাটনি চেটে যাচ্ছে।

বেদবতীর কেমন ভয়-ভয় করে। সবাই যদি এই সব বে-আইন, অনাচার দেখায়, যা ঘরের মধ্যে তাকে হাটের মাঝখানে করে দেখায় তো কী হবে! শিশু বলে, বালক-বালিকা বলে কিছু আর এরা থাকতে দেবে না। সেই শিশুহীন শুধুমাত্র যুবতী পৃথিবীতে তিনি, তাঁরা কী করে বাঁচবেন! কেনই বা! অথচ প্রাণের ওপর তো কারও হাত নেই।

ছোটছেলে রঞ্জনকে বলেকয়ে আনিয়ে তিনি তার সঙ্গে বাগবাজারে চললেন। বিশাল বাড়ি। ক'পা গেলেই গঙ্গার ঘাট। সেখান থেকে ইলিশ আসত টাটকা, দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই জোড়া ইলিশ সিঁদুর দিয়ে বরণ করছেন সর্বমঙ্গলা এ ছবি তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। যাকে খাবে তাকে অমনি করে বরণ করা কেন? একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। সবার মাঝে পড়ল কথা সেজবউদি বলে উঠল— শাউড়ি বউকে বরণ করে না? এ সেইরকম। সারাজীবন ধরে খাবে তার আনন্দে বরণ। সবাই হেসে উঠল। আচ্ছা, সত্যিই কি সর্বমঙ্গলা অতটা বউ-কাঁটকি ছিলেন? তাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনও অযত্ন তো কখনও করেননি? কতকগুলো কঠোর নিয়ম ছিল। সকালবেলা উঠেই চান করে ফেলতে হবে বউ-মানুষকে। তসরের কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘরে গিয়ে তবে তুমি তোমার সুতিবস্ত্র পরো। মাথায় ঘোমটা থাকবে। স্নানের পর ঠাকুরঘরে ভক্তিভরে একটা পেন্নাম। তারপর এসে শাশুড়িকে পেন্নাম। সবাইকার কাজ ঠিক করা আছে। কে ময়দা মাখবে, কে চা করবে, কে কুটনো কুটবে, স—ব। বেশ একটা শৃঙ্খলা। কিন্তু হ্যাঁ, কারও অধীনে।

তাঁর মেয়ে রঞ্জা বলেছিল— মা ইলিশ হল সম্পদের প্রতীক, 'জলের রুপোলি শস্য'— বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, তা-ই বোধহয় বরণ করা হত। হবেও বা। আরও বলত এই যে যৌথ সংসার, একজনের অধীনে জীবনযাত্রা— এ বহু প্রাচীন। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অভ্যেস। প্রথম

যুগের আদি সভ্যতার সব মানুষ কোনও না কোনও কর্ত্রীর অধীনে কাজ করত। একজন কেউ পরিচালনা না করলে, কাজ ভাগ করে না দিলে— কমিউনিটি লিভিং চলে না। আদি সমাজের আদলে কমিউনিটি লিভিং চিন আর রাশিয়ায় চালু করার চেষ্টা হয়ে গেছে মার্কস-এর কথামতো। চলেনি। আর চলবেও না মা। ইন্ডিভিজুয়ালিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তো সভ্য মানুষের একটা প্রধান লক্ষণ, সেটা সে বড় জায়গার জন্য, ধরো তার কর্মক্ষেত্রে সরকারি কাজে বিসর্জন দিতে বাধ্য, কিন্তু নিজের নিজস্ব গণ্ডিতে এসে প্রত্যেকে তার নিজের মতো বাঁচতে চায়।

সেই কথাই একটু অন্যভাবে বলল পূর্ণাবউদি।

—দেখো দিদিভাই, ঠাকরুনের প্রত্যেক ছেলেরই নাতিপুতি হয়ে গেছে। বাড়ি তো নয়, পাড়াবিশেষ। দেশের সম্পত্তি খানিকটা বিক্রি, খানিকটা বেদখল হয়ে গেছে। সংবৎসরের চালটাও যে আসত, আজ আর আসে না গো। সবাই তাদের রোজগারের অংশ দিচ্ছে, চাইছে নিজের পছন্দের জিনিসটি। কেউ চায় মাছের ঝোল, কেউ চায় মাছের ঝাল, কেউ আবার মাছ খায়ই না, তার চাই মাংস। সবাই অখুশি। ভিন্ন হয়ে যাওয়াই তো ভাল ভাই। তোমাদের একটু কেমন কেমন লাগছে ঠিকই। স্ট্যাটাস কো— কেউ ভাঙতে চায় না। কিন্তু দেখো, ভাল হবে। তা ছাড়া এই বাড়ি তো আর থাকবে না, বিশাল মাল্টি-স্টোরি উঠবে। বড়মার সব ছেলেরই আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট হবে। দরকারে ডাকলে সবাই জড়ো হবে। ভাবছ কেন?

এটা বেদবতী জানতেন না। এই বাড়ি ভাঙা হবে? ভাঙা হবে? বাগবাজারের দেউল-বাড়ি আর থাকবে না? ছাদে মন্দিরের চুড়োমতো একটা আছে বলে একে সবাই দেউল-বাড়ি বলত। বাগবাজার অঞ্চলে ঢুকে দেউল-বাড়ি বললে যে কেউ চিনিয়ে দিতে পারত, সেই বাড়ি ভাঙা হবে? তারপরেই তাঁর মনে হল তাঁর শ্বশুরবাড়ি? সে-ও তো বিক্রি হয়ে গেল! খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। নিজের কোনও জায়গা রইল না। তাঁর নিজস্ব জায়গার বদলে ছেলেদের সবার একটা একটা জায়গা। আক্ষরিক অর্থেই এ হল জায়গা ছেড়ে দেওয়া। ছোটদের জায়গা ছেড়ে দেওয়া।

নিজে অন্তরালে চলে যাওয়া। এই খেলাই খেলা হবে এবার। কিন্তু বাগবাজারের বাড়ি যে একটা বিশেষ বাড়ি।

তিনি ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। মায়ের ঘরটি এখনও তেমনই আছে। পালঙ্কে মোটা বিছানা। আয়নাঅলা বিশাল আলমারি, তিন পাল্লাঅলা ড্রেসিংটেবল। এক কোণে ঠাকুরের সিংহাসন। যখন ঠাকুরঘরে আর যেতে পারলেন না, তখন সর্বমঙ্গলা নিজের ঘরের কোণে সবচেয়ে প্রিয় ঠাকুরটিকে এনে বসিয়েছিলেন। সেই প্রিয় ঠাকুরটি হলেন জগদ্ধাত্রী। একটা ছবি। এ বাড়ির বার্ষিক জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন। বাবা মারা যাবার পরই। কিন্তু মা শয়নে-জাগরণে জগদ্ধাত্রী সামনে রেখে জীবন যাপন করতেন।

—কেন মা? তুমি লক্ষ্মী নিলে না, কৃষ্ণ নিলে না, কালী নিলে না, জগদ্ধাত্রী নিতে গেলে কেন?

সর্বমঙ্গলা ঘরের হাওয়ার মধ্য থেকে স্বর হয়ে বলে উঠলেন— বুঝলি না খুকি? আমরা যে সব মহামায়ার অংশ রে! মহামায়াই পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ গড়লেন। তিনিই চালাচ্ছেন, সবাই তাঁর অংশ, কিন্তু আমরা মেয়েরা বেশি করে। দেখছিস না যেমন বীর্য, তেমন রূপ, তেমন ক্ষমতা। সব পারেন। তাঁকেই ডাকি। তাঁর ওপর নির্ভর করেই থাকি। যদি তিনি সহায় হন তো সব পারব।

এই বিশ্বাসকে খোঁজেন বেদবতী। তিনি যে কেউ, বিশেষ কোনও শক্তির অংশ এ তাঁর কখনও মনে হয় না। মনে হয় প্রকৃতির খেয়ালে এসেছেন। শরীরের ঘড়ি অচল হলেই পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবেন। এর মধ্যের অংশটুকু যাকে জীবন বলে, তারও তেমন কোনও তাৎপর্য খুঁজে পান না বেদবতী। যে সময়ের যা— পুতুল খেলা, রান্নাবাটি, সংসারধর্ম, সন্তান জন্ম পালন। তাদের সুখদুঃখে সামান্য অংশ নেওয়া, তাদের বিয়ে-থা, অসুখ-বিসুখে সেবা, নিত্যপূজা, ব্যস। এখন আর কিছু করবার নেই। যা করে এসেছেন তা-ও সাগরপারে বসে শিশুর বালি নিয়ে খেলার বেশি কিছু নয়।

মায়ের ঘর থেকে বেড-প্যানট্যানগুলো সরে গেছে। অসুখ আর

ওষুধের গন্ধের জায়গায় ধুনো গুগ্‌গুলের গন্ধ। তিনি জানেন এ কাজটা সেজবউদি করে। তিনি অনেকক্ষণ ঘরটাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখেই বোধহয় পূর্ণা একটা গদি-আঁটা বেতের চেয়ার নিয়ে এসেছে কোথা থেকে, সেজমাকেও ডেকে দিয়ে গেছে।

—কী গো মায়ের নাম জপ করছ? না শোক করছ? নাকি মা কত কষ্ট পেয়ে গেলেন সেই সব ভাবছ?

তিনি চুপ করে রইলেন।

—ভেবে কিছু লাভ নেই বেদো— সেজবউদি বললেন। কণ্ঠে যেন একটু মধু এসেছে।

—আসল কথা কী জানিস নতুন যুগের নতুন দেবতা, মা জগদ্ধাত্রীদের কাল গেছে।

বেদবতী শুনছেন, মন্তব্য করছেন না।

সেজবউদি বললেন, জগদ্ধাত্রী যে আদতে কিছু না, আমাদের দিয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটা কল—এটা তো বুঝিনি। ঠাকরুনও ছাই বুঝতেন।

—বুঝলুম না।

—বুঝবি কী করে? নিজের দুঃখেশোকে বুঁদ হয়ে আছিস। চারদিকে কী হচ্ছে দেখছিস? আমরা জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ নিয়ে সব কী করেছি? কোন কাল থেকে! পান খেয়ে; আঁচলে চাবির গোছা ফেলে, রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর শোবারঘর আর আঁতুড়ঘর করে বেরিয়েছি। কী কাজে লেগেছে রূপ? আর গুণ? কে কত রাঁধতে পারল! কে অসময়ের অতিথিকে নিজের ভাগ ধরে দিল, কে কত উপোস করল। কার কত সহ্য, কোমর বেঁধে কে কত লোক খাওয়াতে পারল; তারপর কপালে সিঁদুর পরে ড্যাংডেঙিয়ে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে গঙ্গাযাত্রা করল— এই তো!

—কী যে বলো! মায়ের একশোর কাছাকাছি বয়স হয়েছিল, তুমি আমি আশি পেরোলুম। এরকম...

সেজবউদি হেসে বললে, বয়স কিন্তু ওই চল্লিশেই শেষ হয়ে গেছে

বেদো, ভেবে দেখো। তোর মা বেঁচেছিলেন চুষিকাঠি নিয়ে— আমি হ্যান, আমি ত্যান, আমার পুরো সংসারে কত নাম কত দাপ। পানটি থেকে চুনটি খসতে দিই না। চুষিকাঠি। তা, আমাদের সে চুষিকাঠিটিও নেই। এ ঘরের তিনটে নাতনি, দুটো নাতি, লাভ ম্যারেজ করেছে। কেটে পড়বার তাল করছে আরও কতক-চাট্টি। আমাদের কথা কেউ শোনে না। বিজয়ার সময়ে একটা করে প্রণাম সবার থেকে পাওনা ছিল। ঠাকরুন যাবার পর তাতেও শর্ট পড়েছে। বলে ধুত, প্রণাম আবার কী! পায়ে কত নোংরা, ছিঃ। হাত জোড় করে নমস্কার করে, কিংবা একটু নিচু হয়ে 'থাক থাক' টুকু শোনবার যা অপেক্ষা, উঠে পড়ল।

বেদবতী হেসে ফেললেন— এই নিয়ে তোমার এত দুঃখু?

—নারে এটা ভূমিকা, আসল কথাটা হল কাগজে দেখছিস না, রেপ রেপ রেপ, জগদ্ধাত্রীর অংশ যেই না বাইরে বেরিয়েছে অমনি রেপ হয়ে যাচ্ছে। চালান হয়ে যাচ্ছে। হিল্লি দিল্লিতে বেবুশ্যে হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। আর গুণ? গুণ নিয়ে সব ঘরেও খাটছে, বাইরেও খাটছে, এত খাটতে খাটতে চেহারাটুকু যাচ্ছে, বর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই তো লাইফ!

সেজবউদির মুখে 'লাইফ'টা খুব মজার শোনাল। বেদবতী মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন— তা তুমি কী করতে বলো!

—আমার বলাবলির কী আছে? আমার 'আইডিয়া'ই নেই। মেয়েরা নিজেরাই দেখাচ্ছে। যার যট্টুকু রূপ আছে, দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। নাইকুন্ডুলি, বুকের ভাঁজ, পাছার মাংস, যার যা আছে দেখাচ্ছে। তাকে বলে মডেল। বেশ্যাতেও লজ্জা পাবে এমন সব রঙ্গ। তবে কী জানিস, পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। অগাধ! শরীর দিতে হচ্ছে না রাতভর, অথচ বাড়ি-গাড়ি। ভক্ত উমেদার। আর সত্যি জগদ্ধাত্রী হলে তো কথাই নেই। সোজ্জা হেমা মালিনী হয়ে যাও। যাই বলিস আর তাই বলিস, এরাই এই ছ্যাঁচড়া সমাজকে কলাটা ঠিকঠাক দেখাল। ঠাস ঠাস করে চড় যাকে বলে। বেশ করেছে।

—তুমি এই যুগে জন্মালে কী করতে সেজবউদি?—বেদবতী মিটিমিটি হেসে বললেন।

—আমি? আমি ব্যায়াম করা মেয়ে, রেপ করতে এলে পাঁচটা জোয়ানকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারি। আর আজকের দিনে আমার যা ছিল, তাতে করে হিন্দির হিরোইন না হোক, বাংলার তো হতুমই। কোল ভরতি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে গয়না পরে শাড়ি পরে পোজ দিচ্ছি। পাঁজা পাঁজা টাকা। তখন আমি তোর এই বাগবাজারের দেউলে-বাড়ির পরোয়া করতুম নাকি? যে নাতবউরা আজ ক্যাটক্যাট করে কথা শোনায়, তাদের নাগালের মধ্যেই থাকতুম না। এখানে থাকলে থিয়েটার রোড কি সল্ট লেক, বম্বেতে থাকলে বান্দ্রা কি জুহু, আর বিদেশে থাকলে ক্যালিফোর্নিয়া, আহা কী শহর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সেজবউদি কিছু দিন আগে তার বড়দার নাতনির বাড়ি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ঘুরে এসেছে, মোহিত একেবারে।

বেদবতী বললেন—সে দেশে তো শুনতে পাই, বুড়োবুড়িরা সব নিজে নিজে করে, লোক রাখা যায় না, গাড়ি চালিয়ে সব জায়গায় যেতে হয়। কম হ্যাপা!

গর্বের হাসি হেসে সেজবউদি বললে—দুর দুর— আমি তো হিরোইন! হিরোইনরা লোক রাখতে পারে, গাড়ি যখন নিজে চালাতে পারব, চালাব, নইলে আমার শফার কিংবা বয়-ফ্রেন্ড চালাবে!

—বয়-ফ্রেন্ড!

—হ্যাঁ, সে দেশে কুড়ি পঁচিশ বছরের ছোট জোয়ানকেও বিয়ে করা যায়। দিব্যি থাকে। লিভ-টুগেদার। যদ্দিন ইচ্ছে হল রইলে, ইচ্ছে গেল তো নেই নেই। তোর সেজদার কথা এর মধ্যে আসছে না বেদ। এ হল 'যদি হতে পারতুম,' সেই 'যদির' কথা। নে এবার তুই যত খুশি গালাগাল দে—বলে সেজবউদি শাঁখ বাজাল গাল ফুলিয়ে। তারপর চলে গেল।

বেদবতী হাঁ করে বসে রইলেন। সত্যি কথা, জগদ্ধাত্রী না হলেও সেজবউদির খুব চটকদার চেহারা ছিল। চুল তো এখনও দেখবার। রুপোর সুতোর মতো ঢেউ খেলানো, ধবধবে আলোর মতো রং।

সোজা লম্বা চেহারা, চারটি ছেলেমেয়ে, সে বোঝবার জো নেই। সেজবউদির মা নানারকম জানতেন। বাচ্চা হতে প্রত্যেকবার যেত, আর যেন আরও কমবয়সি, কুমারীটি হয়ে ফিরত সেজ। মুখ চোখ আহামরি না হলেও ওই চটক। তার জন্যে কম খোঁটা শুনতে হয়েছে মায়ের কাছে। 'বউমানুষের অত সাজগোজ!. অত চোখে কাজল, গালে পাউডার কী গো! সবসময়ে যেন নেচে আছে! ঘরের আয়নাগুলো এবার লোক ডেকে ভেঙে দোব।'

শেষ মাতঙ্গী

মাতঙ্গী পালিয়ে গেছে। রক্কার প্রথম সন্তান ভগর ঔরস-এর কন্যাটি পালিয়ে গেছে। গহনে আরও গহনে। সম্ভবত যেখানে কালো লোকেরা থাকে। ওদের দস্যু বলা হয়। কেউ কেউ মাতঙ্গীকে এমনি এক দস্যুর সঙ্গে দেখেছে। রক্কা চুপ করে থাকে। সে জানে। সব জানে। নিমেষের অত্যাচার যেমন তার সইছে না, তেমন তার মেয়েরও সইত না। নিমেষ বোধহয় নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবে। সে যা চায় তা-ই পাবে, তা-ই তাকে দিতে হবে। সে যা পছন্দ করে না, তা পল্লিতে হতে পারবে না। রক্কার জন্য মধুরাকে মারল, গোঁয়ার রক্কাকে বশ করতে পারল না। তাকে সবসময়ে বেঁধে রাখত। হাতের কবজিতে বাঁধন, পায়ের গোছে বাঁধন, গলায় পর্যন্ত একটা আলগা বাঁধন গোরুর মতো। যখন চাইল রক্কাকে সে নিল। রক্কা দাঁত দিয়ে কামড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, নিমেষ হেসেছে খালি। আর নিমেষের দেখাদেখি দলের পুরুষগুলি তাদের নারীদের ওপর প্রভুত্ব করে চলেছে। কোথায় গেল সেই সব মত্ত মধুর দিন যখন মুক্ত আকাশের তলায় চরত মুক্ত মানুষের দল। নিয়ম থাকত, আরক্ষা দিত নেত্রী। কিন্তু সেটুকু বাদে সবাই স্বাধীন। এখন নারীগুলি শস্য প্রস্তুত করে, শস্যঘরের পরিচর্যা করে, খাদ্য প্রস্তুত করে, শিকারে যাওয়া নিষেধ। সব নারী কোনও না কোনও পুরুষের অধিকারে। এক

পুরুষের একাধিক নারী থাকছে, নারীর একাধিক পুরুষ থাকছে না। বংসগুলি আর গোষ্ঠীর নয়, কে রক্ষার, কে শল্লার, কে বভ্রুর এবং সবাই সমস্ত গোষ্ঠীর—এমন আর নেই। কে নিমেষের, কে শম্পর, কে জনারের, কে কল্পর—এইরকম। এক নির্দিষ্ট পুরুষ ছাড়া অন্য কারও সন্তান গর্ভে ধারণ করা অনাচার—রটাচ্ছে নিমেষ। এবং তাই— মাতঙ্গীকে সে দেখতে পারে না। সপাসপ বেতগাছের লতানে ডাল দিয়ে সে মাতঙ্গীকে মারত, কত ছোট থেকে। মাতঙ্গী রক্ষারই মেয়ে, সে একটু বড় হতেই আর ঘরে থাকত না। কেন থাকবে? মায়ের হাতে পায়ে বাঁধন। মুখে অব্যক্ত সব ধ্বনি দিয়ে রক্ষা শুধু তার মেয়েকে আদরই করতে পারত। মাৎ মাৎ মত্ত মাতঙ্গ। ভগের কন্যা ভগিনী অগিনী অগ্নি। রক্ষার মেয়ে, রক্ষার কন্যা, অশোকগাছের ফুল আমার, বটবৃক্ষের মূল...এমন কত কথা। তা থেকেই আধো-আধো বোল ফুটল মেয়ের। দিনে দিনে বন্দিনি থেকে রক্ষা দুর্বল হয়ে গেছে, নিমেষ তাকে কম খাবার দেয়। যাতে শরীরে শক্তি না হয়। এখন সে কেমন ফ্যাকাশে, নির্জীব, তিন চারটি সন্তান নিমেষের ঔরসে হয়েছে, সে তাদের রক্ষা করতে পারেনি। দুর্বল, অসন্তুষ্ট, রুষ্ট মায়ের দুর্বল সন্তান। মরে গেল দুটো, আর দুটো নিমেষ সূর্যা বলে এক নারীকে দিল রক্ষা করতে। রক্ষার কুটিরে এখন সেই-ই বিরাজ করছে। রক্ষাকে এখন প্রহার করা ছাড়া আর কোনও কারণে দরকার পড়ে না নিমেষের। সে সূর্যাকে নিয়েই থাকে, ওষধি বলে আরও একটি অতি অল্পবয়সি মেয়ে আসছে আজকাল। সগর্বে নিমেষ বলে থাকে, আরও আসবে, আরও নারী আনব। আমার সেবা করবে, ঘর দেখবে, শস্য দেখবে, এত সন্তান ধারণ করবে যে এই পুরো গ্রামটাই নিমেষের হয়ে যাবে। যে যেখানে আছে সব নিমেষের সন্তান।

দুর্জনের সন্তান দুর্জনই হবে—মনে মনে বাঁকা হাসি হেসে হেসে বলে রক্ষা। সে মাঝে মাঝেই দাঁত দিয়ে তার হাতের বাঁধন দুটি কামড়ে কামড়ে ক্ষইয়ে ফেলে, কিন্তু নিমেষ অসম্ভব চতুর। সে প্রতিদিন এসে বাঁধনগুলো পরখ করে। ক্ষয়ে গেলে নতুন বাঁধন পরায়।

একদিন সে বলেছিল—আমাকে দিয়ে আর তোর কী দরকার

মিটবে? ছেড়ে দে না এবার! নিমেষ ক্রূর কুটিল অট্টহাসি হাসে। বলে—এই ভাবেই তুই শূন্যে চলে যাবি রঙ্কা, আমার কথা শুনলে আমি যেমন নেতা তুই তেমন নেত্রী হতে পারতিস। শুনলি না। না শোনার শাস্তি তোকে পেতে হবে। আর গ্রামের বাকি সব নারীও দেখুক নিমেষের মতো পুরুষকে অবজ্ঞা করলে কী অবস্থা হয়। তা ছাড়া তুই মাতঙ্গীর মেয়ে রঙ্কা, মধুরাকে পর্যন্ত বশ করেছিলি। ছেড়ে দিলে এখনও কী ঘটাতে পারিস কে জানে! থাক, এই ভাবেই থাক।

সূর্যাকে মিনতি করে রঙ্কা—আমার একটা বাঁধন অন্তত খুলে দে, এই যে একই স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করছি। তোকেই তো পরিষ্কার করতে হয়। দে না খুলে!

সূর্যা বলে—নিমেষ আমায় পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।

—ঠিক আছে, এখন থেকে নিমেষ দুটো জিনিস পাবে, ঘৃণা আর ভয়। মাঝখানে কিছু থাকবে না। কোনও নারী আর তাকে ইচ্ছে করবে না, বাধ্য হবে খালি। কোনও দিন কোনও নারীর চোখে স্নেহ দেখবে না নিমেষ, কোনও দিন না। জন্ম চলে যাবে, রঙ্কা সূর্যা ওষধিরা শূন্যে চলে যাবে, তাদের জায়গা নেবে মাতঙ্গী, সোমা, ধৃতিরা—কেউ, কেউ নিমেষদের স্নেহ দেবে না, অধীনত্ব করবে খালি, বাধ্য হয়ে।

সেই সময়ে সদ্য-তরুণী মাতঙ্গী তার শবরবঁধুর সঙ্গে একটি ঝরনার ধারে খেলা করছিল। এখনও তার সারা গায়ের কালশিটে দাগ সব জায়গায় মেলায়নি। সেই জায়গাগুলোয় শবর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সে মাতঙ্গীকে এখনও লুকিয়ে রাখে। সাদা মেয়ে নিয়ে গেলে তাদের কিল্লিতে কী প্রতিক্রিয়া হবে সে জানে না। তারা সাদাদের ভয় করে। ঘেন্না করে। এই হল্লও তাই-ই করত। একদিন শিকার খেলতে খেলতে অনেক দূরে চলে এসেছে, ঝরনার ধারে দেখে বিদ্যুতের মতো এক কিশোরী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কী হল? একে কি কোনও পশুতে আহত করেছে? সে নিচু হয়ে দেখল, পিঠময় ঘা, বুকের ওপর নীল নীল রেখা। হাত নাড়তে পারছে না, মচকে গেছে। হল্ল দিনের পর দিন তার শুশ্রূষা

করল, এখন আর ঘা নেই, শুকিয়ে গেছে। দাগগুলিও নেই, কিন্তু কালশিটে সব যায়নি। কে মেরেছে?

—আমাদের নেতা—নিমেষ।

—কেন? কী দোষ করেছিলি মেয়ে?

—কোনও দোষ নয়। শুধু জন্মেছিলুম, আমার বাবা ছিল মহান, মানুষের রোগ সারাত, তাকে মেরে ফেলে, আমার আরেক বাবা চাঁদসূর্য পড়তে পারত, তাকে মেরে ফেলে, আমার মাকে লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে নেতা। আমি তার সন্তান নই বলে আমাকে প্রহার করে!

—বটে! হল্ল রেগেও যায়। আবার আশ্চর্যও হয়। এরকম তো তাদের হয় না! তবে হ্যাঁ, ভিন্ন গোষ্ঠীর মেয়ে বা ছেলে পছন্দ করলে রে রে করে ওঠে সবাই। সাদা মেয়ে নিয়ে কী হতে পারে তা তার কল্পনায় নেই। কাজেই ঝরনার কাছাকাছি কুটির করে থাকে মেয়েটি। এখন ফলমূল সংগ্রহ করা, একটু-আধটু শিকার করার মতো বল হয়েছে। সে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মেয়েটি তাকে এমন টান টানে যে সে প্রতিদিন কিছুটা সময় না এসে থাকতে পারে না।

সেদিনও তারা ঝরনার ধারে খেলছিল, কোনও দিকে নজর ছিল না। হঠাৎ অদূরে একটা তির এসে বিঁধে গেল। বাতাসের মধ্যে দিয়ে শাঁৎ করে আসার শব্দটা সে পেয়েছিল। মাথা তুলে হল্ল দেখে, তাদের সর্দার জনাই। কঠিন চোখে সে হল্লর দিকে তাকিয়ে আছে। হল্ল তাড়াতাড়ি দুহাত তুলে ছুটে গেল—মেরো না সর্দার, মেরো না, ও মেয়েটিকে ওরা মেরে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভীষণ আহত ছিল, কোনওক্রমে বেঁচেছে।

জনাই কঠিন স্বরে বলল—সাদা মেয়েরা বহুরকম মায়া তুকতাক জানে। জেনেশুনে তোর মতো বুদ্ধিঅলা ছেলে মায়াবিনীর হাতে ধরা দিলি?

মাতঙ্গী উঠে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে জনাইয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সে এখন কিছু কিছু শবর-বাক জানে। বলল—আমি মায়াবিনী নই। আমার বাবা গাছপালার গুণ জানত, আমার বাবা

চাঁদসূর্যের রহস্য পড়তে পারত। নিমেষ হিংসে করে তাদের মেরে ফেলেছে, আমার মাকে বেঁধে রেখেছে। আমাকে ভীষণ মারত। আমি পালিয়ে এসেছি। আমায় আশ্রয় দাও।

—তুই ডাইনি নোস? ঠিক তো!

—বিশ্বাস করো, আমি তুকতাক জানি না।

কিন্তু বললে কী হবে, হল্ল এবং জনাই অনেক পরামর্শ করে অবশেষে তাকে নিজেদের কিল্লিতে স্থান দিলে কী হবে, মাতঙ্গী একলাই কুটিরে থাকে। কেউ তার সঙ্গে মেশে না। সে বনবাদাড় টুঁড়ে ফেরে ওষধির খোঁজে, অবিকল তার বাবা ভগর মতো। ঘরে ফিরে এসে সব বাছে, আলাদা আলাদা করে সেদ্ধ করে। কীসের কী গুণাগুণ। হল্লদের কিল্লিতে এক বৃদ্ধাও গাছপালার গুণাগুণ জানত। সে একদিন রটিয়ে দিল—সাদা মেয়েটা ডাইনি। ও যেসব গাছপালা জড়ো করছে, সবেতে নাকি বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। সাদারা ওকে পাঠিয়েছে তাদের, শবরদের নিস্তেজ করার জন্য। জনাই লোক ঠিক করল—মাতঙ্গীর ওপর চোখ রাখবার জন্য।

মাতঙ্গী হরিণের সঙ্গে খেলা করছে। তার কাঁধে খরগোশ, কোলে খরগোশ, জলের সময় আসছে। আকাশে ঘন নীল মেঘ। ময়ূর কাঁ কাঁ করে ডেকে উঠল, মাতঙ্গী শুনল মা মা। ছোট থেকে সে বনে ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছে। পশুপাখিদের ভাষা সে অন্যদের চেয়েও ভাল বোঝে। সে চট করে উঠে লুকিয়ে পড়ল, আর তার কিছু পরেই তির-ধনুক নিয়ে এক সাদা তরুণ, ঝরনার জলে জল খেতে নামল। ও কী? ও যে কুরঙ্গ—তার ভাই। তার আপন মায়ের পেটের ভাই।

মাতঙ্গীর মনে হল তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। একবার—একবার তার নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সে কি কথা বলতে পাবে না? মা? মা কি এখনও আছে? নিমেষ আর কত অত্যাচার করবে?

মৃদুস্বরে সে ডেকে উঠল—কুরঙ্গ?

চকিতে পেছন ফেরে কুরঙ্গ। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মাতঙ্গী।

—তুই বেঁচে আছিস মাতঙ্গী? মাতঙ্গী! মাতঙ্গী! কুরঙ্গ চোখে কুয়াশা নিয়ে ডাকে। হতে পারে সে নিমেষের বলাৎকারের জাতক, হতে পারে তাকে সূর্যা বড় করেছে, কিন্তু সেও তো রঙ্কারই ছেলে! মায়ের পরিচয়ই পরিচয়। বাবা কে? বাবার ভূমিকা অস্পষ্ট।

—আছি। তোদের খবর কী? মাতঙ্গী জিজ্ঞেস করল। কোনও না কোনও দিন সে রঙ্কাকে মুক্ত করবেই।

—সুখের কথা, নিমেষের চুলগুলি সাদা সাদা হয়ে এসেছে।

—তাতে কী হবে?

—এবার যে কোনও দিন...কেমন সুদূর দুর্বোধ্য একটা হাসি হাসে কুরঙ্গ।

—যে কোনও দিন কী?

জবাবে কুরঙ্গ নিজের হাত বুকের পেশিটা ফুলিয়ে দাঁড়াল। উঁচু পাথরে একটি পা, নিচু পাথরে আরেকটি পা, তার ওপর দিয়ে কুলকুল করে ঝরনার জল বয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর ময়ূর কাঁ কাঁ করে উঠল, ভাইবোন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, 'যে কোনও দিন কী' কুরঙ্গর আর বলা হল না। একটি দীর্ঘ তির তার দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বিষাক্ত তির, যাকে বলে লিপ্তক। যন্ত্রণার্ত বিস্মিত চোখ দুটি একবার ওপরে তুলল কুরঙ্গ, তারপর আছড়ে পড়ল ঝরনার জলে।

কুরঙ্গ! কুরঙ্গ! মাতঙ্গী ভাইয়ের বুকের ওপর তার ক্ষতস্থান ঢাকতে যায়, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। ওঠো কুরঙ্গ, আমি এখুনি ওষধি আনছি, কুরঙ্গ ক্রমশ নীল হয়ে যেতে থাকে। এবং আস্তে আস্তে মাতঙ্গীকে ঘিরে দাঁড়াতে থাকে একটার পর একটা কালো কালো ছায়া। নিঃশব্দে।

—এ আমার ভাই। একে মারলে কেন?—তেড়ে ওঠে মাতঙ্গী।

কেউ জবাব দেয় না। তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। জনাই গম্ভীর গলায় বলে—আমি তো বলেইছিলাম হল্ল, ওকে সাদারাই পাঠিয়েছে। আমাদের সুলুক-সন্ধান দিতে। নজর রেখেছিলাম বলেই না আজ ধরা পড়ল!

হল্ল বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু যা নিজের চোখে দেখেছে তা অবিশ্বাসই বা করে কী করে? সে মিনতি করে, মাতঙ্গীকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হোক। সে কী বলতে চাইছে শোনা হোক। কিন্তু তাতে হল্লকেই সবাই মারতে যায়। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে চারপাশ থেকে আগুন জ্বেলে মাতঙ্গী ডাইনিকে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। ঢোল বাজে, চিৎকার করে আনন্দ করতে থাকে সবাই। বৃদ্ধাটি ফোকলা দাঁতে হেসে বলে— বলেছিলাম। তোরা বিশ্বাস করিসনি। ওই দেখ ডাইনি পোড়ানো আগুনটাসুদ্ধু কেমন সাদা হয়ে জ্বলছে।

তেমন কিছু কেউ দেখতে পেল না। কিন্তু সবচেয়ে বয়স্ক বুদ্ধিমতী বুড়ি, যে নাকি সকলের রোগ সারায়, তার কথা কি অবিশ্বাস করা যায়? সবাই বলতে লাগল দেখ, দেখ কেমন সাদা আগুন জ্বলছে। ডাইনি পুড়ছে কিনা?

শুধু শিশুগুলি মুখে আঙুল পুরে বোকার মতো চেয়ে রইল। তারা তো হলদে আগুনই দেখছে। কে জানে। বড়দের চোখ যা দেখে, ছোটদের চোখ বোধহয় তা দেখতে পায় না।

এইভাবে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গীর বংশ শেষ হয়ে গেল।

খনামিহিরের ঢিপির দিকে

খাতাটা মুড়ে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল রঞ্জাবতী।

—কখন এত সব ভাবলেন, লিখলেন ভাই!

নিবারণ অন্য লোকদের মতো নয়। শহরের পরিশীলিত কায়দাদুরস্ত জ্ঞানীগুণী লোক দেখলে হাত কচলায় না। চোখ নিচু করে বিনয়ে গলে যায় না। খুব শান্ত। দৃঢ় অথচ নম্র ব্যক্তিত্বের ছেলেটি।

—এই সব দেখি দিদি, সাজাই গোছাই, রেফারেন্স বই পড়ি, ভাবি। সমস্ত ইতিহাসটা কেমন ঘুমের মধ্যে, দিবাস্বপ্নের মধ্যে দেখি। দেখি যেন সত্যি-সত্যি ঘটছে। কিছু মনে করবেন না— যেই আপনি এসে

দাঁড়ালেন, আমার মনে হল এ মুখ যেন আমি কোথায় দেখেছি।

—জার্নালে-টার্নালে দেখে থাকতে পারেন। রঞ্জা বলল। কাগজে-টাগজেও... অনেক সময় বড় কনফারেন্স বা হিস্ট্রি কংগ্রেসের ছবি তো বেরোয়।

—হতে পারে দিদি... যেন সায় দিয়ে নিবারণ বলল... ইতস্তত করে বলল, জানি না আমার মনে হল এ মুখ অনেক অতীতকালের জল ঠেলে ঠেলে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। বলছে দেখো, যা সত্যি তা সত্যিই। স্বপ্নে সত্যের প্রতিভাস ফোটে। এই তোমার রঞ্জা। বিবর্তিত হতে হতে হতে হতে আজ উলটে পালটে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

রঞ্জা চমকে উঠল। সামনে কোনও অতীতদর্শী কবির চোখ। কবি মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পায় লক্ষ লক্ষ বছরের সার। নিংড়ে বার করে দিতে পারে তার নির্যাস সামান্য ক'টি শব্দ চতুর্দিকে। মানুষ, প্রকৃতিতে, অতীত বস্তুতে, বর্তমান বস্তুতে মিল দেখে। কবি কিনা জাতিস্মর!

বলল—দেখুন দিদি। এই ফলকটা— পুরুষটি নারীটিকে চাইছে, ওপরে একটা ফাঁসের মতো দড়ি। কেন?—শাস্তির ভয় দেখিয়ে মিলনে বাধ্য করছে ওকে পুরুষটি। কতকাল আগে। এটা দেখেই আমার রঙ্কার হাত-পা-গলার দড়ির কথা মনে আসে। আর ইতিহাস তো বলছেই, তার প্রজনন ক্ষমতার জোরে আদি সভ্যতায় নারীই ছিল নেত্রী, পরিচালিকা। নারী-পুরুষের মিলনে তখন কোনও নিয়ম তৈরি হয়নি, কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। যে যাকে যখন চাইত অপর পক্ষ রাজি হলে অসুবিধে হত না। জোরজুলুম কি আর ছিল না। কিন্তু সে-ও বিলাস, লীলা! দিদি আপনি কিছু মনে করছেন না তো?

রঞ্জা হাসল, হাসিতে মুখটা একটু লাল হয়ে থাকবে। বলল—সত্য নিয়ে, সত্যের সন্ধান নিয়ে আমাদের কারবার, এগুলো সব তথ্য নিবারণ। মনে করার কী আছে?

আর দেখুন, এই যে নারী-পুরুষের বিবাদের একটা ট্যাবলেট। কী চিরন্তন দৃশ্য। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে, প্রতি জায়গায় ঘটছে। দেখুন যেন নারী-পুরুষই নয় শুধু, যেন দুটো বিবাদী শক্তি, দুজনেই জিততে চাইছে।

তাদের মধ্যে মিল সামান্যই। অমিল গভীর। দুজনের চাওয়া পরস্পরের পরিপুরক নয়। নারীকে মেরেধরে বেঁধে কঠিন শাস্তি দিয়ে তবে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে পুরুষের কথায় সায় দিতে।

রঞ্জা হাসি হাসি মুখে বলল—এই ফলকটা যা বলছে তার থেকেও অনেক বেশি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

একটু অপ্রতিভ হল নিবারণ, তারপর হার-না-মানা গলায় বলল, এটা প্রতীকী। দেখুন দিদি নারী-পুরুষের মিলনের কত অজস্র ছবি আমরা পাই, পাথরে পাথরে উৎকীর্ণ রয়েছে। কোনার্ক, খাজুরাহো। দেখি বীরপুরুষের মূর্তি, বীরাঙ্গনা নারীর মূর্তি গ্রিক রোম্যান আর্টে। আমাদের চেনা অভিজ্ঞতা বলেই তো আঁকেন, গড়েন শিল্পী। কিন্তু এই যে বিরোধ, যা সত্য, ফ্যাক্ট, যা আজকের আপনাদের এই ফেমিনিস্ট জাগরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। একে শিল্পীরা কেন উপেক্ষা করলেন? মিলন মুহূর্তের দিদি, বিরোধ চিরদিনের, প্রতিদিনের...

নিজের আবেগে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল নিবারণ। রঞ্জা চোখে কৌতুক নিয়ে বলল, এখন বুঝতে পারছি আপনি বিয়ে করেননি কেন?

সে হাসল, বলল— ঠিক জায়গায় আপনার হাত পড়েছে দিদি। এই বিরোধ আমি দেখেছি আমার বাবা-মার মধ্যে। দুজনেই খুব তেজি। দুজনেরই নিজস্ব মতামত খুব জোরালো ছিল। সামান্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাবা চাইতেন আমি শহরে যাই, ইঞ্জিনিয়ার হই, মা বলতেন— ও তো পুতুল গড়ে, দেখো না ও আকাশ মাটি জল কীরকম ভালবাসে? ওকে যন্তরের হাতে দেবে? খবরদার না! ও শিল্পী। সে প্রায় হাতাহাতি অবস্থা। বাবার মত তো আমি মানলামই না, মায়েরটাও না —আমি গড়ি না, দেখি বা পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করি। ভাল আছি। ভালই আছি।

রঞ্জা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল নিবারণের দিকে। এখন তার মনে হল ছেলেটি একটা সত্যকে স্পর্শ করেছে। সত্যিই যেই মেয়েরা পুরুষদের মতো শিক্ষিত, সংস্কৃত, কর্মী হচ্ছে অমনি প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এত ডিভোর্স, এত কামড়াকামড়ি, চাকরির

জায়গায় মেয়েদের এত অপমান, র‍্যাগিং যাকে বলে— সত্য তো! পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতেও প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু তা বোধহয় এমন ভয়ংকর নয়। এটার চরিত্র আলাদা। এখানে একটা লিঙ্গগত বিরোধের মানসিকতা কাজ করছে।

—যাই হোক, রঞ্জা বলল— খনামিহিরের ঢিপিটা আজ ভাল করে দেখব। চন্দ্রকেতুতে আমার আগ্রহ আছে। কিন্তু কেন্দ্র ওই খনামিহিরের ঢিপি।

—খনার উত্তরাধিকারিণী তো আপনি, তাই! রঞ্জা থেকে খনা... একটু লজ্জা-লজ্জা মুখে সে বলল।

—যা বলেন— রঞ্জা হাসল— স্থানীয় লোকেরা ওটাকে 'দমদমা' বলে কেন ভাই?

—আর বলবেন না। অজন্তার গুহায় যেমন লোকে রান্না করে খেত। আগুনের কালি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ছবির, সেই একই বৃত্তান্ত। কোনও একসময়ে ঢিপিটাকে চাঁদমারি বলে ব্যবহার করত ইংরেজ সৈন্যরা। বন্দুক ছুড়লে আওয়াজ হত দমদম। তার থেকে দমদমা।

খনাকে নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন খনা সিংহল-কন্যা। সিংহলের রাজার মেয়ে। সিংহলের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ইতিহাসের কথা ভেবে দেখলে সিংহল-কন্যার ভারতের বধূ হওয়ার কাহিনি এমন কিছু অবিশ্বাস্য নয়। নামটাও যেন কেমন। খনন-এর খন্ ধাতু থেকে কি?

—বারবারই সব বলছে 'খনা' মানে জ্ঞানী। খনার বচন মানে জ্ঞানীর বচন। রঞ্জা নিবারণকে জিজ্ঞেস করল।

নিবারণ বলল— হরিচরণ বন্দ্যো তো বলছেন তিব্বতি রুট থেকে এসেছে শব্দটা, তিব্বতি রুট ম্‌খন, উচ্চারণ খন।

ব্যাখ্যাটা পছন্দ হল না রঞ্জার। হঠাৎ দুম করে তিব্বতি রুট এসে গেল কোথা থেকে? আশ্চর্য তো! খনা শব্দটা কিন্তু ভীষণ দেশি শব্দের মতো শোনায়। তৎসম নামগুলোর একটা পরিষ্কার মানে থাকে, কিন্তু দেশি নাম, আদর করে দেওয়া নামের কি সব সময়ে মানে থাকে? টুকি, টুকু,

বুবু, বুবাই, মনা, রুনা, —এসব নামের কি মানে আছে? খনা বাংলাতেই বা বচন তৈরি করলেন কেন? তবে কি তিনি বাংলার বউমা! এখানে এসে বাংলা শিখে গিয়েছিলেন মাতৃভাষার মতো? নাকি তিনি বাংলারই মেয়ে!

যদি বর্ষে ফাল্গুনে
শস্য হয় দ্বিগুণে ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥
নিত্যি নিত্যি ফল খাও
বদ্যি বাড়ি না যাও ॥
পটোল বুনলে ফাল্গুনে
ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥

আশ্চর্য, এত বচন! এবং যুগের পর যুগ বাংলার কৃষকরা এগুলো মেনে ফল পেয়েছেন, কিন্তু সারা বাংলায় আর কোথাও খনার ভিটের কথা শোনা যায় না, একমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগনার এই দেউলিয়া বা বেড়াচাঁপায় এই ঢিপিটি। একে খনন করে আশুতোষ মিউজিয়াম অনেক মূল্যবান আবিষ্কার করেছেন। কোথাও কোনও বিভ্রান্তি নেই। খনা তুমি এই বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগনারই। এই-ই তোমার আসল ভিটে।

খনামিহিরের ঢিপির মধ্যে বিখ্যাত মন্দিরটি দেখে স্পষ্ট নালন্দার আর্কিটেকচার মনে পড়ে যায়। ওইরকম পাতলা পাতলা, পালিশ করা ইট। গুপ্ত যুগের সঙ্গে সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি সত্যিই এই বাংলার দেউলিয়া গ্রাম থেকে এক গ্রামপণ্ডিত, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ সুদূর উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যর সভায় যাতায়াত করতেন? অসম্ভব কী! আজকের এম এল এ-রা যেমন পার্লামেন্টের অধিবেশন চলার সময়ে দিল্লিতে আসেন! বরাহ ও তৎপুত্র মিহিরের স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসস্থান নিশ্চয় ছিল উজ্জয়িনীতে। রাজার নবরত্ন সভার সদস্য বলে কথা! খনার পাণ্ডিত্যের কথাও রাজা জানতেন। একবার সভায় একটি দুরূহ গণিতের

প্রশ্ন করে বসেন, বরাহ পারেন না। মিহির পারেন না। খনাকে ডেকে পাঠানো হয়, তিনি পারেন। কিন্তু শ্বশুর ও স্বামীর এই অপমানে লজ্জিত খনা নাকি নিজের জিব কেটে ফেলেছিলেন। কেটে ফেলেছিলেন, না কেটে ফেলা হয়েছিল, বরাহ অথবা মিহির অথবা উভয়ের আদেশে! দুটোই সম্ভব। শ্বশুর-স্বামী তো পারেনই। বউমারাও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বহু দুরূহ আত্মত্যাগ করে এসেছেন যুগে যুগে।

—দিদি, কিছু ভাবছেন?

—আমি ভাবছিলুম খনা নির্যাত নারী।

আশ্চর্য হয়ে নিবারণ বলল— নারীই তো! কেউ তো বলেনি তিনি পুরুষ। খনা, লীলাবতী —উভয়কে তো আমরা প্রাতঃস্মরণীয় বিদুষী বলেই জানি।

রঞ্জা বলল— না, আসলে প্রাচীন কথার একটা সত্য ভিত্তি থাকেই, কিন্তু অনেকে বলেন না, ডাকের বচন! —অসংলগ্ন রঞ্জার কথা। কিন্তু তার মধ্যে থেকে তার দ্বিধা বেরিয়ে এল।

—না, না খনার নারীত্ব নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করবেন না দিদি।

কার্তিকের উন জলে।
দুনো ধান খনা বলে ॥
উঠোন ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষ্মীর দশা ॥

—এসব একেবারে মেয়েলি ভাষা। মেয়েদের বলা ছড়ার মতন।

মন্দিরের অদ্ভুত গহ্বরটি দেখে আস্তে আস্তে ফিরতে থাকে রঞ্জা। গভীরতা ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩৭টি ধাপ তির্যকভাবে কমতে কমতে পৌঁছেছে ভিত্তিভূমি পর্যন্ত। আশ্চর্য সুন্দর। সম্ভবত কুয়োর মতো এই গহ্বরটি মূল স্তম্ভটির আধার। এই ধরনের গঠন মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুরের মন্দিরেও আছে। আর কিছুর সঙ্গে যদি মিল পায় তার গবেষকরা। আজ ওদের কেউই সঙ্গে নেই। লেখালেখির কাজ করছে লাইব্রেরিতে।

আজ নিবারণের বাড়িতেই থাকতে হবে। ধূলিধূসরিত রঞ্জা পথ চলে। ক্লান্তিতে অবসন্ন। উৎখনন দর্শন করে এমন অবসন্ন হয়েই তো ফেরবার কথা। কিন্তু তার অবসাদের কারণ কিছু জটিল।

কাল সন্ধেয় বাড়ি ফিরে সে একটি উত্তেজিত ফোন পায়। নিশীথ। ভদ্রতার মুখোশ খুলে, আদিমানব বেরিয়ে পড়েছে— আর নয়, আর নয়, আর চলছে না!

—কী চলছে না নিশীথ!

—আপনার মেয়েকে নিয়ে আর চলছে না!

—কেন বলো তো!

—ও কিছু করে না। করতে চায় না।

—মানে? তুমি তো জানতে ও চাকরি করবে না, তা ছাড়া তোমার কি টাকার খুব অভাব?

—চাকরি তো নয়ই, বাড়িতেও কিছু করে না।

—তা হলে তোমার সংসারটা চলছে কী করে? খেতে পাচ্ছ না? না জামা-কাপড় ঠিকঠাক পাচ্ছ না, জুতো পরিয়ে দিচ্ছে না? টাই! তা-ও না। শায়রী তো শুনছি ক্লাসে র‍্যাংক রাখছে।

—ওহ শিট, ওসব কিছুই নয়। একটা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে ও যাবে না। বাড়িতে এনটারটেইনও করবে না।

—কেন? ওকে দাও তো!

—হ্যাঁ মা, বলো। কোনওক্রমে সুদূর থেকে, অশ্রুনদীর মধ্য থেকে বলে উঠল ঈশা। তুই কোথাও যাস না? কারও সঙ্গে মিশিস না? কাউকে বাড়িতে ডাকিস না?

—যাই তো মা! প্রতি সপ্তাহে একই বাড়িতে গিয়ে একই সঙ্গ একই কথা আমার ভাল লাগে না মা। নিজেদের মধ্যে কি সময় কাটানো যায় না? বাবা, মা, মেয়ে! আমরা কাটাতুম না? বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না! আমার ভাল লাগে না, ভাল লাগে না...!

—নিশীথ, কথাটা তো ও ঠিকই বলেছে। নিজের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভাল লাগে না তোমার? স্পিকারটা চালু করে দিয়েছে রঞ্জা।

গর্জন করে ওঠে নিশীথ— না, ভাল লাগে না। ক্যান শি টক! কী কথা আমি বলব ওর সঙ্গে?

—কী কথা তুমি ওর থেকে প্রত্যাশা করো জানি না। তোমার সাইবার ওয়র্ল্ড-এর কথা তো ও বলতে পারবে না— একটা কম্প্রোমাইজে এসো।

—সেটা তো আমি একাই করে যাচ্ছি। আর চলে না। আমার কলিগ বারোজনকে বাড়িতে ডাকা জরুরি— শি ইজ আনউইলিং।

—বারোজন? কাপ্‌ল নাকি? তার মানে চব্বিশজন? মাই গড নিশীথ! ইটস অ্যান ইমপসিব্‌ল প্রপোজিশন!

—আমার মা তো করতেন!

—তিনি হয়তো পারতেন। তাঁর ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ছিল। তোমার বউ পারে না... অত বাসনই কি আছে তোমার ওখানে?

ঈশার গলা ভেসে এল— দেখো না মা আমি বলছি হয়, তিনটে করে কাপ্‌ল বলো— আমার সে বাসন আছে। আর নয় কেটারার বলে দাও, জেদ ধরেছে, যা বলছে তা-ই করতে হবে। আমি পারব না। আমার ভীষণ শরীর ক্লান্ত লাগে, শায়রীর পরীক্ষা, সাঁতার নাচের ক্লাস। বড্ড খাটুনি মা একটুও বিবেচনা...

নিশীথ আবার গর্জে উঠল— ঠিক আছে। তুমি পারবে না এবং আমার স্ত্রী হতে হলে পারতে হবে। উই আর ডিফরেন্ট। লেট্‌স পার্ট।

—নিশীথ শোনো নিশীথ— সে গলা তুলল— স্ত্রীর সঙ্গে এ ভাবে কথা বলবে না। আই কমান্ড।

—কে আপনার কমান্ড শুনছে! আমি ডিক্টেটেড হই না।

—অর্থাৎ ডিক্টেট করো। ভাল। পাঠিয়ে দাও। ওদের পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

তুমুল একটা গর্জন, কান্না, ভেসে এল। তারপর টেলিফোন যন্ত্রটা নীরব হয়ে গেল। কিছুতেই আর লাগাতে পারল না রঞ্জা। বোধহয় নামিয়ে রেখেছে। বহুবার চেষ্টা করেও পারেনি। সুইচ অফ্ করে রেখেছে, তা-ও হতে পারে। হাতে কড়া, পায়ে কড়া, গলায় গোরুর দড়ি।

রঞ্জা সারারাত ধরে এপাশ ওপাশ করছে, রেগে অধীর হয়ে যাচ্ছে, রাগ গলে বেরিয়ে আসছে লাভাস্রোতের মতো। গাল পুড়ে যায়। হৃদয় পুড়ে যায়।

সুবীর বলল— ফট করে তুমি বললে কেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। চিরকালের গোঁয়ার। রাগি তুমি। রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

—ও যে বলল আর চলে না, লেট্স পার্ট— তার পরেও? আত্মসম্মান নেই একটা?

—আত্মসম্মান? ওই এক হয়েছে তোমাদের এই আজকালকার মেয়েদের। আত্মমর্যাদা! কেন, আমাদের বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমাদের মধ্যে ঝগড়া হত না? তাতে সব পার্ট করে যেত!

—বাপের বাড়ি চলে যেতেন ওঁরা সুবীর। দু মাস তিন মাস... তারপর কর্তা হাতে পায়ে সেধে নিয়ে আসতেন!

—হ্যাঁ, আবার আরেকটা বিয়েও করে নিতেন...

—ঠিকই, ঠাকুমা, দিদিমারা আবার সেটা করতে পারতেন না। স্যাড।

—কী বলতে চাইছ?

—কী আবার বলতে চাইব? সমাজ তাঁদের যে স্যাংশন দেয়নি, পুরুষদের তাই দশ গুণ করে দিয়ে রেখেছিল। শোনো, তুমি ঠাকুমা-দিদিমাদের কালের কথা প্লিজ তুলবে না। আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়, অন দেয়ার বিহাফ!

—মাথায় আগুন জ্বললে চলবে না হে, ডেজ আর ক্রিটিক্যাল! ওই পার্ট-এর মানে কী জানো? আমরা চলে যাওয়ার পর অকূল সমুদ্র। নো সিকিওরিটি। ডিভোর্সি জানলে খ্যাপা কুকুরের দল...

—যাক, রঞ্জার মুখ তিক্ত হাসিতে ভরে গিয়েছিল, —এতক্ষণে কথাটা স্বীকার করলে, খ্যাপা কুকুর। দা রাইট ডেসক্রিপশন...

তার টাকার জোর আছে বলে সে টেলিফোনটাকে মূক পর্যন্ত করে দিতে পারে? এ কেমন মানুষ?

পরদিন ভোরবেলায় উঠে সে আবার চেষ্টা করল মোবাইলে। বেজে বেজে থেমে গেল। যাক বাজছে তা হলে। তারপরেই মনে হল— ভোর

ছটার সময়ে কী করে ফোন ধরবে ঈশা! হয়তো কাল রাত একটায় শুয়েছে, কিংবা দুটোয়। এখুনি সাতটার সময়ে পড়িমরি করে উঠে পড়তে হবে। স্বামীর ব্রেকফাস্ট, মেয়ের স্কুল...।

সকালে তার লাল চোখ আর কাঁধের গুছোনো ব্যাগের দিকে তাকিয়ে নিবারণ বলল— এখুনি রেডি? আমি ভেবেছিলাম আজ আপনাকে কিছু প্লেট দেখাব। আসলগুলো আশুতোষ মিউজিয়ামে চলে গেছে।

—না ভাই, আমি বাড়ি যাচ্ছি, খুব দরকার!

একটু থতমত খেয়ে গেল নিবারণ, কিছু বলল না।

ধুলো উড়ছে। অকূল অনন্তকালের ধুলিবারিধি থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছে। চোখ মুখ, শাড়ি সব ধুলিগ্রস্ত করে দিচ্ছে। নিজের শাড়ির ভাঁজের ধুলোর দিকে চেয়ে সে ভাবল— এইটাই আসল চেহারা আমার হে কালের ঈশ্বর, যতই অতীত খুঁড়ি, এক কণা আলো যদি বেরোয়, তার একশো গুণ ধুলোয় ভরে যায় সব। ধুলোই জীবন। ধুলোই সত্য। অথচ আমরা ভাবি, যখন জীবন আরম্ভ করি বাবা-মার স্নেহাশ্রয়ে, কিংবা স্বামীর শয্যায়, নিজের রসুইঘরে... আমরা ভাবি জীবন কত সরল। আনন্দ কী সহজপ্রাপ্য। জীবনটা একটা 'সব পেয়েছির দেশ' হয়ে উঠতেই পারে যদি আমি চাই। ঠিক ভাবে চাই। ঠিক ভাবে সব করতে পারি। তা ঠিকঠাকই তো সব করলুম। কিন্তু বাইরের শক্তি আছে যে। যার ওপর আমার কোনও হাত নেই! আছে সমাজ, আছে প্রবল জনসংখ্যার আধিপত্য, আছে রাজনীতির জটিলকুটিল ফাঁদ। আছে পরিস্থিতি। আর... আর... আর আছে বিচিত্র মানুষ। খুব নিজের মানুষ বলে যাকে জানি, সে-ও অচেনা-অজানা হয়ে যায়, আমি কিছু ভুল করেছি বলে সব সময়ে নয়। বাইরের কোনও রহস্যময়, ব্যাখ্যার অতীত কারণে অজানা হয়ে যায় জানা মানুষ। তখন জীবনও হয়ে ওঠে এক মহারণ। কার জন্য, কীসের জন্য এ যুদ্ধ তা গুলিয়ে যায়। শুধু কি নিজের ন্যায্য অধিকারের জন্য যুদ্ধ করছি! যেমন পাণ্ডবরা করেছিলেন? শুধু কি ন্যায়, সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছি, যেমন কৃষ্ণ করেছিলেন! শুধু কি অবর্ণনীয় বিস্মরণ অসম্ভব অপমানের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ করছি,

যেমন যাজ্ঞসেনী করেছিলেন! জানে না, তখন মানুষ জানে না— তখন শুধু যুদ্ধ। আর যুদ্ধ জয়ই চৈতন্যে সর্বস্ব হয়ে জেগে থাকে।

দুদিকে ভেড়ি শুরু হল। ভেড়ির আঁশটে জোলো গন্ধ বাতাসে। বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে কোথাও একটা দুটো সরু মাটির রাস্তা গিয়ে মিশেছে এক একখানা ঘরে। পাহারাদারের ঘর। ভেড়িতে চুরি বন্ধ করা এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই ভেড়ির মালিকরাও সব সহজ মানুষ নয়। সবাইকারই লাঠিয়াল অর্থাৎ বন্দুকবাজ আছে, আছে বড় বড় পদস্থ পুলিশ, নীচস্থ পুলিশ ও পলিটিশিয়ান, দাঙ্গাবাজ, হুলিগানদের সঙ্গে সমঝোতার জটিল অঙ্ক। এই যুদ্ধ, নিরন্তর যুদ্ধও মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য বেছে তো নেয়! আর বেছে নেয় বলেই আমাদের পাতে পড়ে দুশো আড়াইশো টাকার অনুপম ভেটকি, ট্যাংরা, কই মাগুর!

সারা পথ, সারা আকাশ, বাতাস, মহাজগৎ, জীবন ও কাল ছেয়ে এক মহাবিতংস দেখতে পায় সে। বিতংস। জাল, আটাকাঠি, হাতিখ্যাদা। বিশ্বজোড়া এই ফাঁদে পড়ে মানুষ ছটফট করছে, এই ছটফট করাই তা হলে জীবন!

ঈশা! ঈশা! শক্তি সঞ্চয় করো মা! নিজের মধ্যে মহাউদাসীনতার সাধনা করো, সাধনা করো একনিষ্ঠ হবার কোনও না কোনও দৈনন্দিন-ঊর্ধ্ব বস্তুর সাধনায়। সেই জন্যই অনেক করুণা করে ঈশ্বর মানুষকে ললিতকলা দিয়েছেন, পার্থিব জটিলতার ঊর্ধ্বে এক গান্ধর্ব বিন্যাস! পৌঁছে যাও মা সেখানে! ঈশ্বর করুণা করে মানুষকে সাহিত্যও দিলেন, তুমি অজন্তার মহানির্বাণ তথাগতর সামনে দাঁড়িয়ে যেমন বাক্যহীন, রুদ্ধকণ্ঠ হবে, তেমনই হবে ওয়র অ্যান্ড পিস, তেই, ফাউস্ট, হ্যামলেট এবং সমগ্র রবীন্দ্ররচনার সামনে, বিভূতিরচনার সামনে। স্কলারশিপ, বিজ্ঞান এসবও ঈশ্বর তুলে দিলেন মানুষের হাতে। যদি সেই দুরূহে প্রবেশ করতে ইচ্ছে না-ও হয়— অন্তত সাহিত্যে প্রবিষ্ট হও। জীবনে প্রেম নলিনীদলগত জলমতি তরলম, যে কোনও মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ে যায়। সুখ একমাত্র স্বার্থপর বা নির্বোধেরই আয়ত্ত। আর আনন্দ? তা সেই পোর্শিয়া কথিত করুণার মতো। 'দা কোয়ালিটি অব মার্সি ইজ

নট স্টেইন্‌ড' আকাশ থেকে মানুষ নির্বিশেষে সবার ওপর ঝরে পড়ছে। কিন্তু তাকে পেতে গেলেও এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এক জীবনে কি মানুষ তা পারে? পায়? আমি চেষ্টা করেছি, ঝলক এসেছে, এসেছে যে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু তা আবার হারিয়ে গেছে ঘোর তমিস্রায়। আমি যদি তার চাবিকাঠিটি হাতে পেতুম, কি তার ঠিকানাটা জানতুম। আমি তোমার হাতে তুলে দিতুম মা। আমি জানি না। কিন্তু জগজ্জননী জনয়িত্রী নিশ্চয় জানেন, তাঁর কাছে তোমার হৃদয়ের শূন্য মন্দির খুলে ধরো। খোলো খোলো হে আকাশ স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।

সকাল থেকে ঘোর হয়েছিল আকাশ। হঠাৎ মুষলধারে অশ্রু ঝরতে লাগল। কী অঝোর ঝরন। বাপরে! দুদিকে ভেড়ির জল, মাঝখানে আকাশগঙ্গা ভেঙে পড়েছে। সাঁইসাঁই করে চলছে স্কর্পিওর সুইপার! তবু সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার বিনোদের ভুরু অভিনিবেশে কুঁচকে উঠেছে। আয়নার তার প্রতিফলন দেখতে পায় সে। আবহাওয়া অফিসের আজ বার্তা কী?

—ঠিক আছে বিনোদ, না থামবে?

—থামবার উপায় নেই ম্যাডাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ভেড়ি আর পথ এক হয়ে যাবে। দিক-দিশা বুঝতে পারব না। সোজা গিয়ে... সামলে নিল বিনোদ, ম্যাডামকে ভয় দেখানো ঠিক নয়। রায়চৌধুরীসাবও যদি থাকতেন! একটা হেলপার নেই, পুরুষমানুষ নেই। হঠাৎ কী ভয়ানক দুর্যোগ! ডিপ্রেশন একটা হচ্ছিল ঠিকই। বিল্ড করছিল। ঠিক এখনই ভাঙতে হবে! ম্যাডামেরও ঠিক এখনই, আজই ফিরতে হবে!

নিষ্ক্রান্তি

ঈশা জানে না কেন সে কলকাতা নয়, দিল্লির টিকিট কাটল। সম্পূর্ণ ইনটুইশন। মন বলল, মুখ বলল, সে কেটে নিল। একটা বড় সুটকেসে যতটা পেরেছে, পুরেছে। শায়রীর বইপত্র, নিজের আরও কিছু দরকারি জিনিস সে কারগোয় দিয়ে দিল। প্লেনের খাবার খুব খারাপ। সে মুখে দিতে পারল না। শায়রীর জন্যে এক বাক্স ভরতি কেক পেস্ট্রি এনেছিল, আর ছিল কিছু বিস্কুটের প্যাকেট। তাকে খাবার প্রত্যাখ্যান করতে দেখে একটি বিমানসেবিকা এগিয়ে এল— ম্যাডাম, ডোন্ট য়ু লাইক আওয়ার সার্ভিস?

—নো ও— এত রূঢ় জবাব জীবনে কখনও ঈশার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। তার বন্ধুরা বরাবর বলেছে— কীরে মিছরি হাসি! কখনও মুখ গম্ভীর করতে শিখবি না? লার্ন টু বি রুড। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল রুড।

হতে পারে সে গভীর ভাবে অন্তর্মুখ। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় হাসিটুকুর অভাব তার কখনও হত না। পৃথিবীর প্রথম বালিকার মতো নিষ্পাপ, মধুময় হাসি।

ঈশা বলল— স্যরি, আই মিন নট ইয়োর সার্ভিস, বাট দা ফুড ইউ আর কমপেল্ড টু সার্ভ।

মেয়েটি অপ্রতিভ মুখে চলে গেল। কিন্তু অপমানবোধের যে উপশম হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। একটু পরে সে গোটা চার টুকটুকে লাল ছোট সাইজের আপেল নিয়ে এল। অনেকটা যেন প্লামের মতো দেখতে।

—ম্যাডাম, আই উইল বি ওবলাইজড্‌। আই মিন ভেরি হ্যাপি ইফ য়ু ক্যান মেক ডু উইথ দিজ।

সে নিল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। গতকাল সকাল থেকে যে উৎকট বিস্বাদ তার সমস্ত খিদে কেড়ে নিয়েছিল, সেই খিদে হঠাৎ প্রবল তীক্ষ্ণতায় জানান দিচ্ছে। কামড় বসাতেই মুখটা অপরূপ আহ্লাদে ভরে গেল। একটা খেল, দুটো খেল, তৃতীয়টা শায়রীর হাতে দিল, চতুর্থটায় কামড় বসাতে যাচ্ছে। মেয়েটি ফিরে এল, বলল— ইজ ইট ও কে ম্যাডাম!

—ওহ, আ থাউজন্ড টাইমস ইয়েস, বাট আই ওয়জ ওয়ান্ডারিং... ডু য়ু ক্যারি সাচ অ্যাপলস্ অন দ্যা ফ্লাইট! হোয়্যার আর দে ফ্রম?

মেয়েটি আবারও একটু অপ্রতিভ হল, বলল— দে আর অ্যামেরিক্যান অ্যাপলস্। লাস্ট উইক সামবডি বট দেম দেয়ার ফর মি.... ক্যারিইং উইথ মি, ইউ সি! —লাল হল মেয়েটি! চট করে চলে গেল।

ঈশা আশ্চর্য ও লজ্জিত হয়ে রইল। মেয়েটিকে কেউ এনে দিয়েছে, কে? সে নিশ্চয় ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্লাইটে কাজ করে? ওর বয়ফ্রেন্ড, নিশ্চয়ই তাই। ও নিজের জন্য রেখেছিল। ম্যাডামকে রাগত ও ক্ষুধিত দেখে দিয়ে দিয়েছে। এমা! ছি ছি!

মেয়েটির আসা-যাওয়ার পথে সে নজর ফেলে রেখে দিল। একটা না একটা সময়ে তাকে সাড়া দিতেই হল। ঈশা বলল— আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি মিস...

—রঙ্গরাজন।

—এক্সট্রিমলি স্যরি মিস রঙ্গরাজন। আই অ্যাপ্রিশিয়েটেড ইয়োর ফ্রুটস অ্যান্ড ইয়োর ওয়ান্ডারফুল জেসচার, বাট আই কান্ট এক্সপ্রেস মাই এমব্যারাসমেন্ট। থ্যাংকস, থ্যাংকস আ লট... অ্যান্ড... অ্যান্ড... স্যরি, রিয়্যালি স্যরি...

রঙ্গরাজন মিষ্টি হেসে তাকে আশ্বস্ত করে চলে গেল। আর একটা অনভ্যস্ত ভাললাগায় তার মনটা ছেয়ে গেল। বুঁদ হয়ে আছে সে। শুধুই কি আপেলের স্বাদে? রঙ্গরাজনের বদান্যতায়! না তো! ঈশার অবাক লাগল ভেবে পুরো ব্যাপারটা সে খুব ভাল সামলাল তো! অন্য সময়ে হলে, সে নিশীথকে বলত— আমি এগুলো খেতে পারছি না। পারো তো অন্য ব্যবস্থা করো।

—কী ব্যবস্থা করব, এখন?

—কোরো না, দরকার নেই!

—মানে? কিছু তোমাকে খেতেই হবে, নইলে তোমার সেই বিখ্যাত মাইগ্রেন শুরু হবে। সে রুড হল, সামলে নিল, খাবার জোগাড় করল, তার জন্য কেউ আত্মত্যাগ করল, তার... জন্য.... কেউ... আত্মত্যাগ...!

ওয়ান্ডারফুল, তার অভিজ্ঞতায় নেই ইদানীং। এবং বেশ কিছুটা কথাবার্তা, হৃদ্যতা, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে... বা বেশ তো। সে তো পারে! কিছুই হয়তো নয় এটা। তবু খুব মসৃণভাবে সে পারল। সেই মুখচোরামি কোথায় গেল তার? আইলের সিটে একটা স্বাদু অনুভবের মধ্যে ডুব দিল সে। শুধু অনুভব, তার মধ্যে কোনও বিষয় বা বস্তু নেই। কিংবা হয়তো আছে, সে জানে না, এখনও জানে না।

শায়রী মিষ্টি গলায় বলল— মা। দিল্লি অনেক দূর!

সে মৃদু গলায় জবাব দিল— না, দূর আর কই। এসে গেলেই এসে যাবে। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

ঈশার এখন প্রবল ইচ্ছে করছে ওই রঙ্গরাজনের সঙ্গে কথা বলতে, ভাব জমাতে। সে খুব কষ্ট করে ব্রেক কষল। তার এই দোষ। সে খুব অন্তর্মুখী, চট করে কারও সঙ্গে মিশতে পারে না। লোকটি বলে— য়ু আর ফুল অব কমপ্লেক্স। হবেও বা। কিন্তু কাউকে যদি ভাল লেগে যায়। কেউ যদি ভাল, সুন্দর ব্যবহার করে, আগ্রহ দেখায়, হঠাৎ কারও মুখ, কারও হাসি, ভাষা, ভঙ্গি হঠাৎ যেন অন্য কোনও সুন্দরতর লোক থেকে ঝরে পড়ে সে ভুলে যায়। বিগলিত, বিহ্বল হয়ে যায়। এই বৈপরীত্য তার চরিত্রে আছে। লোকটি বলে থাকে— এটা সফিস্টিকেশন নয়। সফিস্টিকেশন হল— তোমার ভাললাগা, মন্দলাগা দুটোই একরকম ভাবে হ্যান্ডল করো, পরিমিত উচ্ছ্বাসে। পরিমিত ঠিক আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস! ওই মিসেস চ্যাটার্জি, আস্থা মেহরাদের সঙ্গে? মিসেস চ্যাটার্জি বলবেন —দেখো দেখো ঈশা, ডিরেক্টরসাবকে দেখো, কত অমায়িক। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কী সিনসিয়ার, হাইট অব কমপিটেন্স, নো? —তিনটে ছেলেমেয়ে বানিয়েছে, তারা বাবা কী জিনিস জানে না। কথায় কথায় আইসক্রিম আর চকলেট দিয়ে কর্তব্য সারা আর বাচ্চাগুলোকে স্পয়েল করার একটা লোক— এই পর্যন্ত। ডিরেক্টর কেচ্ছা চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে... শেষের দিকে ডিরেক্টরসাবের অশেষ মেয়ে লালসা এবং বলিহারি পছন্দের কাহিনি। —কী কিছু বলছ না কেন? য়ু আর গোয়িং টু হ্যাভ দা সেম এক্সপিরিয়েন্স এনিওয়ে।

ভেতরটা মূলসুদ্ধু কেঁপে যায়। কেননা সে দেখে অতি দূরে কোনও কেতাদুরস্ত মহিলার সঙ্গে সাগ্রহ বার্তা বিনিময় করে এবার এক অখাদ্য কিন্তু যুবতী মহিলার সঙ্গে কথা বলছে নিশীথ। তার মনে পড়ে যায় মালবিকাদি, মুন্নি। আশ্চর্য হয়— এরা কিন্তু ওদের নখের যোগ্যও নয়। তার স্বামীর স্ট্যান্ডার্ড কি তা হলে দিন দিন পড়ছে!

আর আস্থা? —হ্যালো ঈ-শা। প্ল্যানিং এনি পার্টি? নট ইয়েট! —এই সময়ে আস্থার চোখের দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত অবজ্ঞা ও বিস্ময় মেখে থাকে। সে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে না কখনও। একটা দুটো কথা ছুড়ে দিয়ে সাবলীলভাবে মিশে যায় পুরুষ-প্রজাতির সঙ্গে। বাকি সময়টা ঈশাকে এরকম 'কাট' করতে থাকে।

কিন্তু তার ভেতরেও তো কথা আছে। সেই কথাগুলো খলবল করতে থাকে থলিতে জিওল মাছের মতো। কাউকে দেখে, শুনে বার হয়ে আসতে চায়। যেমন শম্পাদি। থাকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান। কত যে জানে, আর কত যে তার পড়াশুনো। কিন্তু কলকাতায় এলে সে ঈশার খোঁজ করবেই। নিশীথ নেই। তো কী? চলো তোমাতে আমাতে একদিন খেতে যাই। খুব দামি রেস্তোরাঁয়। শম্পাদি, নিশীথের আপন পিসতুতো বোন— অজস্র ডিগ্রিধারী। ভীষণ ভালবেসে কথা বলে ঈশা। একজন সামান্য গ্রাজুয়েট 'গৃহবধূর' সঙ্গে। শুধু ঈশা, আর কেউ না। বলে— 'মামা মামিদের সঙ্গে আরেক দিন হবে, আজকে একটু তোমার সঙ্গে কথা বলে নিই!' যেন ঈশার কথা বলাটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। ঈশার কিন্তু একটুও অপদার্থ লাগে না তখন নিজেকে।

তবু বলে, —শম্পাদি, আমার সঙ্গে কথা বলে কী সুখ পাও গো?

তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শম্পাদি বলে— এখানে সব্বাই বড় কনশাস, জানো ঈশা! কে ভাবছে আমি এত উচ্চপদস্থ, কে মনে করছে আমি অমুকের ঘরনি, আমার ব্যাংকে এত টাকা, কেউ বিদ্যা, কেউ যশ। এভরিবডি কামস উইথ ব্যাগেজেজ। য়ু ডোন্ট কাম উইথ এনি। জানো, হার্ভার্ড, কেমব্রিজ ভরতি নোবেল লরিয়েট, কেউ তাদের ফিরেও দেখে না। দে ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট।

—আমার কিছু নেই যে শম্পাদি, না টাকা, না উচ্চপদ, না কোনও বলবার মতো গুণ!

—আরে! য়ু আর সোললি আ হিউম্যান বিয়িং হুম আই লাইক ভেরি ভেরি মাচ। বাইরের জিনিস বা অ্যাচিভমেন্টগুলো ছাড়াও তো মানুষের একটা চরিত্র থাকে! সেইটা, সেইটা বুঝলে না! বলে শম্পাদি অনুপম হাসি হাসে আর ঈশা কৃতজ্ঞতায় গলে যায় এই আত্মবিশ্বাসটুকু উপহার পাওয়ার জন্য।

—শম্পাদি? শম্পাদির সঙ্গে তাজ-এ গিয়েছিলে? একা? বাট হোয়াই?

নিশীথ অবাক হয়ে থাকে, নিশীথের মা, বাবা।

বাবা বিড়বিড় করতে থাকেন— শি ইজ হার্ভার্ড এডুকেটেড।

মা চেঁচিয়ে ওঠেন— ও ছবিও আঁকত না! দারুণ!

সে যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে। কিংবা অলৌকিক কিছু। শম্পা লাহিড়ি কেন্‌স, যিনি একজন অস্ট্রেলীয় লেখককে বিয়ে করে ক্যানবেরায় সেট্‌লড্‌। তিনি কেন ঈশাকে একলা ট্রিট দেন! একটা ধাঁধা, সে ধাঁধার উত্তর খুঁজে পায় না ঘোষাল পরিবার।

রঙ্গরাজন! মিস রঙ্গরাজন! তোমার প্রথম নাম কী! প্রথম নামটার বড্ড দরকার হয় ভাব করতে গেলে। আই অ্যাম অলরেডি মিসিং য়ু রঙ্গরাজন। চোখের ওপর রুমাল চাপা দিল সে। কেননা কাল থেকে মুলতুবি কান্নাটা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে। রুমালের পেছনে সে প্রাণপণে কেঁদে নেয়। প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করে। ভাগ্যিস, উইন্ডো-সিটে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাকে কাঁদতে দেখলে ও ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। গত চার বছরে তা বারবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। গতকাল সকালের দৃশ্য ওকে মূক করে দিয়েছে। মেয়ে, মেয়ের কথা ভেবেও এই অস্থির, অশান্ত, দূষিত পরিবেশ থেকে দূরে চলে যেতে হবে তাকে। নিজের কথাও কথা! সে বোধহয় এই ভয় ও ভয়ংকরের পরিবেশে মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যেতে যাচ্ছে। না, না। তোমাকে বাঁচতে হবে ঈশা। এ ভাবে শেষ হওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া চলে না। চলে না। এটা তোমার

জীবন। কে জানে ফিরে পাবে কি না। পালাও প্রসারপিনা এই প্লুটোর পাতাল রাজ্য থেকে।

মাকে আজ তেমন করে মনে পড়ছে না ঈশার। মা নিজের কাজ নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। সময় পায় না। ঈশাকে সাহস দেয়, নিশীথকে পরিমিত বকে, কিন্তু কখনওই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসবার সাহস তাকে দেয় না। বাবা তো নয়ই! সেদিন যে বলল ওদের পাঠিয়ে দাও, তার মধ্যেও একটা নিশীথ-নির্ভরতা আছে। চলে এসো নয় পাঠিয়ে দাও। ঘাড় ধরে বার করে দাও আর কী। তো তাই হল। আই'ল থ্রো য়ু আউট অব দিস হাউস— বলে বিকট চেঁচিয়েছিল লোকটা। শায়রী থরথর করে কাঁপছিল। তার ভয়ের চেয়ে হয়েছিল বিস্ময়, গভীর বিস্ময়। এই সেই লোক যে নাকি পার্ক হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসে নিজেকে নিবেদন করেছিল। কী আগ্রহ ছিল দু চোখে।

—আমি কিন্তু খুব সাধারণ নিশীথদা, বিশ্বাস করুন, আমার ভাল লাগে আপন মনে থাকতে। বই পড়তে... আর... আর... চা করা ছাড়া কোনও রান্নার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই।

—আচ্ছা ঈশা, দিস ইজ টু মাচ। রান্নার জন্যে কেউ বিয়ে করে। কিন্তু রান্না জানো নাই বা কেন? মেয়েরা তো সবাই পারে। তোমাকেও পারতে হবে।

—ওমলেটটাও পারি। তবে মা বলে রান্নাটা শুধুমাত্র মেয়েদেরই কর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অথচ বিদেশে ছেলেরা আকছার রান্না করে খাচ্ছে। মেয়ে ইকোয়ালস রান্না— এই ইকোয়েশন থেকে মা দূরে থাকতে চায়।

—ফেমিনিস্ট!

—কী জানি। শব্দটা খুব কঠিন লাগে। বুঝতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আর কিছু দিন পরে রান্না-টান্না শিখতে তো হবেই। মাকে খাওয়াব, বাবাকে খাওয়াব....

—নিশীথ ঘোষালকে খাওয়াবে।

এটুকু রসিকতা অন্তত লোকটি করতে পারত।

যখন রাগে লাল হয়ে চেঁচিয়েছিল! তার ভেতরটা কাঁপছিল। এ কে? কোন রাক্ষস? এর সঙ্গে এক শয্যায় শুয়েছে। সহবাস করেছে! কোনও রাক্ষস শিশু জন্মায়নি তো! নরম রেশম চুলের ছোট্ট একটি মানবিকা এসেছে, সে আকারে প্রকারে অবিকল ঈশারই মতো।

সে দুটো কাজ করেছিল নিশীথ বেরিয়ে যাবার পর। একটা চিঠি লিখেছিল— আমি চললাম। যেমন তুমি চেয়েছ। চেয়েছিলে এসেছিলাম। চেয়েছ যাচ্ছি। যাওয়া-আসা দুটোই তোমার ইচ্ছায়। কোনওটাতেই আমার কোনও দায়িত্ব নেই। তেমন সায়ও ছিল না, নেই। তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিতে চাই না। কোনও শপথ, কোনও সুন্দর মুহূর্ত, কোনও কর্তব্য। আমিও ওই সব শপথ, মুহূর্ত, কর্তব্য পুঁটলি বেঁধে নিয়েছি, গঙ্গার জলে বিসর্জন দোব। ও, তুমি তো আমার বাংলা ভাল পড়তে পারো না। একটু কষ্ট করে বানান করে পড়ে নিয়ো। দয়া করে যে পকেট-মানি এত দিন দিয়েছ সেই জমানো টাকা থেকেই যাবার ব্যবস্থা করলাম— আমি।

দ্বিতীয় কাজটা ছিল আরও কঠিন, আরও সাহসের। মালবিকাদিকে সে একটা ফোন করেছিল বাঙ্গালোরে। মোবাইল নম্বরটা খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু কাজটা সে বেশ কিছু দিনের গোয়েন্দাগিরিতে সম্ভব করে রেখেছিল।

—হ্যালো!

—আমি ঈশা বলছি।

—হ্যাঁ ঈশা, আরে! ঈ-শা! বলো। সব ঠিক আছে তো।

—না সব ঠিক নেই। ইউ প্লিজ কাম অ্যান্ড টেক ওভার।

—মিনস। —চূড়ান্ত বিস্ময় মালবিকা কাজির গলায়।

—তুমি তো এখন মুক্ত মালবিকাদি। অসুবিধে হবে না। আমি তোমার চিরকালের বন্ধু, দোসরকে মুক্তি দিলাম। এসে ভার নিতে পারো। বাই।

সে ফোনটা রেখে দিয়েছিল। নিশীথ সব সময়ে টুর করছে। তাকেও নানা কাজে নানা জায়গায় থাকতে হয়। কিন্তু আজও সামান্য একটা

মোবাইল লোকটি তাকে কিনে দেয়নি। বাড়ি বন্ধ করে চাবি কেয়ারটেকারের হাতে জমা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

এখন ওপর থেকে বাহাইদের লোটাস-টেম্পল দেখা যাচ্ছে। গোধূলির আলোয় অপার্থিব দেখাচ্ছে। তার মনে হল হৃৎ-কমল কথাটা যেন কোথায় আছে। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের গান, মা গাইত— এই হৃৎ-কমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়। হৃৎ-কমলের রাঙা রেণু চারদিকে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস ভরা সেই রেণুর সুবাস। কেন হে নাথ, আমায় খেলায় হারিয়ে দিয়ে তোমার কী সুখ হল? কী সুখ? আমি তো কিছু চাইনি। আই ওনলি ওয়ান্টেড টু বি, টু বি মাইসেল্‌ফ্‌।

এয়ারপোর্ট থেকে মঞ্জুমাসিকে ফোন করল ঈশা।

—ঈশা? হঠাৎ? এরকম?

—আসব না বলছ? তা হলে চলে যাই।

—উঃ, কী পাগলামি হচ্ছে। যেখানে আছিস সেখানেই থাক, আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

—না আমি প্রি-পেড ট্যাকসি নিয়ে যাচ্ছি মাসি। তোমাকে শুধু জানিয়ে দিলাম।

না, কেউ না। কাউকে গাড়ি নিয়ে রিসিভ করতে আসতে হবে না। সে যথেষ্ট বড় হয়েছে। একটা সাত বছরের মেয়ের মা। যথেষ্ট কর্তব্য পালন করছে। হয়তো চূড়ান্ত রকমের ভাল ভাবে নয়, কিন্তু ভালই করেছে। সে যাই বলুক। এখন সে বুঝতে পারছে—ওগুলো ছল। অজুহাত। আসলে... আসলে ওর বোধহয় তাকে আর ভাল লাগছিল না। ট্যাকসিতে যেতে যেতে হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মতোই তার উপলব্ধিটা হল। কেনই বা সে মাসির কাছে এল? প্রথমত এই সময়ে মা একটা বিশেষ আর্কিওলজিক্যাল কাজে ভীষণ ব্যস্ত। তার এই সিদ্ধান্ত, এই চলে আসা বজ্রাঘাতের মতো বাজবে মায়ের বুকে। মা যদি সামলাতে না পারে? সে-ও তো মেয়ে। মায়ের প্রতি তার সে দায়িত্ববোধ, মমত্ববোধ তা-ও তো অবচেতনে সব সময়ে কাজ করে যায়। আর দ্বিতীয়ত, মাসি

এবং এই দিল্লি বহু ধরনের কাজকর্মের খোঁজ খবর রাখে। তাকে তো দাঁড়াতে হবে। নিজের দুটো পায়ে। মাসি তো একাধিক এন. জি. ও-র সঙ্গে জড়িতও আছে! কিন্তু, কিন্তু এই সাহস... এই রোখ কতক্ষণ টিকবে। এসবই তো তার চরিত্রবিরুদ্ধ। ছোটখাটো বিদ্রোহ সে করতে পারে, যেমন একনাগাড়ে সপ্তাখানেক মাছ নেই দেখে শাশুড়িকে বলেছিল—ভাত-টাতগুলোও নাই খেলাম মা, কিছু পয়সা বেঁচে যাবে! —তাতে তার অসভ্য মুখফোঁড়, লোভী বলে বদনাম হয়েছিল। ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু মাছের অভাবে তার প্রোটিনাকাঙ্ক্ষী দেহই অসভ্যতাটা করেছিল।

শ্বশুরকে একদিন বলে ফেলেছিল— এত লোককে শাস্তি দিতে দিতে তোমার কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, না বাবা? —তখন বদনাম হয়েছিল রূঢ় বলে। দেবতুল্য মানুষটাকে বোঝবার ক্ষমতা নেই বলে। মাঝেমধ্যে ফোঁস করে উঠেছে নিশীথের ব্যবহারে। দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফোঁস করে তাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে নিশীথ।

মাথাটা এখন কীরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হালকা। বড় ভার চেপেছিল মাথায়। বড় ভয়। রান্নাটা ঠিক হল তো? বারেবারে চেখে দেখেছে। বাড়ির ধুলো ঝাড়াঝাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এইরে, ললিতা কাজের লোকটা মাটির চমৎকার পটটা ভেঙেছে। ওই কলস তারা এগজিবিশন থেকে কিনেছিল। বকল লোকটিকে, কিন্তু এ গল্প তো এখানেই শেষ হবে না। ললিতা শুধু সূচনাসূত্র। সে উপলক্ষ, আসল ধ্রুপদ-ধামার বাজবে রাত বারোটায়। সামলাতে পারো না? একটা জিনিস সামলাতে পারো না! গলার আওয়াজটা এসব সময়ে কীরকম ঢাকের মতো হয়ে যায়! না, না, দুর্গাপুজোর ঢাক নয়, সতীদাহর ঢাক, মড়ার সঙ্গে জ্যান্ত মানুষটাকে চিতায় তুলেছে, আগুন উঠছে লেলিহান শিখায়। জ্যান্ত মানুষ পুড়ছে—তার উৎকট আকাট বিকট চিৎকার চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রবল ঢক্কানিনাদে। সেই ঢাক। এই অদ্ভুত উপমাটা তার মনে এল কেন? তবে কি সে ন' বছর ধরে জ্যান্ত পুড়ছিল, আর একটার পর একটা অভিযোগের খুঁতপাড়ার গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছিল তার

কৈফিয়ত, তার আত্মপক্ষ সমর্থন। শায়রীর অঙ্ক বই খাবার টেবিলের চেয়ারে কেন? বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা কেন? খবরের কাগজ রাখার আর জায়গা নেই বাড়িতে? পরশু দিনের কাগজটা কোথায় গেল? মভ শার্টটার বোতাম বসানো হয়নি কেন?

উত্তরগুলো কত সহজ, স্বাভাবিক। শায়রী অঙ্কের খাতা পেনসিল চেয়ারের ওপর রেখে ঘুমোতে চলে গেছে। আমি কী করে জানব! বাচ্চারা ওইরকম একটু-আধটু করে থাকে। এখনও তো রুটিন মিলিয়ে বইপত্র সব ব্যাগে ভরিনি! তখন ঠিকই ধরা পড়ত।

বারান্দার দিকের দরজাটা ইচ্ছে করে খুলেছি। দক্ষিণে হাওয়ার দেশের মানুষ আমি। এমন বন্ধ-ছন্দ থাকতে পারি? এখানে চোর ওঠার সম্ভাবনা নেই নিশীথ! শোবার আগে তুমি বা আমি যে-কেউ বন্ধ করে দেব। সে সময়ে জানলা-দরজাগুলো তো আমরা চেক করেই থাকি। একটু এয়ারিং দরকার। অক্সিজেন!

কলসিটা? অনেকবার করে বলেছিলাম ওটা এক কোণে রাখো। তাতেও সুন্দর দেখাবে। তা হল না, ওই কৌচের পাশেই রাখা চাই। ললিতা প্রাণপণে ন্যাতা টানছে। মন পড়ে আছে বাড়িতে। সন্দেহবাতিক মারকুটে স্বামী আর স্কুলগামী ছেলের ওপর, তার ওপর বিশাল নিতম্ব। একটু ধাক্কা লাগতেই কলসি কাত।

খবরের কাগজ তো তুমি চোখের আড়ালেই রাখতে বলো, লফ্‌টে তুলে দিই প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে। আজকের কাগজ তোমার টেবিলে, পরশুর কাগজ লফ্‌টে চলে গেছে। মই এনে পেড়ে দেব? এক্ষুনি?

মভ শার্টের বোতাম পাচ্ছি না। জে. এন. রোড, এম. জি. রোড হাঁটকে ফেলেছি। সব বোতাম খুলে সাদা লাগিয়ে দেব?

এই এতগুলো তৈরি জবাব। সঠিক কৈফিয়ত ভয়ংকর যমমূর্তির সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে।

—অত পড়াচ্ছ কেন ওইটুকু বাচ্চাকে! ভুরু কুঁচকে আধা-গর্জন।

আরে। আমি পড়াচ্ছি নাকি! স্কুল পড়াচ্ছে। টিচার টাস্‌ক দিচ্ছে। সমাজ, দেশ পড়াচ্ছে— আমি তো নিমিত্তমাত্র।

—এত পড়িয়েও র‍্যাংক এল না?

—অত পড়াইনি তো নিশীথ, একটু ড্রিলিং করতাম, কিন্তু বাবা যেই বলল অত পড়াচ্ছ কেন, শিশুটি তার প্রার্থিত মেসেজ পেয়ে গেল। আর তাকে বাগাতে পারলাম না। তাই র‍্যাংক নেই। নাই বা রইল। ওইটুকু বাচ্চা, একবার বি-প্লাস পেলে কী এসে যায়?

এসবই অনুক্ত থেকে যায়। খালি শাঁখের করাত চলতে থাকে ঘষঘষ ঘষঘষ। এদিকেও কাটছে সূক্ষ্ম সাদা ধুলো উড়ছে কাটা অলিন্দ নিলয় থেকে, ওদিকেও কাটছে। আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা, মায়া মমতা, ভালবাসা মানের ওপর দিয়ে নির্মম করাত চলে যায়।

সেই ভার নেই। দারুণ ধাক্কায় সবের এক লহমায় ভার নামিয়ে দেওয়া যায়। যেমন গুড়ের কলসি মাথা থেকে নামিয়ে নেয় গুড়ের ফেরিওয়ালা? এটা সে জানত না। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বাইরে বড় কৃতী চাকুরের বউ, একটা সুন্দর শিশুর মা, আয়নায় দেখা চমৎকার প্রতিবিম্ব। প্রতিদিনকার অতি যত্নের গার্হস্থ্য সব একেবারে শূন্য। আই'ল থ্রো ইউ আউট অব দিস হাউস। কেন? না সে একটা দিন পরিবার শুধু পরিবার নিয়ে দিন কাটাতে চেয়েছিল। আর কিছু না। হোটেলে রেস্তোরাঁয় বিরিয়ানি, লং ড্রাইভ নয়, নয়। দামি শাড়ি-গয়না যা তার স্বামীর কলিগরা স্ত্রীদের অকাতরে দিয়ে থাকে, তা তো নয়ই। তা হলে? কী রইল আর? হাতে আর 'আপনি'টুকু ছাড়া। কিচ্ছু রইল না। কপনিটুকু খুঁজে নিতে হবে।

তুই নিশীথকে ছেড়ে চলে এসেছিস? —আপাদমস্তক সুখী মঞ্জুমাসি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—চলে এসেছি নয়। আসতে হয়েছে মাসি— এ নিয়ে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। —সে কী করে বলবে তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

—ভুল করেছিস ঈশা, —তুই চিরকালের জেদি, গোঁ ধরলে ছাড়িস না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুই যে খুবই নরম প্রকৃতির। যাকে বলে

মেয়েলি-মেয়ে। রঞ্জার মতো নয় এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই! কী করে এমন সিচুয়েশন হল? খুব ন্যাগিং করতিস, নাকি? ন্যাগিং ছেলেরা একদম পছন্দ করে না, তোর মেসোকে আমি কখনও ন্যাগ করি না।

—মেয়েরা পছন্দ করে? —ঈশা আস্তে গলায় জিজ্ঞেস করল।

—কী?

—ওই যে তুমি বললে— ন্যাগিং?

—ওহ হো তুই ফেমিনিজ্‌ম্-এর চক্করে পড়ে গেছিস।

—কেন মাসি! একটা জিনিস যদি অপছন্দের হয় তার মধ্যে জাত-বিচার থাকবে কেন? যা ছেলেদের পছন্দ হয় না, তা মেয়েদেরও পছন্দ না হওয়ারই কথা।

মাসি কিছুক্ষণ মূক হয়ে যায়। তারপরে বলে— তুই ভুল বলিসনি ঈশা। কিন্তু যা ঠিক, যা জাস্ট তা কি সব সময়ে হয়? এই তো দেখ না সাম্য-সাম্য, সম্পদের সমবণ্টন নিয়ে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে গেল। কথাটা কি খারাপ? বেঠিক? নয় তো! কিন্তু কোথাও আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি এলে বস্তি দেখতে পেতিস। বসতি নয়, বস্তিও নয়। বলা উচিত নরককুণ্ড, ছেঁড়া ন্যাকড়া কানি, প্লাস্টিকের ঠোঙা, শুয়োরের নাদ, ছাগল, পতপত করে উড়ছে প্লাস্টিকের ঝুপড়ির ছাত। সেখানেই পোকার মতো মানুষ ঘুরে বেড়ায়। রাজধানী! রাজধানীর অ্যাপ্রোচ! ভাব ঈশা। আর এখানে এই হাউজিং-এ। প্রত্যেকের একাধিক গাড়ি আছে, আড়াই তিন হাজার টাকা মাইনে দিয়ে আমরা কাজের লোক রাখি, হেন গ্যাজেট নেই যা আমাদের আছে। পাশাপাশি বাস করি। কেউ যদি বলে মানুষের জীবনযাত্রার এই আকাশ পাতাল ফারাক কেন? তুই কী উত্তর দিবি? সিনেমা-স্টার মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে লোক মারল, এর জন্য যা লোকদেখানো শাস্তি হচ্ছে, অন্য একজন রামা-শ্যামার জন্যেও কি তা-ই হবে?

ঈশা তর্ক করার মেজাজে নেই। মাসি নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম.এস। কী বলবে? এই জাতি বিচার, একজনের পক্ষে যা অপ্রীতিকর অন্যজনকে সেটাই মেনে নিতে হবে?

সে মেয়ে বলে? সমস্ত মেনে প্রাণপণে একটা গৃহ ও গৃহসুখ রচনা করবার পর— আই'ল থ্রো য়ু আউট অব দিস হাউজ? ওই হাউজ, চার বছর ধরে সে-ই দেখেছে, সে-ই রেখেছে। অন্যজনের ওই হাউজের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু শোয়ার। লজিং-এর মতো! তবু সে তাকে ওই গৃহ থেকে উৎখাত করার কথা মুখে আনতে পারে? তবু ও বাড়ি তার হয় না? তার স্বামীর স্টেটাস ফিল্‌ম স্টারের, তার— ফুটপাথবাসীর।

—তার ওপর তো তুই পড়াশুনোটাও শেষ করলি না, বা আর কিছু! মাসি কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলল।

—মাসি আমি বরং চলেই যাই। আমার বোধহয় এখানে আসা ঠিক হয়নি। আর কোথাও...

আঁতকে উঠলেন মঞ্জুলিকা। —বলছিস কী? ঈশা, আর য়ু ইন ইওর সেন্সেজ? কোনও কথা নয়। এক্ষুনি গিয়ে মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ো। আমি যা করার করছি।

—কী করবে? নিশীথের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। আর মা? মা-বাবার সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করব। মায়ের হাজারো কাজ। প্রত্যেকটা ভীষণ জরুরি। তাই হঠাৎ এমনি করে...

ঈশা ঘোরে ছিল। মাসি রোজ এক ডোজ করে ঘুমপাড়ানি দিচ্ছে। ঘুমের মাসি বহু চেষ্টা করেছে। তবু একটা ঘোরের বেশি কিছু হয়নি। সেই ঘোরের মধ্যে ঈশার মধ্যেকার ঈশা প্রলাপের মতো অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে থাকে। এই জগতের, জীবনের কী মানে? সত্যিই কোনও অর্থ আছে না পাগলের গল্প এটা। অনেক শব্দ, অনেক ক্রোধ, চিৎকার আর কাঙ্ক্ষা কিন্তু কোনওটারই কোনও মানে নেই। গল্পটা শুরু হচ্ছে এক ভাবে, বাঁক নিল অন্য ভাবে, তারপর আবার বাঁক নিল, পাত্র-পাত্রী বদলে গেল। পটভূমি পালটে গেল। কোনও সামঞ্জস্য নেই একটার সঙ্গে আরেকটার। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ এই জীবন। গত পরশুর, আগের দিন স্কিৎজোফ্রিনিক জীবন দেখে এসেছে। মাঝখানে ছিল মূক বধির জীবন, তারও আগের ন'বছরের জীবন তৃষ্ণা, চক্ষে তৃষ্ণা, বক্ষ জুড়ে তৃষ্ণা, হৃদয় তৃষায় থরথর করে কেঁপেছে। দাও দাও বাৎসল্য দাও— আমি

আমার বাবা-মার আশ্রয় ফেলে তোমাদের কোলে এসেছি, ভিন্ন মাটির মেয়ে। একটু অনুকূল বাতাস চাই, সার চাই জৈব এবং অজৈব। একটু স্নেহ দাও, একটু আদর, এমন করে সমালোচনার খর চোখে তাকিয়ো না, শুকিয়ে যাই। দাও দাও একটু মুগ্ধতা, আবেশ, ভরসা, ভালবাসা দাও, দাও— সত্যি কথা আমি ভীষণ রাগ করেছি, অভিমান করেছি, সে তুমি পিপাসার জল এক আঁজলাও দিতে পারোনি বলে। দিতে পারোনি না দাওনি আর বিচার করতে চাইনি। কর্নেলের এম.এস এম.বি.এ. মালবিকা কাজিকে যা দেওয়া যায়, নামমাত্র গ্রাজুয়েট, নাচ-গান-সাহিত্য মুগ্ধ সহজ সরল ঈশা দত্তকে হয়তো তা দেওয়া যায় না। না বুঝে, নিজেকে, আমাকে না বুঝে ডাকলে কেন? পেয়েছিলাম তো? অনিমেষ, নীলাব্জ, কৌশিক, কেউ তো খারাপ ছিল না! আমার জন্য পাগল ছিল! ক্লাস ফেলোকে আবার বিয়ে করা যায় নাকি! কিংবা রাস্তায় আলাপ হওয়া কাউকে? ঈশা এমনই ভেবেছিল। সব সুন্দরকে, মুগ্ধকে, আগ্রহী উৎসুককে ফিরিয়ে দিলাম শুধু দিবারাত্র দুর্ব্যবহার আর নিন্দায় দগ্ধ হব বলে? বাসনায় বাসনায় অধীর আর কিছু করতেও পারলাম না। নিজের সংশয় দুঃখে উদ্ভ্রান্ত অপমানিত মনটাকে বাগাতে পারিনি। মাসি তুমি পূর্ণ, তুমি কী করে বুঝবে গোলাম আলির গজল শুনে আমার প্রাণটা কেমন করত! মানবেন্দ্র, সতীনাথ, শ্যামল মিত্র, মান্না দে শুনে থরথর করে কাঁপতাম, কোথাও না কোথাও দু চোখের গভীর অজরামর চাওয়া বুঝি আমার জন্য অপেক্ষা করছে, শুধু আমার ঠোঁট একটু ছুঁইয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। তা হলেই কারও গান অমর হয়ে যাবে। যতই ভালবাসুক, আরও ভালবাসা দেওয়ার জন্য কী কাতরতা সেই দিওয়ানার! সমস্ত ভাবনাটাই যে অলীক মায়া, ছেলেমানুষি কিংবা মানুষের অপ্রাপ্য কোনও অজাত সংবেদন, তা তো ভাবিনি! আমার জীবনভাবনার সঙ্গে সুতোয় সুতোয় জড়ানো সাহিত্য। গান আমাকে সেই অপ্রাপ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এত দিন পরে এই জানা আমায় পাথর করে দিয়েছে। আমি আর ঈশা নই, দত্ত বা ঘোষাল। আমি কী, তা আমাকে এবার ভাবতে হবে।

এইরকমই ঘোর, ঘোরের মধ্যে অজস্র আত্মজিজ্ঞাসার কুচি, চাওয়া ও পাওয়ার আশা ও বাস্তবের তুলনামূলক কাটাকুটি খেলায় চলে যায় দিনের পর দিন।

টুংটাং করে ফোনটা বাজল। মাসি ধরেছে। একটিমাত্র অব্যয়— অ্যাঁ?

সে চমকে উঠে বসল। এরই মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেল! অন্তত বারো দিনের জন্য আমেরিকা গেছে তো! বাড়তেও পারে। তাকে অবশ্য বলেওনি, সে-ও জিজ্ঞাসা করেনি! এইটুকু সময় তো এ তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকার-ই কথা! তত দিনে সে একটা কিছু ঠিক করবে। তার যা ভাগ্য! কোনও পরিকল্পনা। মেজাজ-মর্জিই খাটে না। অভাগিনি টু দা পাওয়ার ইনফিনিটি...।

পাতাল প্রবেশ

বিনোদ বলল— আমি সামনে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না দিদি। ডেঞ্জারাস। যদি জলে নেমে যাই! নেমে পড়ি বরং হ্যাঁ?

রঞ্জাবতী দেখলেন গাড়ির বাইরেটা কেমন ঘোলাটে। তারপরেই বুঝলেন কাচের বাইরে জল শুধু জল। আকাশবারি তো আছেই, সেইসঙ্গে মাটিরও জল। ইঞ্জিন দিয়ে জল ঢুকছে।

—বিনোদ, আমরা বোধহয় কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো মরব। তুমি সাঁতার জানো?

—হ্যাঁ দিদি, আপনি?

—আমি একসময়ে চ্যাম্পিয়নজাতীয় কিছু একটা ছিলাম। চলো জলে নেমে যাই।

—আমার গাড়িটা দিদি! ব্যাংক লোন করে কিনেছি। এখনও হাফ শোধ হয়নি।

—তো কী! গাড়িটা নিয়ে মরতে চাও? জীবনটাই হাইপথিকেটেড হয়ে গেছে এখন।

অনেক ধস্তাধস্তি করে দরজা খুলতে হল। যতবার খুলতে যাচ্ছে, কোথা থেকে রাশি রাশি জল ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। কোনওরকমে যখন খোলা হল তখন বিনোদ কোথায় রঞ্জা আর জানেন না। চারদিকে জীবনমরণ এক হয়ে গেছে। নোংরা আঁশটে জীবনের স্বাদ। প্রাণপণে শুধু তার ওপরে উঠতে চাওয়া। হাত চলে না, পা চলে না। চ্যাম্পিয়নেরও অঙ্গে মরচে পড়ে যায়।

'স্যার! স্যার' ভূতের মতো দাঁড়িয়ে বিনোদ। রায়চৌধুরীর নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের বাড়ির দোরগোড়ায়। —বৃষ্টিতে কাল গাড়ি ব্রেক-ডাউন... দিদি ভেড়ির জলে...

—কী বলছ ঠিক করে বলো— রায়চৌধুরী ধমকে উঠলেন।

—দিদিকে পাচ্ছি না, জলে হারিয়ে গেছেন।

—মানে?

—জানেন তো, বৃষ্টি ভীষণ, রাস্তা ভেড়ি একাকার। গাড়িটা একদম ভোগে গেল।

—গাড়ির কথা রাখো, ম্যাডামের কথা বলো।

ম্যাডামের কোনও কথা নেই। কী বলবে বিনোদ। সে ভয়ে দুঃখে ঠকঠক করে কাঁপতেই পারে শুধু। যা দিনকাল। পুলিশে ধরলেই হল। বললেই হল দিদিকে সে-ই-ই! উঃ!

দরজায় বেল। কে এল? খবরের কাগজ? এত সকালে! —দরজা খুলে দিয়ে সুবীর দেখেন ঝোড়ো কাকের মতো রায়চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন।

আকাশ মেঘলা। প্রবল বারিপাত থেমেছে। আবার নামতে পারে। তবে আপাতত জল তার অনধিকার প্রবেশ স্বীকার করে নিয়ে লজ্জিত মুখে রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে।

ওখানকার থানায় খবর গেছে। দমকলেও। ডক্টর রায়চৌধুরী উদ্ভ্রান্ত। কেউ চায়নি, তবু কৈফিয়ত দিয়েই যাচ্ছেন। দিয়েই যাচ্ছেন।

—কী জানেন, প্রোঃ দত্ত। উনি নিজে... এমন একটা ইনভলভমেন্ট... রিসার্চ স্কলারদের একজনের পা ভেঙেছে। অন্য দুজনকে উনিই কাজ

দিয়ে পাঠিয়েছেন। একজন আর্কিওলজিক্যাল সেন্টারে। আরেকজন ন্যাশনালে কাজ করছে। আমি তো রেগুলার যাই, এবারের...

আজ মেঘ মেঘ দিন। হাওয়া ভারী। মুখ গোমড়া আকাশ। কিন্তু সেদিন রোদ-ঝলমল করছিল, শীতের দুপুর। মিক্সড ডাবল্স্। সুবীর আর রঞ্জাবতীর জুটি জিতল। মেয়েটি ডিগডিগে, বেতের মতো রোগা। ও নমনীয়। কোর্ট কভার করছিল দ্যারুণ, ফিট খুব। শ্যামলা রং, তার ভেতর থেকে রক্তাভা বেরোচ্ছে। স্বাস্থ্যের লালিমা, উজ্জ্বল চোখ, দীর্ঘ কেশ ঝুঁটি বাঁধা, সালোয়ার কামিজ পরে খেলছে। ওহ্, সে কতকাল আগে।

জিতলি বটে! —বন্ধুরা ইয়ারকি দিল।

তিনি বুঝতে পারেননি, বলেন— জিতব তো বটেই, তোদের সন্দেহ ছিল? টুর্নামেন্টের কাপটা নিয়ে তবে শান্তি!

—আরে আসল টুর্নামেন্টটাই তো জিতে গেছিস।

—মানে!

—রঞ্জাবতী...!

—দুর, তোরাও যেমন...

—হোল গ্যালারি প্যাঁক দিচ্ছিল শুনতে পাসনি?

সেই দিনও হারিয়ে গেছে। সেই সুবীরও নেই। সেই রঞ্জাবতী....?

খেলাধুলো ছাড়ল, সিরিয়াস পড়াশুনোর দিকে বাঁক নিল ওর জীবন। তিনিও কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়লেন। কোচ ছিলেন সম্পৎ সিন্‌হা, বলেছিলেন— ডাট, তুমি ক্রিকেটটা ছেড়ে দিচ্ছ! হোয়াই! আর য়ু ম্যাড অর হোয়াট!

—ইন্ডিয়ার ব্লেজার পরতে পারব গ্যারান্টি দিতে পারেন!

—নো। তা পারি না। কিন্তু তাতে কী! খেলাটা পারো, তার আনন্দ নেই?

কে শোনে কার কথা, স্পোর্টস কোটায় রেলওয়েতে ঢুকে গেলেন। খেলতেন। কিন্তু মন ছিল না। পড়াশোনাটা বাধা পাচ্ছে। শেষ করতে হবে। বিয়ে, তারপরেই দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে, মোটাসোটা

বইগুলো খুলে বসলেন। রঞ্জা বরাবরই তাঁর পেছনে লেগে ছিল। মাস্টার্সটা শেষ করো, শেষ করো। কিন্তু এই ভাবে ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে...! জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না সুবীর! ছিনিমিনি! প্রবল কথা-কাটাকাটি! ঝগড়া! তিক্ততা। পড়া শেষ হল। কলেজ লেকচারারের চাকরিতে ঢুকলেন। চারপাশে বইয়ের পর বই। ছাত্রের পর ছাত্র। খালি রঞ্জার বিষয়টা নিয়ে তিনি কখনও উৎসাহ দেখাননি! —কী যে রস পাও অতীতে! খুঁড়লে কে জানে কী বেরোবে!

—কী আর বেরোবে, রঞ্জা কেমন অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলত— যাই হোক ডাইনোসর হলেও তো তা কঙ্কাল মাত্র। কিংবা ফসিল! ভয়ের কিছু না। সেই সব হাড়গোড় রিকনস্ট্রাক্ট করে পুরো জানোয়ারটাকে গড়ে তোলা কম ইন্টারেস্টিং?

এখন পথের দুধারে অনতিঅতীতের টুকরোটাকরা খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছেন সুবীর। পদচিহ্ন, কোনও চিহ্ন! বাইরের মানুষটা বদলায়, ভেতরটাও, কিন্তু মানুষের আসলটা বদলায় না রঞ্জাটা। সব নিস্পৃহতা, উদাসীনতা, প্রতিযোগিতা বাহ্য। শোনো রঞ্জা। তুমি বরাবর আমাকে ভুল বুঝেছ, আমি নিজেকে সরিয়ে নিইনি। ভেতরে গনগনে আঁচ নেই, কিন্তু উত্তাপ আছে। উষ্ণতা। তুমিও কি গুটিয়ে যাওনি? কিন্তু আমি জানি তোমার আসলটা ঠিক জায়গায় আছে। সত্য এত গভীরে থাকে যে তাকে পুরাবস্তুর মতোই উৎখনন করতে হয়। পললের পর পললের স্তর সরিয়ে। গ্র্যানাইট ব্যাসল্টের খাঁজের পর খাঁজ ভেঙে আশ্চর্য ফসিল, ভালবাসার। সবুজ মুছে গেছে, কিন্তু স্পষ্ট সোনালি ধূসর ফসিল।

—আরে কী হল প্রোফেসর দত্ত, আপনি ওরকম ভেঙে পড়ছেন কেন? নিজেই তো বলছেন উনি চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু ছিলেন।

—সে যখন ছিলেন তখন ছিলেন— প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন সুবীর। মনে মনে বললেন— তোমাকে আমি মাফ করব না রায়চৌধুরী। আমার অতীতখ্যাপা বউটাকে অজ্ঞাতকুলশীলে পাঠিয়ে নিজে সেক্রেটারিয়েট টেবলের সামনে শীতল ঘরে আরাম করছ। সুবিধেবাদী। এদিকে পেপার যত বেরোবে দুজনের নামে। ভাল রে ভাল। আর

মেয়েটা এমন নিপাট বোকা যে চিরটা কাল এক ভাবে ঘোল খেয়ে এল।
—শোনো সুবীর। তুমি ভুল বুঝছ। আমার ফিল্ড ওয়র্ক, আর ওর ডেস্ক ওয়র্ক— কাজটা দুজনের হল না।

আরে! ও পুরুষমানুষ ও ফিল্ডে যাক। ব্যস অমনি ফেমিনিস্ট বউয়ের মুখে উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠবে— ভুলে যাচ্ছ সুবীর, আমি অ্যাথলিট ছিলাম তার কিছু তো এখনও অবশিষ্ট আছে। আর ডক্টর রায়চৌধুরী তো স্রেফ ভুঁড়িদাস।

—দেউলিয়া, বেড়াচাঁপা দুটো নামই আজ্ঞে চালু, একরাম আলি সঙ্গে চলেছেন। শুকনো কাদা ফাটা পথ মাড়িয়ে রায়চৌধুরীর ইন্ডিকা উড়ে যেতেই চাইছিল। বারাসতের পর টাকি রোড ধরেছেন। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ।

—দেউলিয়াকে দেবালয় বানানো হয়েছে। দেউলিয়া কেমন দেউলে দেউলে লাগে না। তাই দেবালয় বোঝলেন না?

দেউলেই তো! সুবীর ভাবেন— ছেলে গেছে অকালে, এখন বউও... দেউলে ছাড়া কী। হঠাৎ চিত্ত আকুলিবিকুলি করে ওঠে! ঈশা! ঈশা কেমন আছে? তারও তো জীবনে তোলপাড় চলছে তিনি জানেন। কিন্তু এসব কথা ঈশা মায়ের সঙ্গে বলে। বাবার সঙ্গে না। তিনি এসব নিয়ে ভাবেন না, যা ভাববার রঞ্জা ভাববে, যা করার রঞ্জা করবে। তাঁকে যদি নির্দিষ্ট কিছু করতে বলা হয় করে দেবেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার জগৎ থেকে তিনি বড় একটা বার হতে চান না। নিয়তি আজ গালে কষে একটা চড় মেরে বাইরে বার করে দিয়েছে। কথাটা দুম করে মনে হল। নিশীথ নামে ছেলেটি খুব ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করছিল, রঞ্জা বলেছিল— ঠিক আছে, ওদের পাঠিয়ে দাও। তিনি রেগে গিয়েছিলেন খুব। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে কোনও ঘটনাকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকেন। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তিনি প্রথমেই ভেবেছিলেন একটা বাচ্চা নিয়ে মেয়ে এসে পড়বে। ওই বাচ্চা বড় করার যাবতীয় দায়িত্ব, একটি যুবতী মেয়েকে রক্ষা করার

দায়িত্ব এই বয়সে তাঁকে নিতে হবে! মেয়ের অবস্থান সম্পর্কে কিছু ভাবার আগে তিনি নিজের অবস্থানের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু রঞ্জার মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। সে মেয়ের মানসম্মানের কথা, তার পরিস্থিতির কথাই শুধু ভেবেছে। আর কিছু না। আগেও না। পরেও না।

—বেড়াচাঁপা গ্রামের নামের পেছনেও হিস্ট্রি আছে— একরাম অক্লান্ত বলে চলেন।

—চন্দ্রকেতুগড়ের গেটওয়ে হল এই বেড়াচাঁপা। কথিত আছে রানির কাছে পৌঁছেছে পির আব্বাস বা গোরাচাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা। তিনি কিছু চমৎকার দেখতে চাইলেন। পিরের সঙ্গে তখন তেনাদের দহরম মহরমের মরশুম তো? লড়াই শুরু হয়নি। তা রাস্তার পাশে একজনার বাগান। তাতে বাঁশের বেড়া যেমন হয়। বেড়া ছুঁয়ে মনে মনে কী বিড়বিড় করতে লাগলেন পিরসাহেব। ব্যস, বেড়ার গায়ে একটার পর একটা চাঁপাফুল ফুটতে লাগল।

গোরাচাঁদের মন্ত্রবলে চাঁপাফুল ফুটল বেড়ার গায়।

মনোহর সরকার বলে, দেখবে তো এসো বেড়াচাঁপায়।

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে সুবীরের। একটা প্রকাণ্ড দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর এই মিঞা এমন হিস্ট্রি বলছে যেন তাঁরা মিউজিয়াম কি রুইনস দেখতে এসেছেন। বেড়াচাঁপা মাই ফুট!

সামনে বসেছেন একরাম। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন— ভাববেন না সাহেব। আমি চারদিকে খোঁজ পাঠিয়েছি। এসব হল হুলিগান এরিয়া। চুপিচাপি কাজ করতে হয়। হ্যাভ পেশেন্স। তা ছাড়া মাকে আমি দেখেছি। শক্তিময়ী। নমস্তস্যৈ নমোনমো।

আবার একটু পর শুরু হল।

—বোঝলেন সাহেব— পুরনো পাঁক তুলতে গিয়ে, কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে, বাড়ির ভিত কাটতে গিয়ে কত যে সিলমোহর, পুতুল, পট্যারি বেরিয়েছে! খনার ঢিপির চারদিকে এদিক-ওদিক এখনও মেলে। লোক্যাল ছেলেছোকরারা ভাল দামে বেচে দেয় দালালদের। বোঝলেন না পেটের খিদেটি যেমন করে হোক মেটা চাই, ঠিক কি না! দোষ দিয়ে লাভ নাই।

তা ছাড়া নানা কারণে এদিকে এক্সক্যাভেট বন্ধ হয়ে গেছে। কোথাও বাড়ির মালিক বলছেন— 'কিছু পাওয়া গেলে আমার ভদ্রাসনটি চৌপাট হয়ে যাবে, দয়া করে বন্ধ করুন এসব।' কোথাও বা জল উঠছে, জল, খালি জল। জলের শেষ নাই। আবার কোথাও শাবল, গাঁইতি ছিটকে আসছে। মানেটা বোঝলেন? কিছু আছে। লোহা হোক, পাথর হোক। কিছু না কিছু কনস্ট্রাকশন। সাহেব, আপনি অস্থির হবেন না, বোঝলেন না এসব হুলিগান জায়গা... খুব সাবধানে খোঁজখাঁজ করতে হয়।

শায়রীকে নিয়ে ঈশা মাসির সঙ্গে আসতে থাকে। ধরবার মতো কোথাও কিছু নেই। নেই, পাবে না বুঝে শেষ পর্যন্ত এককথায় সমস্ত ছেড়ে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে। আর তখনই... যখন মাকে তার সবচেয়ে দরকার.... তার বুকের ভেতরটা থম ধরে আছে। আশ্চর্য। এই ফ্লাইটেও মিস রঙ্গরাজন। কিন্তু সে তাকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারে না। কোথাও দেখেছি, কোথাও... যেন জলের তলায় দেখা মানুষের মুখ। রঙ্গরাজন একমুখ হাসল, কিন্তু তার শুকনো মুখে আলো ফুটিফুটি করেও ফুটল না।

—আমি অরুন্ধতী রঙ্গরাজন— গত সপ্তাহে হায়দরাবাদ-দিল্লি ফ্লাইটে দেখা হল?

আনমনে ঘাড় নাড়ে ঈশা। ফিকে হাসি।

পাশে মঞ্জুলিকাকে দেখে মেয়েটি বলল— আর ইউ রিলেটেড টু হার ম্যাডাম?

—ইয়া, শি ইজ মাই নিস!

—ইজ এনিথিং রং, আই মিন, রং উইথ হার।

—হার মাদার ইজ মিসিং.....

কেঁপে উঠল ঈশা। মাদার ইজ মিসিং। সেই ছোটবেলাকার অনুভূতি। মা বেরিয়ে গেছে। জানা কথা বিকেলে ফিরবে, কিন্তু মনে হচ্ছে আর ফিরবে না। মা নেই, মা নেই। ঠাম্মা দুপুর-ঘুমে। সে আর ভাই দুপুরবেলা স্কুল থেকে এসে ক্যারম নিয়ে টানাটানি করছে। হঠাৎ ভাই টকটকে লাল

চোখে ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেল, শূন্য ভাঙা মন্দির। বিগ্রহ নেই, পূজারি নেই। উপকরণ নেই। ঝড় আসছে, জোরালো হাওয়ায় জানলা-দরজা খুলে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ঢুকে আসছে ঘরে। ...ব্লু ছাপা শাড়ি পরে গেছে আজ মা। সে রোজ মায়ের সাজটা দেখে। গেল ফোটা ফুলের মতো, আসবে শুকনো ফুলের মতো। হা-ক্লান্ত। পাপড়িগুলো খসে খসে পড়ছে। মা যদি না থাকে আর? জীবনের এই দুর্গততম মুহূর্তে মা পাশে না থাকলে সে কী করে দাঁড়াবে? মা, মা, অন্তত যত দিন না আমি নিজের পায়ে দাঁড়াই। যত দিন না এই বাস্তবের যোগ্য হতে পারি... তত দিন।

এয়ার পকেটে একটা গোঁত্তা খেল প্লেন। ঈশার মনে হল তার আত্মাটাকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল আকাশ। এ সে কী বলছে! আমি যত দিন না দাঁড়াই... মাকে সে তার ফেরিঘাটের নৌকো হিসেবে চাইছে শুধু? পার করে দাও, তারপর যাবার হলে যাও, আমি আর আঁকড়াব না!

ফেরির মাঝি ভেড়াও ভেড়াও
শেষ করে নিই দেওয়া-নেওয়া
কড়ির কাঙাল, পাড়ের কাঙাল।
স্রেফ অনুপল দাঁড়িয়ে থাকা।
মুখ দেখি না মুখ দেখি না
রেজগি গুনি মিলছে কিনা হিসেব-নিকেশ।
তারপরে শেষ। তারপরে শেষ। তারপরে শেষ।

তার মানে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক এরকম প্রয়োজনের সুতো দিয়ে বাঁধা। মৌলিক কোনও বিভব সেখানে খোঁজা বৃথা! তাকে দিয়ে খুব হালকা কতকগুলো প্রয়োজন মিটল না বলে নিশীথ সম্পর্কচ্ছেদ করছে, মা ছাড়া সংসার অচল তাই বাবা নানা মতের গভীর অমিল সত্ত্বেও মাকে নিয়ে বাস করছে? তার মনে পড়ল একটা মূর্তি। সাদা, সরু পাড় কাপড় পরা, চুলগুলো প্রায় সবই সাদা, গোছানো। চুপচাপ বসে আছেন জোড়াসনে। চোখ উধাও। দিদা—বেদবতী।

বুড়োমা অর্থাৎ সর্বমঙ্গলা দেবীর মৃত্যুর পর একগোছা ফটো পাঠিয়েছিল মা, তার মধ্যে দিদার এই ছবিটা ছিল। যে-ই তুলে থাক, অদ্ভুত তুলেছে। বেদবতী স্তব্ধ। ৯৫/৯৬ বছরের বৃদ্ধা অ্যালঝাইমার ও অন্যান্য উপসর্গে আর মানুষ ছিলেন না শেষ ক' বছর। অশেষ কষ্ট পেয়ে ও দিয়ে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এ মৃত্যুতে শোক করার কিছু নেই। বেদবতীর দৃষ্টিতে শোক নেই। কিন্তু কী গভীর এক স্মৃতি-ঘোর। তিনি যেন শ্রাদ্ধবাসরের এক প্রান্তে বসে তাঁর মায়ের সারাজীবনটার চলচ্চিত্র দেখছেন। অবলোকন করছেন। কী মহিমা এই বিশোক শোকের। কী যে বলতে চায় এই আলোকচিত্র, পুরোপুরি বোঝা যায় না। মহাকালকে উদ্দেশ করে বলছে কি— তুমি এই সব দিয়েছিলে, নিয়ে নিয়েছ। নিংড়ে নিংড়ে জীবনরস নিয়ে নিয়েছ হে, কিছুই আর রাখলে না! তার সামনেও একটা ফিলমের রোল খুলে যেতে থাকে— যুবতী মা লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, আদর করছে, কাজ করছে, দুম করে বেরিয়ে গেল, এক ব্যাগ নতুন জামা-কাপড় নিয়ে ঘর্মাক্ত, আলো-আলো মুখে ফিরছে। মা আর যুবতী নেই। কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভাইয়ের মৃত্যুতে মুহ্যমান মা। কত দিন কথা বলেনি মা! চট করে তাকে অপাঙ্গে দেখে নিল, চোখে অপার আকুলতা। না মা, না। তুমি বড় জরুরি আমার জীবন-বিন্যাসে। একেবারে অত্যাবশ্যক। তবু তুমি তোমার জন্যেই বাঁচো। রঞ্জাবতী দত্ত, স্ত্রী, মা, শাশুড়ি, বউমা হিসেবে অশেষ কর্তব্য যিনি সমাপন করে থাকেন, অশেষ কষ্ট পেয়েছেন, পাচ্ছেন, সমালোচনায় জর্জরিত, তবু যিনি খনামিহিরের ঢিপির উৎখনন লব্ধ পুরাবস্তুর খোঁজে, সেই পুরাবস্তু অতীতের কোন মৌনকে মুখর করে জানতে, এই পঞ্চাশোত্তর বয়সে পুত্রশোককে বুকের পাথরে ফসিল করে রেখে কন্যার বিবাহ-বিভ্রাটের সদ্য ঘায়ে জ্বলতে জ্বলতে চলে গেছেন, এখন জীবন মরণ বন্যার কবলে। ঈশা চোখ বুজল। বড্ড জ্বালা করছে, জানলার দিকে মুখ ফেরাল, জল নামছে। এতক্ষণে।

ওকে খুলে দাও, যেতে দাও নিবারণ— হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন রোগিণী জড়িয়ে জড়িয়ে... ছি ছি ছি— অমন করে মারে! উঃ, উঃ, উঃ, রোগিণী বলছেন আর পিঠ কুঁকড়ে শিউরে উঠছেন যেন অদৃশ্য চাবুক আছড়ে পড়ছে পিঠের ওপর।

—ভুল বকত্যাছেন, তাই না ডাক্তারসাব?

হ্যাঁ মনে তো হচ্ছে। খুব খারাপ কোনও ইনফেকশন হয়েছে মন্টু, জোর টাইফয়েড বোধহয়, আমার দ্বারা হবে না। হাসপাতালে দাও। রক্ত, ইউরিন পরীক্ষা, এম আর আই করতে হতে পারে...

—হ্যাঁ, উলটি-পালটি খাইয়ে নোংরা জল খাইয়েছেন তো বেশ। সাঁতার জানেন ওস্তাদ, নইলে—। কিন্তু এখান থে' তো হাসপাতালে পাঠাতে পারব না আজ্ঞে।

—নিমেষ ও বন্দি হবার মানুষ নয়। স্পিরিট, স্পিরিটটাকে বাঁধবে কী করে? ঢিপি ভেঙে ফেলো, ওর মধ্যে জিব আছে,— রঙ্কার জিব।

—কী কন বুঝি না ডাক্তারবাবু, জ্ঞান কচ্ছেন বোধহয়। তবে নিবারণবাবুর নাম নিলেন। খবর করুন, একরাম সাবকে খবর করুন।

চারদিকে বিস্তীর্ণ জলমরু। বিচরণ করছে বহু রকমের মাছ, জলঢোড়া, পোকা-পতঙ্গ, হালকা হাওয়ায় ভেসে আছে মাছখেকো পাখিরা। উড়ে উড়ে বসবার দাঁড় খোঁজে সাদা সাদা বক। মাছের খাবার বস্তা বস্তা ঢালা হয় মরশুমে মরশুমে, বিদ্যাধরীর নোংরা জল মেশে, তলায় শ্যাওলা, গেঁড়িগুগলি, জলজ উদ্ভিদ। পায়ে লম্বা লতার জাল আটকে গিয়েছিল। বহুক্ষণ সাঁতরে আর পারেননি ইনি। ইতি দ্যান। ডুবতে থাকেন। মন্টু মিঞার লোক সময়মতো ঝাঁপিয়ে না পড়লে হয়ে যেত আজ।

কমলা রং-এর টালির চালের আধপাকা একটি ঘর। একটি বিন্দুর মতো জলের মধ্যে টলটল করছে। মেঝেয় থকথকে কাদা। পরিষ্কার করছে মন্টু মিঞার লোক। খাটিয়ায় রোগিণী। কোথাও কোনও

মেয়েলোক নেই। শাড়ি ভেসে গেছে। কী করবেন ডাক্তারবাবু! ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে এদের একটা কাঁথায় ঢেকে রেখেছেন।

বিড়বিড় করছেন— বরাহ কি কারও নাম হয় নিমেষ? ওটা মিহিরের নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। লোককথা বলছে— মিহির রাজপুত্রের মৃত্যুগণনা করেছিলেন, শুয়োরের হাতে। তাই রাজা কুমারকে আর বাইরে বেরোতে দিলেন না। ছোটছেলে বুবুনের মতো, কী করবে বল সুবীর, একদিন উঁচু সিন্দুকের ওপর থেকে ঝাঁপ খেল, নীচে রুপোর খেলনা বরাহ ছিল। বুকের মোক্ষম জায়গায় বিঁধে গেল। যতই কেন তুমি মা হও, তাকে হেলথ ড্রিংক দাও, আর ফল মাছ খাওয়াও, সে চুরমুর খাবেই। মায়ের হাত থেকে না পেলে বন্ধুদের কাছ থেকে খাবে... মায়ের দোষ কী... আপনি কি কুঞ্জবাবু, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী? নমস্কার। বলি শুনুন... একই ব্যক্তি। শ্বশুর নয়। স্বামীরই নাম বরাহমিহির। লোককথায় কিছু সত্য থাকে।

দুপুর। একটু ফরসা হয়েছে আকাশ। মন্টু মিশ্রা এখনও ফেরেনি। ডাক্তার আবার মাথা ধুইয়ে দিলেন রোগিণীর। লাল চোখ মেলে উনি বললেন— আহ! আপনি কি ডাক্তার?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—শুনুন ডাক্তার, আগে মিহিরের বাবার চিকিৎসা করুন। তিনিও গণক, ছেলের অকালমৃত্যু গণনায় পেলেন। সমুদ্রের জলে ঝুড়ি করে ভাসিয়ে দিলেন। কুন্তী তাঁর কুমারী গর্ভের সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই নিয়ে কত সমালোচনা! কী করবেন তিনি! কোনও উপায় ছিল? আপনিই বলুন! কিন্তু এই মিহিরের বাবা জ্যোতিষার্ণব পুত্র বিসর্জন দিল শ্রেফ পুত্রশোকের ভয়ে। লোকে গঙ্গাসাগরে ছেলে বিসর্জন দিত ছেলে পাওয়ার জন্যে? সেই এক জিনিস আয়রনিটা দেখুন।

ডাক্তার বুঝলেন— এ প্রলাপ। কিন্তু সমৃদ্ধ প্রলাপ। যাকে জ্ঞান বলছে মন্টু। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। সূত্র নেই হাতে।

—ম্যাডাম, আপনি শান্ত হোন।

—শান্তই তো, কুঞ্জবাবু। মন-প্রাণ-বোধি দিয়ে যা সত্য বলে বুঝেছি তাই বলছি। হতে পারেন খনা সিংহলি। কিন্তু তিনি বাংলার বউ। মেয়েও হতে পারেন। কিন্তু যাই হোক, বাংলার। সবার ওপরে তিনি সেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, দাদা, যার বিদ্যাও অবিদ্যা, গুণও অগুণ। তরুণী বধু গুনে দেখিয়ে দিলেন শ্বশুরের গণনায় কোথায় ভুল ছিল, কেন মিহিরের মৃত্যু হল না। সেই থেকে শুরু। তারপর রাজসভায় একেবারে কেলো! কী করব ভাই, আধুনিক অপ-বাক বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। রাজা গণনা করতে দিলেন। মিহিরেরটা ঠিক হল না। খনাকে ডাকা হল, তিনি সঠিক উত্তর দিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন হেঁটমুণ্ড। অগ্নিশর্মা স্বামী ঘরে ফিরেছেন, কোথায় খনা? এত বড় স্পর্ধা!

—মন্দিরটা দেখেছেন?

—খনামিহিরের ঢিপির কথা বলছেন মা? —ডাক্তার বললেন।

—আবার কী! মন্দির বড় পুণ্যস্থান, মন্দির বড় পাপস্থানও বটে দাদা। মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মিহির স্ত্রীকে শপথ করালেন— আর জ্যোতির্বিদ্যা, জোতিষচর্চা করবেন না। কণ্ঠে গান নিয়ে জন্মেছে। তাকে বলছে গাইবে না, পায়ের চলায় নাচের ছন্দ, তাকে বলছে নৃত্য তো বাইজির পেশা। বিদুষী, গুণবতী কি তা ছাড়তে পারেন? পারেন না! মৃত্যুর চেয়েও কঠিন তা। জিব কেটে ফেলছেন খনা। স্বামীর হাতে সেটি ধরিয়ে দিয়ে রক্তমুখী বধূ বেরিয়ে যাচ্ছেন— এই নাও আমার গৌরব, আর তোমার গ্লানি। মাথা উঁচু। স্পিরিট নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু এই নীরবতা আর এই ভয় আপামর মেয়ের সাইকিতে একটা পরিবর্তন আনল। চুপিসারে। ওরে বাবা, বেঁচে-বর্তে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো। শিখবে বই কী! শুক্তো, ছ্যাঁচড়া, ধোপার খাতা, ছেলেকে অ আ ক খ। ইচ্ছা-অনিচ্ছা তোরঙ্গে তুলে রাখো। সতী-উমা-করুণা-মলিনারা এই ভাবে বুকভরা মধু বাংলার বধূ হয়ে জন্মাল মরল। খুব নাম হল। কিন্তু দাদা এ তো শেষ নয়, মিহির একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে হঠাৎ। বলছে পালটাও, ঘরের বাইরে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, নাচ, গান, বিদ্যা সব আয়ত্ত করো, কিন্তু অবশ্যই স্বামী যতটুকু চাইবে, ততটুকু। রামচন্দ্রের গণ্ডি এবার। রূপ-গুণ-চরিত্র-ব্যক্তিত্ব নিয়ে এমন হও যাতে তোমাকে নিয়ে গর্ব করা চলে। খালি আমার থেকে এক বিঘত খাটো থেকো। কুমোরটুলিতে অর্ডার গেছে ডাক্তার।

নিস্তেজ হয়ে পড়েছে রোগিণী। মুখের দুপাশে গাঁজলা। জিবটাই খালি নড়ে। যেন মানুষটি মৃত। শুধু জিবটুকুই বেঁচে আছে।

ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিলেন।

খনার বচন

সে এসেছিল স্ত্রীর সীমাহীন স্পর্ধায় ফুঁসতে ফুঁসতে। সে গালি দিয়েই যাবে। দিয়েই যাবে। তার স্ত্রী কেঁদেই যাবে, কেঁদেই যাবে। সে বেঁধে মারবে, তার স্ত্রী মার খেয়েই যাবে, খেয়েই যাবে। বুক শূন্য করে দেয় এমন রূঢ়তা, গুঁড়িয়ে ভেঙে দেয় প্রাণ— এমন অপমান। চিরকাল করে এসেছে, আবহমান পুং সাইকি তাকে দিয়ে এমনই করায়। এই ফর্মুলা যে অগ্রাহ্য করে, তার কী শাস্তি? কী শাস্তি তাকে যারা মদত দেয় তাদের? কম কষ্ট করে স্ত্রীর ঠিকানা বার করতে হয়েছে তাকে? বিশ্বসুদ্ধ লোক জেনে গেল। মালবিকা তাকে কম ধাতানি দেয়নি। মা-বাবা জেনে স্তম্ভিত। কসবায় বারবার ফোন করেও সাড়া পায়নি সে। কী করে পাবে? তখন তো সব নার্সিংহোমে, কে কখন আসছে, যাচ্ছে কোনও ঠিক নেই। অবশেষে দিল্লি এবং সেই সি-ই-ও মেসো। গম্ভীর গলা। মানুষ যত পদস্থ হবে তত গম্ভীর হবে তার গলা— হোয়াট হ্যাভ য়ু ডান টু হার? শি ইজ ব্রোকেন, ব্রোকেন ইন টু পিসেস। দিস ইজ ডিসগাস্টিং, আনপার্ডনেবল।

কী হল? ব্রেক-ডাউন? যাক, অন্তত পক্ষে বেঁচে আছে। এখানে এসে বিছানায় শোয়া রোগা, কালো, স্তিমিত শাশুড়িকে সে খেয়ালই

করেনি। তার অর্জুনের চোখ— চাঁদমারি খুঁজে নিয়েছিল ঠিক। ঈশা। রোগা, ফ্যাকাশে, কিন্তু শান্ত ধীর, সে যে কোনও দিন উথাল-পাথাল কেঁদেছে, বড্ড ভয় পেয়েছে, বিদ্রোহ করেছে কোনও কিছুরই চিহ্ন তার মুখে নেই। তাকে দেখেও ঈশার কোনও ভাবান্তর হল না। সেই বরং ভেতরে কোথাও একটা শান্তি, আশ্বাস টের পেল। যাক ঈশা আছে।

মঞ্জুলিকাও আছেন, খর চোখে তাকালেন। তবু এই মানুষটাকে সে চেনে। বসে আছেন মেয়ের হাতটি নিজের কোলের ওপর নিয়ে। চোখ খোলা। কিন্তু দৃষ্টি অন্য কোথাও—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থানো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত ভয়সূদন...

তিনি অখণ্ড জপ করে চলেছেন। সুবীর? তিনিও কেমন দুর্বোধ্য, গ্লাসে ওষুধ মাপলেন, ঈশার হাতে দিলেন।

সবাই চুপ। রোগশয্যা ঘিরে। কে ও? নিশীথ অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিল। মঞ্জুলিকা বললেন— খাও নিশীথ।

তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কখন টেবিল টেনে তার সামনে রেখেছেন, প্রচুর খাবার-দাবার।

নিশীথ কিছু ছুঁল না। স্বাভাবিক গলায় বলল— ও কি আমার সঙ্গে যাবে? ঈশা নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পর মঞ্জুলিকাই বললেন— ঈশার মতো ভিতু, ঘরকুনো মেয়ে যখন এ ভাবে বেরিয়ে আসে, তখন ব্যাপারটা আর খুব সহজ থাকে না নিশীথ। ও যাবে কি না ও-ই জানে। আমি এইটুকু বলতে পারি আদর-যত্ন-মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ওকে নিয়ে যাবে তুমি।

তার শাশুড়ির বিচরণক্ষেত্র যেখানে, সেখানে নিশীথের যাওয়া-আসা নেই। উনি হিস্ট্রি চ্যানেল। অলস চোখ ফেলে মাঝে মাঝে দেখে নেওয়া। তাঁকে সে পাত্তা দেয় না। কিন্তু মঞ্জুলিকা বিখ্যাত

কর্পোরেট হাউসের এক্স সি ই ও-র স্ত্রী। তাঁকে খাতির করতেই হয়।

—আমি অত কমপ্লিকেশন বুঝি না মাসি, ইয়েস অর নো!—অসোয়াস্তি হচ্ছে। নিজের অনম্যতাটাকেই যে সে নিজের আইডেনটিটি বলে জানে!

হঠাৎ ঈশা ফিরে তাকাল। —অত অবাক হচ্ছ কেন? বার করেই তো দিয়েছিলে?

—রাগের মাথায় মানুষ অনেক কিছু বলে সেটা বোঝো না, এটাই তোমার মূর্খতা।

ঈশা ঠান্ডা গলায় বলল— তুমি, তোমরা তো ওয়েস্টার্ন ভ্যালুজ-এ বিশ্বাস করো। মানুষকে অপমান করলে যে অন্তত দুঃখ প্রকাশটা করতে হয়, সেটা জানো না, এটা তোমাদের মূর্খতা। স্ত্রীকে লোকচক্ষে হেয় করতে নেই, জানো না এটাও। তোমার ডিগ্রি তো কর্নেলের। ওরা কিন্তু এ জিনিস করে না। এতে নিজেরও অপমান। বোঝে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নিশীথ। সে আশা করছিল এঁরা তাকে আর ঈশাকে একলা হতে দেবেন যেমন লোকে দম্পতিকে দেয়। আর তখন সে তার সর্ব যুক্তি অগ্রাহ্যকারী কুশকাঠিন্য দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবে তাকে। কিন্তু এখন সে বুঝছে এটা আর ডুয়েলের পর্যায়ে নেই। মহাযুদ্ধের জায়গায় চলে গেছে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে কি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়া যায়!

অবশেষে জমাট অনভ্যাস ও অনন্যতা জয় করে সে আপসের গলায় বলল— ঠিক আছে। আই অ্যাম স্যরি। রিয়্যালি। স্বীকার করছি তুমি যেমন আমাকে নিরাশ করেছ, আমিও তেমনই তোমাকে...স্যরি। শায়রীর কথা ভাবো, মা-বাবা, সমাজ, আমার পজিশন...।

—ভাবছি। কিন্তু তোমাকেও ভাবতে হবে। আমি, আমার মা-বাবা, সমাজ, আমার পজিশন।

কোনও কসম এখনও খায় না নিশীথ। তার অহং-এ লাগে। সে

বলে— স্বীকার করছি আমার রাগটা বেশি। কিন্তু তুমিও কম জেদি নও। সব সময়ে আমার দিকে আঙুল ওঠালে চলবে না...।

জলজ্যান্ত কংক্রিট জঙ্গলের মধ্য থেকে এক প্রাচীন ভাঙা মন্দির মাথা তোলে। তার মেঝেতে সাড়ে তেইশ ফুট গভীর কূপ। সাঁইত্রিশটি স্তরে ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে নেমেছে কূপ যেখানে মাঙ্গলিক শঙ্খ-পদ্ম চিহ্ন, আর স্তব্ধ এক জিব। এখানেই প্রোথিত হয় সুবৃহৎ সুদৃঢ় স্তম্ভ। তার ওপর ভর করে থাকবে গোটা মন্দিরের স্থাপত্যনির্মাণ। উঠে আসে অশরীর জিব। কষ্টে নড়ছে, কিন্তু বলছে।

—এগুলো মগজের তৈরি ফাঁদ নিশীথ— এই তর্ক। পরস্পর দোষারোপ। স্টপ আর্গুইং অ্যান্ড স্টার্ট ফিলিং। ইভল্যুশন মানুষকে দুটো ক্ষমতা দিয়েছে যা অন্য কাউকে সেভাবে দেয়নি— একটা মগজ, অন্যটা সংবেদন। সংবেদন ছাড়া মগজের কোনও... মানে নেই। সংবেদন থেকেই... সম্পর্ক,... ভালবাসা,...মূল্যবোধ, একে অপরকে ওপরে উঠতে, গভীরে আরও গভীরে যেতে সাহায্য করা। যদি না পারো তো জীবনটা জলে গেল।

তুই চুপ কর রঞ্জা— হাঁপাচ্ছিস।

এতক্ষণে নিশীথ নিজের ভেতর থেকে বেরিয়েছে। —মা? কী হয়েছে মার?

কেউ জবাব দিল না।

—বাবা, সে এবার সুবীরকে জিজ্ঞেস করে— মায়ের কী হয়েছে?

—সে অনেক কথা। ভেড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিতে বানেতে— অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেছে—মেনিনজাইটিস— জানি না পা দুটো আর চলবে কি না।

—এত সিরিয়াস ব্যাপার, কই আমি তো কিছু জানি না...

ঈশা আস্তে বলল— বুঝতেই পারছ, আমি এখুনি ফিরতে পারছি না।

—শায়রীর স্কুল!

—আই'ল টেক কেয়ার অব ইট— ঈশা দাঁড়ি টেনে দিল।

রঞ্জা শুকনো হাসলেন। বললেন— ইয়েট অ্যানাদার লিজ, নিশীথ। আবার জীবন। বুঝলে কিছু? ইয়েট অ্যানাদার চান্স। যদি নতুন ভাবে ভাবতে না পারি, তা হলে কেন? কেন বলো?

প্রশ্নটা ঘরের বাতাসে চক্কর খেতে লাগল। হালকা করে বলা। কিন্তু প্রচণ্ড চাপ তার।

—দেখো, সে থেমে থেমে আবারও বলে যেন কথাগুলোকে বুকের গভীর থেকে টেনে বার করছে। টাকাকড়ি... প্রতিষ্ঠা,...সংসার সুখ...এসবই ভোগ করার জন্যই তো! কিন্তু ভোগের কতকগুলো সিক্রেট আছে। কিছু কিছু বাদ দিয়ে নিতে জানতে হয়। কী আর কতটা! ধরো প্রিয়জন না প্রোমোশন? পরিধির আবছা মানুষগুলো না কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ক'জন। ঠিক ভাবে ব্যালান্স করে বাদ না দিতে পারলে ভোগ হয় না, হযবরল হয়। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ

বেদবতী উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়ের দিকে। ঈশা বলল— মা, চুপ করো না। এসব বলে কী লাভ?

—লাভটা এখনও বুঝতে পারছিস না, না? —রঞ্জাবতী বিস্ময়ে পরিশ্রমে চুপ করে গেলেন। একটু পরে যেন অভিমান ভরা গলায় বললেন— 'সারাজীবনের সারাৎসার, নিজের পুত্র-কন্যাকে বলব না? নিশীথ, অন্যের প্রাপ্তি দেখে নিজের চাওয়ার লিস্টি করাটা আহাম্মকি, বাবা। নকলনবিশি করবে কেন? ওর তিনটে গাড়ি বলে আমারও তিনটে, ওর বউ পঞ্চাশ হাজার রোজগার করে, আমার বউ কেন করবে না, ওর ছেলে ব্রিলিয়ান্ট, আমারটিকেও হতে হবে, নইলে সপাং— এ একেবারে লোলুপতা, হিংসা, হিংস্রতা। মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্। মা মা গৃধঃ। মানুষী সম্ভাবনার অনন্ত পথ খুলে রাখতে হলে, অনন্ত অমানুষী বাঁধনও খুলে দিতে হয়।

তাঁর দম ফুরিয়ে গেছে। কষ্টে পাশ ফিরলেন, মেয়ের সাহায্যে। চোখ বুজলেন। বড় ক্লান্ত। যখন ঝাঁজির দামে খাবি খাচ্ছিলেন, যখন প্রলাপ বকছিলেন, যখন ডাক্তারের হাতুড়ির ঠোকায় পায়ের নার্ভ

সাড়া দিচ্ছিল না, সমস্ত সময়টা আসলে তিনি এক মন্দিরের গর্ভে দাঁড়িয়ে এক জ্যান্ত জিব খুঁজছিলেন। কী সেই পরম প্রথম, বলো খনা, কীসের জন্য তুমি থেকে এই আমি আমরা... আবহমানের এই দুর্গতি!

যখন মৃত্যুর সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন তখন সে বলল। তিনি এদের বললেন। যদি না শোনে, না বোঝে তা হলে আবার তমিস্রাপাত হবে, অন্ধকারে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে সে নেমে যাবে বহু শতাব্দী প্রাচীন সেই কূপের তলায়, মঙ্গলচিহ্নগুলির পাশে— আর এক মাঙ্গলিক— কিন্তু ছিন্ন। এবং নির্বাক।

আদিম অরণ্যের জীবন থেকে উঠে এসেছে মাতঙ্গী, রঙ্কা, মধুরা, নিমেষ, ভগ, অর্যমা। সমসময়ের প্রতিনিধি রঞ্জা, ঈশা, নিশীথ, সুবীর। এদেরকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে কাহিনি। লিঙ্গ বিভাজন কেন, কবে থেকে, কী রকম? ভয়াবহ এর ইতিহাস। সমাধান কোথায়? কোন ভ্রান্তির কারণে মানুষ জাতি সভ্য হতে পারছে না? এমনই সব উত্তরের অন্বেষণ বাণী বসুর এই উপন্যাসে।

9 788177 566116